চাণক্য সিরিজ

হত্যা শাস্ত্র

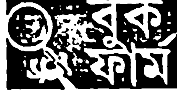
অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী

হত্যা-শাস্ত্র

অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী



বুক ফার্ম



Hatya Shastro
by
Abhigyan Ganguly

ISBN : 978-93-92722-04-2

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০২২

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার
অলংকরণ : গৌতম কর্মকার

মূল্য : ৩৪৯ টাকা

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সেই সকল পাঠককে
যারা পড়ার বইয়ের মধ্যে গল্পের বই লুকিয়ে পড়েছেন।

ভূমিকা

সময়সরণি ধরে তেইশ-শো বছর পিছিয়ে যান। ভাবুন সেই সময়ের কথা যখন 'ফিঙ্গার প্রিন্টিং' অথবা 'ফরেনসিক সায়েন্স' উন্নত হয়নি। সেই সময়ে তবে কীসের ওপর ভিত্তি করে একজন গোয়েন্দা তদন্ত করতেন?

এই চিন্তাটাই ছিল আমার লেখার মূল বীজ। ঠিক করি এই সময়টা ভিত্তি করে গোয়েন্দা কাহিনি লিখব। যেখানে সত্যান্বেষীর একমাত্র অস্ত্র হবে তার চিন্তাশক্তি এবং সব গল্পে রহস্য সমাধানের সমস্ত সূত্র পাঠকের সামনে থাকবে। গোয়েন্দার সঙ্গেসঙ্গে পাঠকরাও মস্তিষ্ক লাগিয়ে চেষ্টা করবে রহস্য সমাধানের।

এরপর ভাবনা এল কে হবে আমার গোয়েন্দা? উত্তরটা সহজ ছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সহজেই এই চরিত্রে মানিয়ে যায়। আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য 'কৌটিল্য'। তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেই-বা হতে পারে?

আচার্য চাণক্যর কথা উঠলেই প্রথম মনে আসে তাঁর সৃষ্টি 'অর্থশাস্ত্র'-র কথা। এই বইটা শুধুমাত্র অর্থনীতির বই নয়। এটা সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম অপরাধ-বিজ্ঞানের বইও বটে। 'অর্থশাস্ত্র' পড়তে গিয়ে আমি ভারি অবাক হয়েছিলাম। সেই যুগে আচার্য কৌটিল্য এই বইয়ে লিখে গেছেন, 'বডি ল্যাঙ্গোয়েজ' থেকে অপরাধী চেনার উপায়, বিভিন্ন ধরনের বিষ প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সেই বিষ শনাক্ত করার উপায়। মৃতদেহ দেখে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে বা আদৌ সেটা হত্যা কি না সেটা একজন তদন্তকারী কীভাবে বুঝবে, তার ব্যাখ্যাও করেছেন চাণক্য। অপরাধের তদন্ত করতে কী কী পদ্ধতি একজন গোয়েন্দার অবলম্বন করা উচিত তারও বিশদ বর্ণনা লিখে গেছেন তিনি অর্থশাস্ত্রে। তাই এই অসম্ভব বুদ্ধিমান ঐতিহাসিক চরিত্রটির প্রতি সম্মান জানিয়েই এই কাহিনিগুলো লেখা।

এই বইয়ের কাহিনি কখনোই ঐতিহাসিক সত্য নয়। বরং বলা চলে

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা কাল্পনিক কাহিনি মাত্র। অতএব পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে এই গল্পগুলো ঐতিহাসিক কাহিনি না মনে করে, গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবেই পড়বেন। এতে কিছু তথ্য ঐতিহাসিক, বাকি সবটাই কাল্পনিক। বহু তথ্য আমার অজান্তে অথবা গল্পের স্বার্থে হয়তো ইতিহাসের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। পাঠকদের অনুরোধ সেগুলো গল্পের স্বার্থে ক্ষমা করবেন। চন্দ্রগুপ্তর গুরু বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য এবং অর্থশাস্ত্রের লেখক বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য একই ব্যক্তি কি না সেই নিয়ে নানা ইতিহাসবিদের নানা মত আছে। আমি সেই বিতর্কে না গিয়ে তাঁদের অভিন্ন ব্যক্তি ধরে নিয়েই কাহিনি লিখেছি। মূল কয়েকটা চরিত্র যেমন চন্দ্রগুপ্ত, জীবসিদ্ধি এবং স্বয়ং চাণক্য বাদে বাকি বেশিরভাগ চরিত্রই কাল্পনিক। প্রতিটা গল্পের শেষে টীকার মাধ্যমে আমি তথ্যসূত্র লিখে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

পাঠকদের অনেকদিনের দাবি ছিল চাণক্যকে দুই মলাটে আনার। উৎসাহ দেয়ার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ। এই বইয়ের শেষে যে উপন্যাসটা আছে সেটা প্রায় ছ-মাসের গবেষণা আর তিন মাস লেখালেখির ফল। ধন্যবাদ দিতে চাই আমার বন্ধু শুভ্রজিৎ চক্রবর্তীকে, যে আমার সব গল্পের প্রথম পাঠক। ধন্যবাদ আমার অন্য দেশের বোনটিকে শ্রাবন্তী, যে প্রথম দফা ভুলভ্রান্তি দেখে দেয়। ইতিহাসের তথ্য খুঁজে পেতে এবং গল্পটা আরও বাস্তবভিত্তিক করতে সাহায্য করেছে সুশোভন। ধন্যবাদ দেব সুমিতদা আর সোনালদাকে। তাদের জন্যেই এই বই পাঠকদের হাতে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যত্ন করে প্রুফরিড করার জন্যে অনমিত্রবাবুকেও ধন্যবাদ।

সবশেষে ধন্যবাদ পাঠকদের, যাদের উৎসাহই সাহস জোগায়।

অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী

সূচিপত্র


চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সাম্রাজ্য
গান্ধার
তক্ষশিলা
মগধ
পাটলিপুত্র
উজ্জয়িনী
বিন্ধ্য পর্বত
বিদর্ভ
তোসালি
কলিঙ্গ

শলাক-শাস্ত্র

১.

পাটলিপুত্র। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর রাজসভা। রাজপুরুষ, মন্ত্রীগণ এবং সাধারণ নাগরিকদের সমাগম সভাঘর জুড়ে। রত্নখচিত সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। নাগরিকদের আর্জি তিনি শুনছেন মন দিয়ে। হঠাৎই গম্ভীর মুখে এক সৈনিক প্রবেশ করল। নতমস্তকে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল,

- সম্রাটের জয় হোক।

ইশারায় সম্রাট তাকে কথা বলার অনুমতি দিলেন। সৈনিক বলল,

- পাটলিপুত্রর পশ্চিম দ্বারে এক ব্রাহ্মণ সহ আরও দুই ব্যক্তি আপনার দর্শনপ্রার্থী। ওঁরা নিজেদের উত্তর-পশ্চিমের গান্ধারের রাজদূত হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

গান্ধারের নাম শুনেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় রাজসভায়। কারণ গান্ধার যে গত কয়েক বছর ধরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ হতে অস্বীকার করে এসেছে তা সকলেরই জানা। কয়েক বছর আগে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় থেকেই গান্ধার মগধের বিরোধিতা করে এসেছে। এর প্রধান কারণ গান্ধার-রাজ অম্বির সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর পুরোনো শত্রুতা। কিন্তু মগধ ক্রমেই ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছে এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে গান্ধারের ওপর। রাজধানীতে আজ গান্ধারের রাজদূতের আগমন হয় আসন্ন যুদ্ধ অথবা মৈত্রীর ইঙ্গিত। সম্রাটের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান-অমাত্য কৃষ্ণনাথ প্রশ্ন করলেন,

- পরিচয়পত্র পরীক্ষা হয়েছে?

- হ্যাঁ, আর্য।

এইবার সম্রাট বললেন,

- তাদের নগরে প্রবেশের আজ্ঞা দেয়া হল। তাদের সভায় উপস্থিত করা হোক।

সৈনিক চলে যেতেই প্রধান-অমাত্য কৃষ্ণনাথ সম্রাটের কাছে এসে বললেন,

- সম্রাট, সভা আজকের মতো ভঙ্গ করুন। গান্ধারের বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন চন্দ্রগুপ্ত।

সভা সমাপ্তির ঘোষণা হতেই কয়েকজন অমাত্য ছাড়া এক এক করে প্রত্যেকেই সভাঘর ত্যাগ করল। প্রধান-অমাত্য কৃষ্ণনাথ উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করলেন,

- সম্রাট। আপনার কী ধারণা? কী সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে দূত? গান্ধার কি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে নাকি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছে?

একটু ভেবে সম্রাট উত্তর দিলেন,

- অম্বি নিজে এক নীচ পিতৃহন্তা এবং কাপুরুষ। দূত পাঠিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা সে করবে না। অম্বি আক্রমণ করলে, তা অবশ্যই করবে আচমকা রাতের অন্ধকারে। তবে মগধের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। অতএব দূত যুদ্ধ ঘোষণা করতে আসছে না এই বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত।

- তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের কূটনৈতিক চাপের কাছেই নতিস্বীকার করতে চায়! এটা পরম সুখবর, সম্রাট!

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সম্রাট বললেন,

- দেখাই যাক। তবে অম্বি নিজের হঠকারিতা ত্যাগ করে, এত তাড়াতাড়ি আমার কাছে হার মেনে নেবে সেটাও বিশ্বাস হয় না। গান্ধার-রাজ অম্বি মূর্খ কিন্তু তার প্রধান-অমাত্য অতি ধূর্ত ব্যক্তি। একইসঙ্গে তিনি অম্বির গুরুও বটে। লোকে তাঁকে মহাভারতের গান্ধার পুত্র, শকুনির সঙ্গে তুলনা করে। তাঁকে লোকে অমাত্য শকুনি বলে ডাকে।

- তবে আপনি কি এটা তারই কোনো নতুন ষড়যন্ত্র বলে সন্দেহ করছেন?

- নাহ্। পাটলিপুত্রতে এসে বিশেষ কিছুই করার সামর্থ্য তাদের নেই। তবে অম্বি আমায় যতটা ঘৃণা করে, তার আচার্য শকুনি, আচার্য চাণক্যকে ততটাই ঘৃণা করে। সেই কারণে সাবধান থাকাই শ্রেয়।

আর একজন সভাসদ প্রশ্ন করলেন,

- সম্রাট, মার্জনা করবেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। আপনি বরাবরই গান্ধারকে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করতে এত তৎপর কেন?

মৃদু হেসে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর দিলেন,

- কারণ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধারে অবস্থিত। আপনারা সকলেই জানেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার এবং আচার্য চাণক্যর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। একসময়ে আচার্য নিজে সেখানে অধ্যাপনা করেছেন এবং আমি নিজে তাঁর ছাত্র ছিলাম তক্ষশিলায়। অখণ্ড আর্যাবর্তর স্বপ্নের সূত্রপাত সেখান থেকেই হয়েছিল। আর তা ছাড়া, গান্ধার হল এই দেশের সীমান্ত প্রদেশ। তা অম্বির মতো অপদার্থ শাসকের হাতে সুরক্ষিত নয়। আর সীমান্ত সুরক্ষিত না হলে এই দেশও সুরক্ষিত নয়।

সম্রাটের যুক্তিতে সকলেই সম্মতি জানাল।



কিছুক্ষণ বাদেই রাজসভায় দু-জন সৈনিক প্রবেশ করল এবং তাদের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ও দু-জন ভৃত্য স্থানীয় ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ নত হয়ে সম্রাট ও উপস্থিত সকলকে প্রণাম জানালেন। হাসিমুখে বললেন,

- ধন্য আমি, সম্পূর্ণ আর্যাবর্তর সম্রাট, বীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সাক্ষাৎ পেয়ে। হে সম্রাট, আমি শুকদাস, গান্ধার-রাজ অম্বির একজন অমাত্য। আমি সুখবর নিয়ে এসেছি, সম্রাট।

শুকদাস একটা রাজ-মোহর লাগানো চিঠি এগিয়ে দিলেন কৃষ্ণনাথের দিকে। সেটা খুলে পড়তেই কৃষ্ণনাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

- সম্রাট! এ যে সত্যিই সুখবর। গান্ধার-রাজ আমাদের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে মগধের অন্তর্গত হতে চান।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও এই খবরে চকিত এবং হর্ষিত হলেন। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে বললেন,

- এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হল, অমাত্য শুকদেব?

- সম্রাট, সত্যি বলতে, মহারাজ আর প্রধান-অমাত্যর এই হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তনে আমি নিজেও বিস্মিত। তবে আমরা অন্যান্য অমাত্য তথা সমগ্র রাজ্যবাসীর বহুদিনের দাবি ছিল গান্ধারকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গ করার। নাগরিকদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব আমি নিজে দিয়েছিলাম। এবং তাতে ইন্ধন দিয়েছে তক্ষশিলার আচার্যরা। গান্ধারে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই বাধ্য হয়ে এই নির্ণয়।

- হ্যাঁ। এই তথ্য আমার জানা যে গান্ধারের বিচক্ষণ অমাত্যরা তথা অধ্যাপকরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য আগেও বহুবার আর্জি জানিয়েছেন। প্রতিবারই তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে রাজার থেকে। তবে দেরিতে হলেও তাঁর যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, তা জেনে ভালো লাগল।

- যথার্থ বলেছেন, সম্রাট।

- আপনি আমাদের বিশেষ অতিথি মহোদয়। পথযাত্রায় আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আমাদের আপ্যায়নে কয়েক দিন রাজমহলে যাপন করার আমন্ত্রণ জানাই।

- ধন্যবাদ, সম্রাট। তবে আমি দু-দিন বিশ্রাম নিয়েই আপনার উত্তর সমেত ফিরে যাব। শুভ কাজে দেরি নয়।

অমাত্য কৃষ্ণনাথ প্রশ্ন করলেন,

- আপনার সঙ্গে এরা আপনার ভৃত্য? আপনার সঙ্গে গান্ধারের কোনো প্রহরী আসেনি?

- আমাদের রাজা আমার সঙ্গে কোনো প্রহরী পাঠাননি। তিনি জানিয়েছেন যে আপনার দায়িত্বে তিনি আমার সুরক্ষা ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। মগধকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। শুধু নিয়মরক্ষার স্বার্থে সঙ্গে এই একজন পাচক আর খাবার-পরীক্ষক দিয়েছেন।

রাজপুরুষদের হত্যার ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগ হল সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। সেই কারণেই, রাজদূতদের সঙ্গে একজন নিজস্ব পাচক ও খাবার-পরীক্ষক পাঠানোটা নিয়ম। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত হেসে বললেন,

- সম্পূর্ণ ভরসা যে করেন না তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আপনার সুরক্ষায় আপনার সঙ্গে সর্বদা দু-জন সৈনিক বহাল করলাম। আপনাকে

গান্ধার অবধি সুরক্ষিত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, মহোদয়। আপনি আমার বাড়িতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

২.

রাজমহলের অন্দরেই একটি সুসজ্জিত অতিথি-কক্ষে শুকদাসের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুকদাস অমাত্য কৃষ্ণনাথের সঙ্গে দিনের বেলা মহল পরিদর্শন করলেন। সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে দু-জন প্রহরী থেকেছে। ক্লান্ত থাকায় সূর্যোদয়ের পর দ্বিতীয় প্রহরের দিকে তাড়াতাড়িই খাওয়া-দাওয়া করে তিনি ঘরে দরজা দিলেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হওয়া অবধি কৃষ্ণনাথ নিজে অপেক্ষা করলেন এবং দরজার বাইরে দু-জন সশস্ত্র প্রহরীকে সারারাত পাহারায় থাকতে নির্দেশ দিলেন। কোনোভাবেই যেন ব্রাহ্মণকে একা ছাড়া না হয় বা তাঁর সুরক্ষায় কোনো গাফিলতি না হয় সেই নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। আজ সত্যিই শুভদিন।

পরের দিন সকালে পাচক ও খাবার-পরীক্ষক শুকদাসের জন্যে প্রাতরাশ বানিয়ে উপস্থিত হল তাঁর দরজায়। সতর্ক দুই প্রহরী তখন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। তারা দরজার কড়া নাড়ল, কিন্তু দরজা খুলল না। প্রহরী ও দুই ভৃত্য অনেক ডাকাডাকি করতেও কোনো উত্তর না আসায় এক প্রহরী ছুটল প্রধান-অমাত্যকে খবর দিতে। চিন্তিতভাবে কৃষ্ণনাথ এলেন এবং তিনিও বার কয়েক ডাকাডাকি করলেন। কোনো ফল না হওয়ায় শঙ্কিত অমাত্য সম্রাটকে খবর পাঠালেন। সম্রাট নিজে কয়েকজন সৈনিক নিয়ে হাজির হয়ে নির্দেশ দিলেন দরজা ভেঙে ফেলতে।

শক্তপোক্ত সেগুন কাঠের দরজা ভেঙে ফেলা মোটেই সহজ হল না। ছ-জন বলিষ্ঠ সৈনিকের মিলিত চেষ্টায় সে দরজা ভাঙা হল। প্রথমেই প্রবেশ করলেন সম্রাট এবং ভেতরের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ওঁর পিছু পিছু অমাত্য, সৈনিকরা, সঙ্গে গান্ধারের দুই ভৃত্যও প্রবেশ করল। কিন্তু প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কারণ ঘরের মেঝেতে ভূপাতিত হয়ে, নিশ্চল পড়ে আছেন শুকদাস। চোখ খোলা এবং তাতে বিস্ফারিত দৃষ্টি। সম্রাটের ইশারায় একজন সৈনিক এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের নাকে হাত রাখল এবং হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করল। মাথা নাড়িয়ে জানাল যে ব্রাহ্মণ মৃত।

প্রাণহীন দেহটার দিকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। চরম বিপদ আসতে চলেছে। শত্রুদেশের রাজদূতের মৃত্যু হয়েছে তাঁর নিজের রাজমহলে! হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? কর্তব্য ঠিক করতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ওঁর। এই বিপদের মুহূর্তে ওঁর শুধু একজনেরই মুখ মনে আসছে। হ্যাঁ। একমাত্র তিনিই পারেন এই রহস্যের সমাধান করতে।

একজন সৈনিকের দিকে চেয়ে তিনি শান্তকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন,

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আচার্য চাণক্যকে খবর দাও!

৩.

নিজের ঘরে একাকী বসে আছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। আজকে সভা করার পরিস্থিতি নেই। তাঁর মনের ভেতর দুশ্চিন্তার ঝড় চললেও বাইরে থেকে তিনি শান্ত। সম্রাটকে কখনো নিজের অন্তরের ভাব অথবা দুর্বলতা লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে নেই। তিনি একজনের পথ চেয়ে অধীর অপেক্ষায় বসে আছেন। সেই মুহূর্তেই অতি পরিচিত খড়মের শব্দ তাঁর কানে এল। সেই আওয়াজ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘরে ঢুকলেন সেই খড়ম পরা ব্যক্তি।

উচ্চতায় সম্রাটের চেয়ে সামান্য কম, কৃষ্ণবর্ণ, ন্যাড়া মাথায় শুধু লম্বা টিকি এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বেশ। কপালে চন্দনের ত্রিবলী টিকা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং বুকের ওপর দৃশ্যমান পইতে তাঁর ব্রাহ্মণ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছে। অসম দন্তরাশির কারণে তাঁর মুখে একধরনের কুরূপতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তির আপাত বিশেষত্বহীন চেহারায় উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ। অন্তর্ভেদী সেই দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে চলে প্রতি মুহূর্তে। অপরিচিত কোনো ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণকে দেখে কোনোদিন অনুমান করতে পারবে না যে ইনি মহামতি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। আর্যাবর্তে এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, দ্বিতীয় কেউ নেই। সম্ভবত সম্রাট নিজেও নন। তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর বাল্যকালের আচার্য, মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল মস্তিস্ক এবং পরবর্তীকালে প্রধান-অমাত্য পদে আসীন ছিলেন কয়েক বছর। যদিও এখন তিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেছেন। রাজভবন তিনি ত্যাগ করেছেন। পাটলিপুত্রেই এক তুলনামূলক নির্জন স্থানে নিজের কুটিরে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী জীবনযাপন করেন।

গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন সম্রাট। মাথায় হাত রেখে চাণক্য আশীর্বাদ করলেন,

- আয়ুষ্মান ভবঃ। যশস্বি ভবঃ। উৎকৃষ্ট ভারতম সম্রাট।

চন্দ্রগুপ্ত উঠে গুরুকে আসনে বসিয়ে নিজেও তাঁর মুখোমুখি বসলেন। প্রহরীকে তাঁদের একান্তে ছেড়ে দিতে বলে দরজা বন্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন,

- আচার্য! মগধের ঘোর বিপদ আসন্ন, আচার্য। আপনি ছাড়া এই মুহূর্তে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

- হুমম। কী ঘটেছে, সম্রাট?

- গান্ধার-রাজ অম্বিকে মনে আছে আপনার?

- অবশ্যই। আচার্য শকুনির শিষ্য। ক্ষমতার লোভে, এই দেশদ্রোহী অম্বি সিকন্দরের সঙ্গে মৈত্রী করে, যবন সেনাদের এদেশে প্রবেশের পথ করে দিয়েছিল। তাকে কি ভুলতে পারি?

- হ্যাঁ। সে এতদিন মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হতে রাজি হয়নি। তাই আমরাও এইদিক থেকে কূটনৈতিকভাবে গান্ধারকে চাপ দেওয়া শুরু করি। তাঁর রাজ্যে নজিরবিহীন অপশাসন। কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, শ্রমিকরা ক্ষুধার্ত মরছে আর শিক্ষাব্যবস্থাও ধুঁকছে। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্যবাসী ও তক্ষশিলার আচার্যরা বিদ্রোহ করছে। মগধের অংশ হওয়ার দাবি করেছে।

- হুমম। অম্বি একা হলে বহুদিন আগেই বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হত। কিন্তু আচার্য শকুনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সেই তক্ষশিলায় অধ্যাপনা করার সময় থেকেই আমি তাকে চিনি। তার বুদ্ধিতেই এখনও অম্বি রক্ষা পেয়েছে। যাই হোক, হঠাৎ তার প্রসঙ্গ উঠছে কেন? সে কি এইবার হার মেনেছে? মগধের বশ্যতা স্বীকার করতে চায়?

- হ্যাঁ। সেইরকম ইঙ্গিত দিয়েই এক ব্রাহ্মণ দূতকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। গতকাল তিনি এখানে পৌঁছেছিলেন। আমি তাঁর যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করি। প্রাসাদের অন্দরেই অতিথিশালায় ওঁর থাকার ব্যবস্থা করি। কিন্তু আজ সকালে...

পুরো কথা শেষ না করে সম্রাট চুপ হয়ে যেতে অশনির ইঙ্গিত অনুমান করেই চাণক্য বলে ওঠেন,

- দয়া করে এইটা বোলো না যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

- তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমি ভাবতে পারছি না, আচার্য। খোদ রাজমহলের অন্দরে গুপ্তহত্যা!

চাণক্য আসন ছেড়ে উদ্‌বিগ্নভাবে পায়চারি করতে শুরু করলেন। উত্তেজিত অথচ ধীর কণ্ঠে বললেন,

- চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! এই অনর্থ তুমি কীভাবে ঘটতে দিলে? তুমি বুঝতে পারছ এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য? রাজদূতকে হত্যা একেই ধর্মবিরুদ্ধ পাপ। তার ওপর ব্রহ্মহত্যা! কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে এতে মগধের হাত নেই। প্রত্যেকে তোমার ওপরেই দোষারোপ করবে। মৌর্যদের শাসনব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন উঠবে। বিরোধী-রাজ্যরা তো বটেই, এমনকী মগধের অঙ্গরাজ্যের শাসকদের কাছেও মগধের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। তারা একজোট হবে আর ব্রাহ্মণদের উসকানি দেবে। সমস্ত মগধ বিরোধী রাজ্য এর লাভ ওঠাবে। বিশেষ করে গান্ধার।

- আমি আপনারই শিষ্য। আমি মূর্খ নই, আচার্য। আমি সব বুঝছি। আমি

আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমার তরফ থেকে যথাযথ সুরক্ষা আর সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে, বন্ধ ঘরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধী শীঘ্র ধরা না পড়লে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই আপনার সাহায্য চাই, গুরুদেব। এই রহস্যের সমাধান আপনিই করতে পারেন, আচার্য।

- হুমম। তুমি নিশ্চিত যে হত্যাই করা হয়েছে?

'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়লেন সম্রাট। বললেন,

- মৃতদেহ দেখলে আপনিও সহজেই নিশ্চিত হবেন।

পায়চারি থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাণক্য বললেন,

- হত্যাস্থলে নিয়ে চলো আমায়।

- চলুন, আচার্য।

৪.

অতিথিশালাটা সুবিশাল। মূল্যবান আসবাবপত্র, পর্দা, অপূর্ব ভাস্কর্য, রঙিন চিত্র প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। ঘরের একদিকে রুপোর থালায় এখনও গতরাতের অর্ধভুক্ত ভোজন, ফল-মূল আর রুটি পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে সুসজ্জিত পালঙ্ক এবং পালঙ্কর লাগোয়া একটা কাঠের তেপায়া মেজ। পালঙ্কর পাশেই মেঝেতে পড়ে আছে মৃতদেহ। একটা সোনার পানপাত্র মেঝেতে উলটে গড়িয়েগেছে দেয়ালের কোনায়। মেজের পাশেই খানিকটা জায়গায় জলের শুকনো দাগ। মৃতদেহর মুখ থেকে সাদা গ্যাঁজলা বেরিয়ে এসেছে। খোলা চোখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন স্পষ্ট। হাত এবং পায়ের নখ নীলাভ যা স্পষ্টতই বিষক্রিয়ার লক্ষণ।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন চাণক্য। ঘরের মধ্যে আচার্য ছাড়াও স্বয়ং সম্রাট, অমাত্য কৃষ্ণনাথ এবং বৃদ্ধ রাজবৈদ্য উপস্থিত। চাণক্য অমাত্যর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,

- এই দরজা ছাড়াও ওদিকে দ্বিতীয় একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি। ওই দরজা কোথায় খোলে?

- ওই দরজা দিয়ে বেরিয়েই ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি।

চাণক্য দ্বিতীয় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

- এ কী? দরজায় ভেতর থেকে খিল দেয়া নেই। বাইরে থেকে বন্ধ। এর মানে তো যে কেউ ঢুকতে পারে এই দরজা দিয়ে।

আমতা আমতা করে অমাত্য বললেন,

- ওটা তো... মানে খেয়াল করিনি।

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে সম্রাট বললেন,



- আপনার এই খেয়াল না করাতেই কেউ ওইখান দিয়ে ঢুকে হত্যা করে গেছে সম্ভবত। আপনাকে এত বার সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারপরেও এই ভুল কীভাবে হয় আপনার?

বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষ্ণনাথকে এর বেশি কিছু আর বললেন না চন্দ্রগুপ্ত।

অমাত্যর হয়ে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- সম্রাট, এখনও কিন্তু প্রমাণিত হয়নি যে বাইরে থেকে লোক ঢুকেছিল। তা ছাড়া, ছাদে তো সারারাত পাহারা থাকে। তাই না?

এই কথায় সাহস পেলেন কৃষ্ণনাথ। বললেন,

- আজ্ঞে হ্যাঁ, আচার্য। ওখান থেকে সবার চোখ এড়িয়ে আততায়ী ঢুকতে পারবে না।

পরের প্রশ্ন আচার্য করলেন রাজ-বৈদ্যের উদ্দেশে,

- মৃত্যু বিষ প্রয়োগেই হয়েছে এই বিষয়ে নিশ্চিত তো?

- আজ্ঞে, হ্যাঁ। তবে দেহে আর কোনো ক্ষতচিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। সাপের কামড় নয়।

- হুমম। খাবারে বিষ থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

কৃষ্ণনাথ বললেন,

- সেটা সম্ভব নয়, আচার্য। গতকাল রাতের পুরো রান্না হয়েছে আমার নিজের চোখের সামনে। গান্ধারের পাচক ও খাদ্য-পরীক্ষকটিকে বিশ্বাস করা যায় না। খাবারে যাতে বিষ প্রয়োগ কোনোভাবেই সম্ভব না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে, আমি এবং সঙ্গে আরও পাঁচজন প্রহরী কড়া সতর্কতার সঙ্গে নজর রেখেছি সর্বক্ষণ। আনাজ, চাল, ঘি ইত্যাদি সব আমরা রাজভাণ্ডার থেকে দিয়েছিলাম। শুধু তা রান্না করেছে গান্ধারের পাচক। সেই প্রতিটা খাবার, শুকদাস মুখে তোলার আগে গান্ধারের নিজস্ব খাবার-পরীক্ষক আমাদের সামনে তা প্রথমে খেয়ে দেখেছে। সেই ব্যক্তির ভেতর কোনোরকম বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়নি।

- হুমম। বিষাক্ত চাল ফোটানোর সময়ে অস্বাভাবিক ময়ূর-নীলাভ ধোঁয়া বের হয়। সবজিতে বা ফলে বিষ থাকলে তার রঙের সামান্য হলেও পরিবর্তন আসে। শুকনো হয়ে যায়। দইতে কালো রং এবং মধুতে সাদা রং দেখা দেয়। এগুলো সবই সম্রাটের নিজস্ব পাচক জানেন। তিনি কি উপস্থিত ছিলেন কালকে রান্নার সময়ে?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন মহা-অমাত্য। বললেন,

- হ্যাঁ, আচার্য। আমি সেই ব্যবস্থাও করেছিলাম। সমস্ত রান্না রাজ-পাচকের উপস্থিতিতেই রেঁধেছে গান্ধারের পাচক।

- হুমম।

এগিয়ে গিয়ে থালায় সাজানো অভুক্ত খাবারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চাণক্য। প্রশ্ন করলেন,

- এগুলো এখনও রাখা কেন এখানে? রাতে সরানো হয়নি কেন?

কৃষ্ণনাথ উত্তর দিলেন,

- এই দায়িত্ব গান্ধারের দুই ভৃত্যের ছিল। তাদের গাফিলতি।

যে চারপায়াটার ওপর খাবার রাখা আছে, তার কাছের জানলার পর্দা সরিয়ে দিলেন আচার্য। রোদ্দুর এসে থালায় পড়ল। ঝুঁকে পড়ে থালা বাসন পরীক্ষা করলেন। বললেন,

- ভালোই হয়েছে এগুলো না সরিয়ে। একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নেবেন এতে বিষ আছে কি না। বিষ বাসনেও থাকতে পারে। ধাতুতে বিষ থাকলে তার ওপর পড়া আলোকরশ্মি কম প্রতিফলিত হয়। কারণ বিষাক্ত ধাতু তার জৌলুস হারায়। এক্ষেত্রে সেরকম কিছু তো আপাতত নজরে পড়ছে না।

বিষক্রিয়ার ওপর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন চাণক্য, কিন্তু থেমে গেলেন। জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকা রোদ্দুর মেঝের ওপর কোনো একটা ছোটো বস্তুর ওপর এসে পড়েছে। সেটার থেকে প্রতিফলিত আলো চাণক্যর চোখে লাগল। ভুরু কুঁচকে এগিয়ে গেলেন পালঙ্কর দিকে। নীচু হয়ে সাবধানে মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিলেন তিনি। একটা সরু শলাকা। অনেকটা কাপড় সেলাই করতে যেমন সুই ব্যবহার হয়, সেইরকমই। তবে দৈর্ঘ্যে সামান্য বেশি। সেটা নিজের চোখের সামনে ধরে, নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন তিনি,

- এটা কী?

চন্দ্রগুপ্ত এগিয়ে এসে সেটা দেখলেন। বললেন,

- সুই বা ছোটো শলাকা জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে।

- হুমম। কিন্তু এর সুচালো দিকে কালচে যে জিনিসটা লেগে আছে, সেটা তো শুকিয়ে যাওয়া রক্ত মনে হচ্ছে। ভালো করে দেখো, এটার সুচালো দিকের রং অন্য দিকের চেয়ে সামান্য আলাদাও বটে।

বাকিরাও এগিয়ে এসে দেখল। সত্যিই তাই। একটা সুই, তবে সেটা অবশ্যই সেলাইইয়ের কাজে ব্যবহারের জন্য নয়। কারণ এটার অন্য মাথায় সুতো পরানোর জায়গা নেই।

কৃষ্ণনাথের দিকে ঘুরে, চাণক্য বললেন,

- পাখিশাল থেকে একটা কাকোরা* পাখি নিয়ে আসতে বলুন, এখুনি।

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,

- গুরুদেব। হঠাৎ কাকোরা কেন?

- কারণ হালকা বিষক্রিয়াতেও কাকোরা পাখির চোখ লাল হয়ে ওঠে।

নির্দেশমতো ব্যবস্থা হল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণের ভেতরেই একজন সৈনিক একটা কাকোরা নিয়ে হাজির হল। মগধের পাখিশালে পাখির অভাব নেই।

চাণক্য তাঁর হাতের শলাকাটা পাখিটার গলার কাছে ফুটিয়ে দিলেন। মুহূর্তে পাখিটার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং যন্ত্রণানায় ছটফট করে উঠল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই সেটার ঘাড়টা একদিকে নেতিয়ে পড়ল। বোঝাই যায় শলাকার মাথায় লাগানো আছে তীব্র মারণ বিষ!

* *কাকোরা- তিতির পাখি (Partridge)*

৫.

- সর্বনাশ। এই তবে হত্যাশস্ত্র! এই তীব্র বিষ মাখানো সুই ফুটিয়েই হত্যা করা হয়েছে ব্রাহ্মণকে!

বলে উঠলেন রাজবৈদ্য। উত্তরে চাণক্য বললেন,

- হুমম। আপাতত তাই মনে হচ্ছে। তবে বিষয়টা অদ্ভুত। বৈদ্য মহোদয়, আপনি দয়া করে আর একবার মৃতদেহ খুঁজে দেখুন। সুই ফোটানোর দাগ চোখে পড়লেও পড়তে পারে। তবে আমি এখনও খাবারে বিষ থাকার সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিচ্ছি না। মহা-অমাত্য মহোদয়, ওই অভুক্ত খাবারগুলো তো বোধ হয় এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি?

- আজ্ঞে না, আচার্য। কাল রাতেই খাদ্য-পরীক্ষক খেয়ে দেখেছে... তাই...

উত্তর দিলেন অমাত্য কৃষ্ণনাথ। চাণক্য বললেন,

- আপনি এখুনি একটা পাখি আনার ব্যবস্থা করুন। খাবারটা আরও একবার আমি নিজে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে চাই।

- কিন্তু আচার্য, এই শলাকাটা যখন পাওয়া গিয়েইছে, তখন আর খাবার পরীক্ষা করার কি প্রয়োজন আছে?

- হয়তো নেই। তবু সব ধরনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নেয়া উচিত। বিশেষ করে, খাবারগুলো ইতিমধ্যে ফেলে না দেয়ায় সে-সুযোগ যখন আমরা পাচ্ছি। সঙ্গে পানীয় জলও পরীক্ষা করতে হবে।

একটু বাদেই এক সৈনিক আরও একটা কাকোরা এনে হাজির করল। চাণক্য সেটাকে নিয়ে, থালা রাখা মেজটার দিকে এগিয়ে গেলেন। অমাত্যর দিকে ফিরে বললেন,

- একটা ছুরি নিয়ে আসতে বলুন ভৃত্যকে।

- ছুরি নেই ওখানে? ছিল তো রাতে একটা।

- আপাতত দেখছি না।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বহুক্ষণ থেকেই অমাত্যর ওপর ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিলেন। এইবার বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেললেন। বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন,

- আপনি অকারণে এত বাক্যব্যয় করেন কেন? ছুরি নেই দেখেই তো

আচার্য চাইছেন। এক্ষুনি একটা এনে দিন!

কৃষ্ণনাথ দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ছুরি আনতে। চাণক্য একবার বৃদ্ধ বৈদ্যর দিকে তাকিয়েছিলেন। আপাতত তিনি মৃতদেহ পরীক্ষা করতে মগ্ন। তারপর চন্দ্রগুপ্তর উদ্দেশে চাপা গলায় বললেন,

- ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা। অর্থাৎ ক্রোধ সাক্ষাৎ যমের অন্য নাম, চন্দ্রগুপ্ত। আপৎকালে একমাত্র মূর্খরা ক্রোধের আশ্রয় খোঁজে। বিপদে ধৈর্য হারানো সাধারণ মানুষের সাজে, কিন্তু একজন সম্রাটের কদাপি নয়। মহা-অমাত্য বয়োজ্যেষ্ঠ। ওঁকে এইভাবে বলাটা তোমার শোভা পায় না।

মাথা নীচু করে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

- আচার্য, ক্ষমা করবেন। আসলে...

- আমি তোমার উদ্‌বেগ বুঝতে পারছি চন্দ্রগুপ্ত। ঠান্ডা হও। জল ঠান্ডা বরফ হলে তবেই শক্ত থাকতে পারে। এতদপি গমিষ্যতি। এই বিপদও সময়ের সঙ্গে কেটে যাবে। বিশ্বাস রাখো।

এই মুহূর্তে একটা ছুরি হাতে ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণনাথ। ধন্যবাদ দিয়ে চাণক্য সেটা নিলেন। রুটির ডান দিক থেকে খাওয়া হয়েছে। আচার্য উলটো দিক থেকে ছোট্ট একটা টুকরো কেটে ছুড়ে দিলেন পাখিটার দিকে। তার চোখের রঙে কোনো পরিবর্তন আসে কি না লক্ষ করলেন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। এরপর একে একে বাকি খাবার এবং ফলগুলোও অল্প অল্প টুকরো কেটে চাণক্য পাখিটার দিকে এগিয়ে দিলেন। সবশেষে পানীয় জলের কলসি থেকে সামান্য জলও দেয়া হল। সকলে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন যে প্রাণীটির মধ্যে বিষক্রিয়ার কোনো ইঙ্গিত দেখা যায় কি না। ইতিমধ্যে একটা পাখির প্রাণ গেছে। আশঙ্কা ছিল যে বিষ পরীক্ষা করতে আরও একটা নিরীহ প্রাণীর প্রাণ যায়। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে গেলেও সেরকম কিছুই হল না। চাণক্যও শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তবে এক ভৃত্যকে আজ সূর্যাস্ত অবধি নজর রাখতে বললেন এই পাখিটার ওপর।

ততক্ষণে রাজ-বৈদ্য মৃতদেহ পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চাণক্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন,

- কিছু পেলেন মহোদয়?

দু-পাশে মাথা নেড়ে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,

- না। যদিও আমি আশাও করিনি খুঁজে পাব। কারণ ওই ছোটো শলাকার ক্ষত চোখে না পড়াই স্বাভাবিক। রক্তপাতও সামান্যই হবে, যা প্রায় না হওয়ার মতো। বিষটা যে তীব্র সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। সামান্য ক্ষতেই মৃত্যু হয়েছে।

- হুমম।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এইবার মুখ খুললেন,

- গুরুদেব, তাহলে বাইরে থেকে হত্যাকারী প্রবেশ করেছিল বলেই ধারণা করা যায়। তাই না?

- হুমম। সব কিছু তো সেইরকমই ইঙ্গিত করছে, সম্রাট। খাবারে ও পানীয়তে যে বিষ নেই, তা প্রমাণিত। এর ফলে, গান্ধারের পাচক এবং খাদ্য-পরীক্ষককে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। এই হত্যাকাণ্ডে তারা নিজেদের সম্পূর্ন নির্দোষ বলে দাবি করবে এবং গান্ধার অভিযোগের আঙুল আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে তুলবে। সঙ্গে আবার ওই ভূলুণ্ঠিত জলের পাত্র থেকে অনুমান করা যায় যে হত্যাকারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেই সম্ভবত সেটা উলটে গেছে।

- কিন্তু, বাইরে থাকা প্রহরীরা কিছু শোনেনি?

- ব্রাহ্মণ হয়তো চিৎকার করার সুযোগ পায়নি। মুখ চেপে ধরে যদি ওই শলাকা বিঁধিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাঁর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। প্রহরীদের প্রশ্ন করে হয়তো কিছু তথ্য জানা যাবে, সম্রাট। কালকে রাতে দরজায় এবং এই মহলের ছাদে পাহারায় থাকা সৈনিকদের একে একে সভাঘরে আসতে বলুন। আমি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। তারপর গান্ধার থেকে আসা সেই দুই ভৃত্যকেও আসতে বলুন।

ঘর থেকে বেরোনোর আগে মৃতদেহর দিকে ফিরে চাণক্য করজোড় করে মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় মন্ত্রপাঠ করলেন। মৃতদেহ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৬.

সভাঘরে এই মুহূর্তে চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, মহা-অমাত্য এবং রাজ-বৈদ্য ছাড়া আর কেউ নেই। অমাত্য চাণক্যর নির্দেশমতো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে সন্দেহভাজনদের হাজির করছেন। সভায় প্রবেশ করল দুই সৈনিক। কৃষ্ণনাথ তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

- অতিথিদের ঘরের দরজার বাইরে, গতকাল রাতে পাহারায় ছিল এই দুই সৈনিক।

দু-জন সৈনিক সভাঘরে ঢুকেই সবার আগে সম্রাট আর চাণক্যকে প্রণাম করল। তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে চাণক্য সরাসরি প্রশ্নে চলে গেলেন,

- তোমাদের নাম?

- আমি সিদ্ধান্তক এবং আমার সঙ্গী কৃষাণ।

- কত বছর হল বাহিনীতে কাজ করছ?

একজন বলল,

- আমার পাঁচ হল, আচার্য। তিন বছর আগে ভালো কাজের জন্য আমায় রাজমহলের প্রহরী নিযুক্ত করা হয়।

- আর তুমি?

দ্বিতীয়জন উত্তর দিল,

- আমার চার বছর হল। আমি গত বছরই রাজমহলে নিযুক্ত হয়েছি।

- হুমম। সম্ভবত তোমরাই কাল রাতে ব্রাহ্মণ শুকদাসকে শেষবার দেখেছিলে?

- হ্যাঁ, আচার্য।

- শেষ কখন দেখেছিলে ?

- রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর উনি যখন দরজা দেন, সেইসময়ে। সন্ধের দিকেই। রাত দ্বিতীয় প্রহর শুরুর ঘণ্টা বাজার আগেই। আমাদের সামনেই উনি দরজা বন্ধ করে, ভেতর থেকে তাতে খিল দেন।

- আর রাতে একবারও উনি দরজা খোলেননি বা তোমাদের ডাকেননি?

দু-জনেই জানাল,

- না, আচার্য।

- কেউ কি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

- না, আচার্য।

- কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ? রাতে তোমরা একবারও পাহারা ছেড়ে যাওনি এটা তো সম্ভব নয়!

কৃষাণ নামের সৈনিকটি গর্বিত ভঙ্গিতে বলল,

- না, আচার্য। আমি বা আমার সঙ্গী দু-জন একসঙ্গে কখনোই পাহারা ছেড়ে যাইনি। যখন ও গেছে, তখন আমি থেকেছি আর যখন আমি গেছি তখন আমার সঙ্গী থেকেছে।

- এর অর্থ কিন্তু এটাও হতে পারে যে একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন ঘরে ঢুকে থাকতে পারে। তোমাদের দু-জনের যে কেউই পাহারায় থাকাকালীন ঘরে ঢুকে থাকতে পারো, আবার অন্যজন ফিরে আসার আগেই কার্যসিদ্ধি করে বেরিয়েও আসতে পারো।

এই কথায় দু-জন প্রহরীই শঙ্কিত হয়ে উঠল। চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠল। হাত জোড় করে বলে উঠল,

- আমরা নির্দোষ, আচার্য। সম্রাট আমাদের পালনকর্তা। তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

- আরে... আরে...। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি বলেছি তোমরা হত্যাকারী?

ঘাম মুছল একজন আর দ্বিতীয়জন ঢোঁক গিলল। আচার্য আবার প্রশ্ন করলেন,

- রাতে তোমরা কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছ?

- না, আচার্য।

- কিন্তু আমি যদি বলি, একটা আওয়াজ শুনেছ?

দু-জনেই এই আচমকা প্রশ্নে অবাক হয়েছে। সিদ্ধান্তক প্রশ্ন করল,

- কীসের আওয়াজ, আচার্য?

- একটা ধাতুর বাসন মেঝেতে পড়ার আওয়াজ শুনতে পাওনি?

এই কথায় দু-জনেই চমকে উঠল। দু-জনেই সম্মতিতে ঘাড় নাড়ল। সিদ্ধান্তক বলল,

- হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন, আচার্য। এইরকম একটা শব্দ আমরা দু-জনেই শুনেছি বটে!

- হুমম। কখন সেটা শুনেছ, ঠিক সময়টা বলতে পারো?

- পারি, আচার্য। আমরা ওই আওয়াজ শোনার কিছুক্ষণ পরেই রাত তৃতীয় প্রহর শুরু হওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠে বাইরে থেকে।

- হুমম। বেশ। তোমরা আসতে পারো।

প্রণাম জানিয়ে দু-জন সৈনিক বেরিয়ে গেল। চাণক্য নিজের মনেই ভাবলেন, প্রহরী দু-জনেই কিছুটা ভীত, আশঙ্কিত। এটা কি অপরাধীর মনের ইঙ্গিত? না মনে হয়। স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতিতে তারা কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো বলেই মনে হয়েছে ওঁর।

সবার সামনে একজন ভৃত্য এসে চাণক্যের সামনে একটা পাত্রে মধু মিশ্রিত দুধ দিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পানপাত্র তুলে চাণক্য এক চুমুক দুধ খেলেন। তাঁর মনে হল মিষ্টি কম হয়েছে। আরও একটু মধু মেশালে ভালো হত। চাণক্য বরাবরই লক্ষ করেছেন রাজমহলের বাসিন্দারা মিষ্টি কম খায়। তিনি পাশের পাত্র থেকে আরও কিছুটা মধু দুধে ঢেলে নিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে রাজ-বৈদ্য বললেন,

- আচার্য। এত বেশি মিষ্টি খাওয়া আপনার পক্ষে ক্ষতিকর।

একথায় চন্দ্রগুপ্ত শুধুই মৃদু হাসলেন। চাণক্যর অত্যধিক মিষ্টি প্রীতির কথা তাঁর সব শিষ্যর জানা। চাণক্য বৃদ্ধর কথার উত্তরে বললেন,

- আহ। জিভে মিষ্টির স্বাদ আমার মস্তিস্ককে বেশি সক্রিয় করে, মহাশয়।

- এটা সম্পূর্ণ আপনার ভ্রান্ত ধারণা।

রাজ-বৈদ্য তাঁকে আরও কিছু বলতেন কিন্তু তার আগেই চাণক্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন,

- বৈদ্য মহোদয়। ওই জলের পাত্র যে সময়ে মাটিতে পড়ে যায়, অনুমান করা যেতে পারে সেই সময়েই আততায়ী হত্যা করে। মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

- সময়ের হিসেব ঠিকই আছে, আচার্য। আমি সকালে যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করি, সেইসময়ে মৃতদেহ সবে কঠিন হওয়া শুরু হয়েছে। তার থেকে আমার অনুমান রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষে বা তৃতীয় প্রহর শুরুর দিকেই মৃত্যু ঘটেছে।

- হুমম।

আরও এক চুমুক দুধ পান করে চাণক্য মহা-অমাত্যকে বললেন,

- আর্য। এইবার দয়া করে ছাদে পাহারায় থাকা সৈনিকদের পাঠিয়ে দিন।

৭.

গতকাল রাতে উত্তর মহলের ছাদে পাহারায় ছিল মোট আট জন। তারা প্রত্যেকেই এখন চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তর সামনে দাঁড়িয়ে। চন্দ্রগুপ্ত নিঃশব্দে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। সৈনিকরা এরপর চাণক্যকে অভিবাদন জানাল। চাণক্য প্রথমে কিছুক্ষণন কিছুই না বলে তাদের ভাবভঙ্গি এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন।

একজন অপরাধীর আচরণ বা বাচনভঙ্গি থেকে অনেক কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়। অশান্ত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক চাওয়া, যতটা সম্ভব আড়ালে দাঁড়ানো, সামনের ব্যক্তির সঙ্গে নজর না মেলানো বা হঠাৎ হঠাৎ শরীরে মৃদু কম্পন*। এই সমস্ত আচরণই একজন অপরাধীর ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিত্বের আচার আচরণে চাণক্য নিজে বহুবার এগুলো লক্ষ করেছেন। এদের একজনের মধ্যেও কি তিনি সেরকম কিছু লক্ষ করলেন? নাহ্। সম্রাট এবং তাঁর উপস্থিতিতে যতটা স্বাভাবিক থাকা সম্ভব, এরা তাই আছে।

চাণক্য বললেন,

- প্রত্যেকে একে একে নিজের পরিচয় দাও। সেইসঙ্গে এটাও বোলো যে কতদিন ধরে সৈনিক পদে বহাল আছ।

প্রত্যেকের উত্তর থেকে জানা গেল যে সবাই কম-বেশি চার বছর পুরোনো তো বটেই। কেউ কেউ আবার পাঁচ বছর পুরোনোও আছে। এমনিতেই ন্যূনতম দু-বছর সেনাবাহিনীতে সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কাউকেই রাজমহলের রক্ষী নিযুক্ত করা হয় না। সেনাবাহিনীতে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দক্ষতার প্রমাণ দিলে তবেই তাদের রাজমহলে রক্ষী নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অতএব এরা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য।

চাণক্য তাদের বেশ কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করলেন গতকাল রাতের বিষয়ে। প্রত্যেকেই একে একে উত্তরে দিল প্রতিটা প্রশ্নর। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াল তা যথেষ্ট হতাশাজনক। ছাদের দরজা দিয়ে তারা ছাড়া বাইরের কেউ প্রবেশ করেনি। তাদের সকলের নজর এড়িয়ে কারুর প্রবেশ সম্ভব নয়। কিন্তু

ওই দরজার সিঁড়ি দিয়ে নেমেই তাদের শৌচালয়ে যেতে হয়। তাই আটজনের প্রত্যেকেই একে অন্যকে এক অথবা একাধিকবার ছাদের দরজা দিয়ে নামতে দেখেছে। কিন্তু নেমে গিয়ে কী করেছে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা কেউই দেখেনি। কেউই পাহারা থেকে খুব বেশিক্ষণ সময়ের জন্যে অনুপস্থিত ছিল না।

চাণক্য নিজের মনেই ভাবলেন যে যদি কেউ হত্যার উদ্দেশ্যে ঢুকে থাকে, তাতে অত্যধিক সময় লাগার কথাও নয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, এই আটজনের মধ্যে যে কেউই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে, দরজা খুলে হত্যা করে ছাদে ফিরে আসতে পারে। সিঁড়ির শেষেই নীচের ঘরের দরজা। অতিথিশালার ছাদের সিঁড়ির দরজা ভেতর থেকে লাগানো ছিল না সেটা দেখেছেন। অতএব সকলেরই সমান সুযোগ ছিল হত্যা করার। তাদের এই প্রশ্ন করায়, প্রত্যেকেই নিজেদের ইষ্টদেবের নামে শপথ করে বলল যে তারা হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বরং গতরাতে যে নীচের ঘরে কোনো অতিথি ছিলেন, এ তথ্যই তাদের অজানা ছিল। তারা নির্দোষ।

আচার্য চাণক্য নিজেও কিছুটা হতাশ হয়ে তাদের সবাইকে বিদায় দিলেন।

সবাই বেরিয়ে যেতে সম্রাট প্রশ্ন করলেন,

- কিছু আন্দাজ করতে পারলেন, আচার্য?

নিরাশ কণ্ঠে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- কিচ্ছু না। সন্দেহভাজনের তালিকা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এদের মধ্যে যে কেউই শত্রু দেশের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। যে কেউই হত্যাকারী হতে পারে। অপরাধী ধরা না পড়া পর্যন্ত এদের কাউকে পাটলিপুত্র ত্যাগ না করার নির্দেশ দেবেন। নিশ্চিতভাবে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

- বেশ।

অপেক্ষারত অমাত্য কৃষ্ণনাথ চাণক্যর কাছে জানতে চাইলেন,

- এরপর কাকে পাঠাব, আচার্য?

- গান্ধারের দু-জনকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন করতে চাই। প্রধান অমাত্য মহাশয়, যেকোনো একজনকে প্রথমে আসতে বলুন।

** এই পর্বে বর্ণিত অপরাধী শনাক্ত করার লক্ষণগুলো বাস্তবেই অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।*

৮.

- তোমার নাম?

- আমার নাম অন্ধকা।

প্রশ্নকর্তা আচার্য চাণক্য এবং উত্তর দিচ্ছে গান্ধারের পাচক।

- হুমম। কতদিন ধরে শুকদাস মহাশয়ের পাচকের কাজ করছ?

- তা অনেক দিন। তিন বছর হবে।

- গতকাল সন্ধে থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রম সংক্ষেপে বলতে পারো?

একটু ভেবে নিয়ে পাচক বলল,

- নিশ্চয়ই পারি। মহলে প্রবেশের পরেই শুকদাস মহাশয় মহা-অমাত্যর সঙ্গে মহল ভ্রমণে চলে গেলেন। এরপর থেকে আমি রান্নার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। সমস্ত ব্যঞ্জন, রুটি, ফল-মূল, বাসন, রান্নার চুলা অবশ্য রাজভাণ্ডার থেকেই দেয়া হয়। সবার চোখের সামনেই আমি রান্না করি। অমাত্য ছাড়াও আরও পাঁচজন সৈনিক সারাক্ষণই আমার আশেপাশে ছিল। রাতে আমি নিজে সব খাবার সাজিয়ে মনিবকে খেতে দিই। প্রতিটা খাবার আমি নিজের হাতে প্রথম টুকরো কেটে আগে কুম্ভকে খেতে দিই। কুম্ভ মানে খাবার-পরীক্ষক। পুরোটাই অমাত্য এবং বাকি প্রহরীদের চোখের সামনে ঘটে। শুকদাস মহাশয়ের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি চলে যাই নিজের ভৃত্য-গৃহে। কুম্ভও আমার সঙ্গেই চলে আসে। আমার কোনো দোষ নেই মহাশয়।

সম্রাট এবং চাণক্যর প্রতি হাত জোড় করে অন্ধকা।

- হুম।

- আমি নির্দোষ, মান্যবর। আমি কিছুই করিনি। আমি ব্রাহ্মণ দেবের পুরোনো বিশ্বস্ত লোক। আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি অমাত্য কৃষ্ণনাথ মহাশয় এবং প্রহরীদের জিজ্ঞেস করুন, আমি যা বলেছি তা সত্যি কি না। তাঁরা সর্বক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলেন।

- রাতে আর দেখা করতে যাওনি মনিবের সঙ্গে?

- একবারও না। আমি এক ঘুমে সকালে উঠেছি। আমার ঘরের বাইরে প্রহরী ছিল। তারাই সাক্ষী দেবে।

- হুমম। আজ সকালের ঘটনা বলো।

- সকালে খাওয়ার জন্যে সামান্য ফল-মূল সাজিয়ে আমি এবং কুম্ভ অতিথিশালায় উপস্থিত হই। কিন্তু আমি ডাকতে ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না। আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ দরজা খুললেন না। আমরা এবং সঙ্গে দুই প্রহরী অনেক ডাকাডাকি করলাম। লাভ হল না। তারপর একজন খবর দিল অমাত্য মহাশয়কে। তাঁর ডাকেও সাড়া না দিতে তিনি সম্রাটকে খবর দেন। সম্রাট নিজে এসে দরজা ভাঙার আদেশ দিলেন। দরজা ভাঙা হলে আমরা সকলে ভেতরে ঢুকি। আর তখনই আমরা ব্রাহ্মণদেবের মৃতদেহ দেখতে পেলাম।

- হুম। একাদশীর তিথিতে কী কী বিশেষ পদ রান্না করতে?

এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্নে পাচকটি একটু থতোমতো হয়ে যায়। উত্তর দিল,

- রোজকার যা করি...

উত্তর শেষ করতে না দিয়েই পরের প্রশ্ন করলেন আচার্য,

- শেষ প্রশ্ন, কাল রাতের থালা আর উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো ঘর থেকে পরিষ্কার করোনি কেন?

আমতা আমতা করে উত্তর দিল,

- আসলে বাড়িতেও থালা আমি তুলতাম না। অন্য ভৃত্য এসে থালা তুলত। তাই কাল রাতেও ওটা সরানোর কথা খেয়াল ছিল না।

- বেশ। তুমি আসতে পারো। ওই খাবার-পরীক্ষক... কী যেন নাম বললে? হ্যাঁ... কুম্ভকে পাঠিয়ে দাও।

অন্ধকা ঘর থেকে বেরোতেই দ্বিতীয়জন ঢুকল। এগিয়ে এসে প্রণাম জানাল উপস্থিত প্রত্যেককে। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- নাম কী তোমার?

- আজ্ঞে... কুম্ভ।

- কতদিন কাজ করছ শুকদাসের কাছে ?

- আমি ওঁর কাছে কাজ করি না। আমি গান্ধারের মহলে মেজোরানির খাবার-পরীক্ষকের কাজ করি।

- সে কী? তাই নাকি? তুমি তো গান্ধার-রাজের নিজের লোক তবে। তাই না?

এই প্রশ্নে ভৃত্যটির মুখে আশঙ্কার কালো মেঘ নেমে এল। সহজেই সে অনুমান করতে পারছে যে এর ফলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা সবচেয়ে কম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও সচকিত হয়ে তার দিকে চাইলেন একবার। কাঁপা কণ্ঠে সে উত্তর দিল,

- মান্যবর, আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি নির্দোষ। আমি কিছু জানি না। ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ আমি করিনি।

- হুম। তুমি তার মানে পাচক অন্ধকাকে আগে চিনতে না?

- না, হুজুর। কয়েকদিন আগেই রাজার আদেশে আমায়, শুকদাস আর অন্ধকের সফরসঙ্গী হতে হয়েছে।

- হুম। গতকাল থেকে আজ সকাল অবধি নিজের গতিবিধি বর্ণনা করো।

সামান্য ভেবে নিয়ে কুম্ভ উত্তর দিল,

- গতকাল এসে থেকে আমি নিজের ভৃত্য গৃহেই ছিলাম। আমি এবং অন্ধকা একই ঘরে। সে অবশ্য রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল সূর্যাস্তর পর থেকেই। আমি নিজের ঘরেই ছিলাম। পরে, শুকদাস মহাশয়ের রাতের খাওয়ার সময়ে আমার ডাক পড়ে অতিথিশালায়। অন্ধকা একটা একটা করে খাবার প্রথমে আমায় দিত, আমি তা মুখে দেয়ার পরে তবেই ব্রাহ্মণের থালায়

সেগুলো সাজাতে থাকে অন্ধকা। অন্নর প্রথম গ্রাস আমি খাই, রুটি ও ফলের প্রথম টুকরোও আমিই প্রথম খাই। প্রতিটা খাবারপরীক্ষা হয়ে গেলে, তবেই ব্রাহ্মণ খাওয়া শুরু করেন। এরপর আমরা দু-জনই একসঙ্গে ঘরে ফিরে আসি। অন্ধকা ঘুমিয়ে পড়ে। আমার অবশ্য ঘুম কিছুটা দেরিতে আসে। এরপর আজ সকালে অন্ধকার সঙ্গেই আমি প্রাতরাশ নিয়ে যাই অতিথিশালায়। গিয়ে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমরা সকলেই অনেক ডাকাডাকি করলাম। অমাত্য মহাশয় এবং সম্রাট এলেন। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া না পেয়ে সম্রাট দরজা ভাঙতে বলেন প্রহরীদের। দরজা ভাঙার পর আমরা ভেতরে ঢুকি। দেখলাম... উফফ! সে বড়ো ভয়ংকর দৃশ্য!

- হুম। আচ্ছা, হাফুস* ফল খেয়েছ কখনো?

আচার্য চাণক্যর এহেন সম্পূর্ণ আচমকা এবং উদ্ভট প্রশ্নে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে,

- হাফুস? মানে আপুস আম? আজ্ঞে, হ্যাঁ মহাশয়। দু-একবার খেয়েছি।

- কেমন খেতে? কোথায় খেয়েছ?

- আজ্ঞে, সে আম বড়োই সুস্বাদু। মধুর মতো মিষ্টি এবং বাতাসে তার সুগন্ধ দূর থেকে পাওয়া যায়। গান্ধারের রাজমহলে খাবার-পরীক্ষকের কাজ করার সুযোগেই দু-এক টুকরো খেতে পেরেছি। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে মহাশয়!

- বেশ, বেশ। তুমি আসতে পারো।

উপস্থিত সকলকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

*হাফুস/আপুস - আলফানসো আম।

৯.

চাণক্য মুখ ফেরালেন সভায় উপস্থিত বাকি তিনজনের দিকে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিত মুখে অন্যদিকে চেয়ে ভাবছেন কিছু। কিন্তু অমাত্য কৃষ্ণনাথ এবং বৃদ্ধ রাজ-বৈদ্য অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আচার্যর দিকে চেয়ে আছেন। তাঁদের দেখে আচার্য স্মিত হেসে বললেন,

- কী হল? আমার প্রশ্ন অবান্তর মনে হল?

কয়েকটা প্রশ্ন তাঁদের অবশ্যই অবান্তর মনে হয়েছে। হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে আপুস আমের কী সম্পর্ক থাকা সম্ভব তা কারুরই মাথায় এল না। এটা কি চাণক্যর মিষ্টি খাবারের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের ফল? বোধ হয় প্রশ্নের মাঝেই ওঁর মাথায় মিষ্টি আমের চিন্তা চলে এসেছিল। কিন্তু মনে এই কথা ভাবলেও চাণক্যর সামনে মনের ভাব প্রকাশের সাহস তাঁরা দেখালেন না।

তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে চাণক্য মনে মনে হাসলেন। বললেন,

- একটা ছোট্ট পরীক্ষা করছিলাম। বাদ দিন। এইবার আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চাই যদি অনুমতি দেন।

- অবশ্যই।

- বেশ। বৈদ্য মহাশয়। আপনি হত্যার বিষয়ে আপনার নিজস্ব অভিমত বলুন। অতি সামান্য কোনো তথ্যও বাদ দেবেন না।

বৃদ্ধ নিজেকে সামান্য গুছিয়ে নিয়ে অনেকটা বৃদ্ধ অধ্যাপকের ভঙ্গিতে বললেন,

- আমার আলাদা করে বলার কিছু নেই। মৃতদেহর হাতের নীলবর্ণ নখ ও মুখ থেকে নির্গত ফেনা থেকে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে। দেহে অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন পাইনি। মৃতদেহ ইতিমধ্যে যতটা কঠিন হয়েছে, তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে মৃত্যু রাত দ্বিতীয় প্রহরের শেষ থেকে তৃতীয় প্রহরের শুরুর ভেতরেই হয়েছে। শলাকার তীব্র বিষের সামান্য একটা ক্ষতেই মৃত্যু হওয়া সম্ভব। তবে... নাহ্। আর সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এই যা।

- কিছু একটা মনে হয় বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মহাশয়। প্রার্থনা করব, তা যতই অবান্তর মনে হোক, আমাকে বলে ফেলুন। এই মুহূর্তে কোন তথ্য অবান্তর এবং কোন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিচারের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।

একটু ভেবে বৃদ্ধ বললেন,

- সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আসলে, মৃতদেহর হাত, পায়ের তালু এবং নখ যে পরিমাণ গভীর নীলবর্ণ হয়েছিল তাতে প্রথম দর্শনে আমি ভেবেছিলাম মৃত্যু বোধ হয় রাতের প্রথম প্রহরের দিকে হয়েছে। কারণ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে শরীরে বিষক্রিয়া হলে অতটা গভীর নীল হয়ে পড়ে নখ। তবে দেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে সেই ভুল ভাঙে। আমি নিশ্চিত যে ওই রাত দ্বিতীয় প্রহরের শেষ থেকে তৃতীয় প্রহরের শুরুর ভেতরেই মৃত্যু ঘটেছে। তার আগে নয়। শলাকায় ব্যবহৃত বিষ, নিশ্চয়ই কোনো অজানা মারণ বিষ, যা এত কম সময়ে শরীর নীলবর্ণ করতে সক্ষম।

চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি দেখা গেল। মেঝের দিকে চেয়ে গভীরভাবে কিছু যেন চিন্তা করছেন। কৃষ্ণনাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। ইশারায় ওঁকে আচার্যর চিন্তাসূত্র ভঙ্গ করতে বারণ করলেন। এই মুদ্রা চন্দ্রগুপ্তর অতি পরিচিত। তিনি কোনো সূত্র পেয়েছেন। গভীরভাবে চিন্তা করার সময়ে আচার্যর কপালে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। এই সময়ে চিন্তাসূত্রে বাধা পড়াটা একদমই পছন্দ করেন না তিনি।

নন্দ সাম্রাজ্যর বিরুদ্ধে বিদ্রোহর দিনগুলোতেও, বহুবার চন্দ্রগুপ্ত নিজের আচার্যকে এভাবেই চিন্তামগ্ন থাকতে দেখেছেন। বেশিরভাগ সময়েই এর ফলাফল ইতিবাচক হয়ে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর আচার্য নিজেই চিন্তাজাল থেকে বেরিয়ে এলেন। কৃষ্ণনাথের দিকে ফিরে বললেন,

- হুমম। কী জানি করছিলাম... ও হ্যাঁ। আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব প্রধান-অমাত্য মহাশয়। আপনি কাল রাত থেকে ঘটনাগুলো আমায় আরও একবার বলুন।

পানপাত্র থেকে খানিকটা জলপান করে গলা ভিজিয়ে নিলেন কৃষ্ণনাথ। তারপর শুরু করলেন,

- গতকাল সভার শেষের দিকে গান্ধারের দূত হিসেবে ব্রাহ্মণ শুকদেব উপস্থিত হন। আলোচনা হয় সম্রাটের সঙ্গে। কথা শেষে সম্রাট ওঁকে বিশ্রাম করতে বলেন। আমি নিজে ওঁকে অতিথিশালার সবচেয়ে ভালো ঘরটা বেছে দিই। যদিও এখন মনে হচ্ছে সেটাই ভুল করে ফেলেছি। মানে, অন্য কোনো ঘরে তাঁর থাকার আয়োজন করলে হয়তো এই বিপত্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত। অন্য ঘরে ছাদের দিকের সিঁড়ির দরজা থাকত না।

- নিজের ওপর দোষ দেবেন না, মহাশয়। নিয়তি বড়োই অলঙ্ঘ্যনীয় বস্তু। তার সামনে আমরা বিবশ। আপনি তার পরের ঘটনা বলুন।

- এরপর আমি ওঁকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করাই। সন্ধের দিকে ওঁর পাচক রান্নার কাজ শুরু করে। আমি সবসময়ে নজর রেখেছি। সঙ্গে আরও পাঁচজন প্রহরী রেখেছিলাম তার ওপর নজর রাখতে। তাদের বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলাম খেয়াল রাখতে যাতে খাবারে বিষ জাতীয় কিছু না মেশাতে পারে। সঙ্গে রাজ-পাচক নিজেও উপস্থিত ছিল। যাতে রান্নার মাঝেও কোনোরকম অসংগতি দেখা দিলে তার নজর না এড়িয়ে যায়। আমি তাদের জিজ্ঞেসও করেছি আজকে। প্রত্যেকে নিশ্চিত করে বলেছে যে রান্না হওয়া থেকে ব্রাহ্মণের খাবার খাওয়া অবধি বিষ মেশানো হয়নি। এরপর প্রথম গ্রাস তথা রুটি ও ফলের প্রথম টুকরো কেটে কেটে পাচক অন্ধকা আমার সামনেই পরীক্ষককে দেয়। খাবার-পরীক্ষক কুম্ভ তা উদরস্থ করে। এমনকী পানীয় জল এবং দুধও আগে পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেয়া হয়েছিল। খাবারে বিষ নেই তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই শুকদাস তা গ্রহণ করেন। ওঁর খাওয়া শেষ হওয়ার পর তিনি নিজে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেন। সেই অবধি নিজে ওঁকে জীবিত দেখেছি।

- হুমম। পাচক ডান হাতি না বাঁ-হাতি?

- ডান হাতি। কেন বলুন তো?

- কিছুই না। আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা নিলাম। ও যে ডান হাতি তা আমিও লক্ষ করেছি। আপনি সেটা লক্ষ করেছেন কি না নিশ্চিত হলাম। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণ মৌন বসে ছিলেন সিংহাসনে। এইবার বলে উঠলেন,

- বেশ। তবে আপনারা একটু একান্তে থাকতে দিন আমায় এবং আচার্যকে। আমাদের কিছু কথা আছে।

কৃষ্ণনাথ আর রাজ-বৈদ্য তাঁদের দু-জনকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের বেরিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন সম্রাট। তারপর বললেন,

- আচার্য, আমার মনে একটা সন্দেহ এসেছে।

- বলো, কী সন্দেহ।

লোকসম্মুখে চাণক্য শিষ্যকে তার সম্রাট পদের সম্মান দিয়ে 'আপনি' সম্বোধন করলেও, একান্তে তা 'তুমি' তে নেমে আসে সহজেই। চন্দ্রগুপ্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন,

- গুরুদেব। এই গুপ্ত কথাটা বিশেষ কেউই জানে না যে আপনি আমায় বাল্যকাল থেকে সামান্য পরিমাণে বিষ খাইয়ে এসেছেন। এবং তা আজও আমি নিয়মিত গ্রহণ করি আপনার নির্দেশমতো। এত বছর ধরে শরীরে বিষ ঢোকার ফলে আমার শরীরে কোনোরকম মারণ বিষের প্রভাব পড়ে না। কিন্তু আচার্য, এই খাবার-পরীক্ষকও তো সেরকমই হতে পারে? হয়তো খাবারে বিষ ছিল, কিন্তু গান্ধার জেনে বুঝেই সেইরকম কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষক করে পাঠিয়েছে যার শরীরে বিষের প্রভাব পড়বে না।

- আমি বুঝতে পারছি তুমি ওই গান্ধারের ভৃত্য দুটিকেই সন্দেহ করছ। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এই হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি লাভ গান্ধারেরই হবে। তারা সোজাসুজি এইবার মৌর্য সাম্রাজ্যর অংশ হতে অস্বীকার করবে। এবং এইবার তাদের হাতে যথাযথ কারণও থাকবে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত, ভুলে যেয়ো না যে ওই খাবারে যে বিষ ছিল না সেটা আমরা নিজেরাই আজ সকালেই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখেছি। তবুও তোমার যদি সন্দেহ থাকে, তবে একটা সামান্য পরীক্ষা করে দেখা যেতেই পারে।

- কী পরীক্ষা??

মৃদু হেসে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- রাজ-বৈদ্যর সঙ্গে পরামর্শ করে, খাবার-পরীক্ষক কুম্ভর খাবারে সামান্য পরিমাণ বিষ মিশিয়ে দিতে বলো। খুবই অল্প পরিমাণে যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলো যেন দেখা দেয়। আগামীকাল

যদি তার শরীর খারাপ করে, তবেই তুমি নিশ্চিত হবে যে তার ওপর বিষের প্রভাব আছে কি না।

চাণক্যর দিকে চেয়ে থাকলেন চন্দ্রগুপ্ত। এহেন উপায় একমাত্র তাঁর গুরুর মস্তিস্ক থেকেই বেরোনো সম্ভব। চন্দ্রগুপ্তর আরও একবার মনে পড়ল কেন তাঁর গুরুকে সারা আর্যাবর্ত 'কৌটিল্য' নামে ডাকে।

১০.

আচার্য চাণক্য শিষ্য জীবসিদ্ধিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা শোনাচ্ছিলেন। ঘটনার পর ইতিমধ্যে দু-দিন অতিবাহিত হয়েছে। রাজকার্যে জীবসিদ্ধিকে গত এক মাসের জন্যে ভিনরাজ্যে থাকতে হয়েছে। আজকেই পাটলিপুত্রতে ফিরেছে সে। এবং স্বভাবসিদ্ধভাবেই প্রথমেইগুরুর কুটিরে এসেছে।

চাণক্যর প্রিয় ছয় ছাত্রর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি অন্যতম। নন্দ শাসনের সময়ে জীবসিদ্ধি চাণক্যর গুপ্তচর হিসেবে এই মগধেই বহাল ছিল। শত্রু শিবিরের সমস্ত গোপন খবর, চাণক্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দুঃসাহসিক গুরুদায়িত্বটা তার ওপর ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে, চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়ে চাণক্য কিছুকাল নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি অমাত্যদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিজে রাজকার্য থেকে অবসর নেন। রাজমহল ছেড়ে অদূরেই এক নিরিবিলি জায়গায় নিজের কুটিরে সন্ন্যাসীর জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। আরও একটা কাজে এই মুহূর্তে চাণক্য ব্রতী হয়েছেন। বংশপরম্পরায় সঞ্চিত জ্ঞান এবং নিজস্ব জীবনে অর্জিত যাবতীয় অনুভব তিনি একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে যেতে চান 'অর্থশাস্ত্র' বইয়ে। অবসরের পর থেকে তিনি লেখালেখিতেই ডুবে থেকেছেন। এই অবসর জীবনে শিষ্য জীবসিদ্ধিই তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তর সভাসদ পদ সে অস্বীকার করে এবং নিজেও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বেশ নিয়ে পাটলিপুত্রতেই থেকে গেছে।

গত দু-দিনে হত্যাকাণ্ডর কথা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। খোদ সম্রাটের অন্দরমহলে হত্যাকাণ্ড ঘটলে তা ছড়িয়ে পড়ার মতনই ঘটনা বটে। জীবসিদ্ধি সেই খবর পেয়েই ফিরে এসেছে। এতক্ষণ বিশদে পুরো ঘটনাটা শুনছিল আচার্যর কুটিরে বসে। এই পর্যন্ত শুনে প্রশ্ন করল জীবসিদ্ধি,

- তারপর? খাবার-পরীক্ষকের ওপর বিষক্রিয়া পরীক্ষা করিয়েছিলেন সম্রাট?

- হুমম।

- তো? তাতে কী ফল হল?

- গতকালই চন্দ্রগুপ্ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে কুম্ভর ওপর বিষ প্রভাব ফেলেছে। দু-দিন আগে সামান্য বিষ তার খাবারে মিশিয়ে দেয়া হয়। পরের

দিনই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। বৈদ্যর ওষুধের গুণে গতকাল সে আরোগ্য লাভও করেছে।

- এ তো বড়োই গম্ভীর সমস্যা, আচার্য। আপনি সমস্যার সমাধান সূত্র পেলেন কিছু?

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আচার্য বললেন,

- যেকোনো রহস্যর সম্পূর্ণ সমাধানের জন্যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করতে হয়। 'কে?', 'কেন?' এবং 'কীভাবে?'। এই হত্যাকাণ্ডে 'কেন?'-র উত্তর সহজ। রাজদূতকে হত্যার যথেষ্ট কারণ আমাদের শত্রুপক্ষের আছে। এইবার আসা যাক 'কে?'-তে। যার ওপর আমার প্রবল সন্দেহ, তাকে অভিযুক্ত করার মতো প্রমাণ নেই। যতক্ষণ না 'কীভাবে?' হত্যা করা হয়েছে এই প্রশ্নর উত্তর খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

খানিক ভেবে জীবসিদ্ধি বলল,

- গান্ধার থেকে আসা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্যিই কোনো কিছু প্রমাণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু গুরুদেব, আপনি নিজেই তো জিজ্ঞাসাবাদের সময় দ্বাররক্ষীদের দিকে সন্দেহর ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন ঢুকে হত্যা করতেই পারে। তাই নয় কি?

- ওহে জীবসিদ্ধি, সামান্য বুদ্ধি ব্যবহার করো। আমি ওই কথা শুধুমাত্র ওই প্রহরীদের ভয় পাওয়াতে বলেছিলাম। তাদের সামান্য বুদ্ধি থাকলে তারা নিজেরাই প্রমাণ করতে পারত যে এই উপায়ে, তাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব নয়।

- কেন?

- পরের দিন দেখা গেছে অতিথিশালার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যদি প্রহরীদের মধ্যে কেউ হত্যা করেও থাকে, তবুও তার পক্ষে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করাটা অসম্ভব।

- তাই তো! ঠিক কথা।

- হুম।

- তবে ছাদের প্রহরীরা? তাদের তো প্রত্যেকেরই সুযোগ ছিল।

- হ্যাঁ। সম্ভব। তাদের আটজনের যেকোনো একজনের পক্ষেই হত্যাকারী হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

- কী প্রশ্ন, আচার্য?

- যদি ঘরের মধ্যে ঢুকেই হত্যা করতে হয় তবে ওই বিষাক্ত শলাকাই কেন? ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে ছুরি বসিয়ে বা গলায় তলোয়ার চালালেই হত। সেটাই অনেক সহজ পদ্ধতি। অকারণ বিষ প্রয়োগের কী প্রয়োজন? তাও আবার ওই শলাকায়?

উত্তর জীবসিদ্ধির কাছে নেই। তাকে চিন্তিত দেখে চাণক্য কৌতুক ছলে বললেন,

- ভাবো, ভাবো। বুদ্ধি ব্যবহার করো। আমিও গত দু-দিন ধরে ভাবছি। কিন্তু যতই ভাবছি ততই জটিল হয়ে যাচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডর সবচেয়ে সমস্যার বিষয় কোনটা জানো?

- কোনটা?

- এই ক্ষেত্রে সবার জবানবন্দি একে অন্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কারুর কথায় কোনো ফাঁক নেই। শুধু একজনের বাদে...

- কার?

- নিজেই ভেবে বলো।

- আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা আপনি ভালোই জানেন, আচার্য। আপনার মতো অনুধাবন ক্ষমতা আমার নেই।

- হুম।

- আমি শুনলাম ইতিমধ্যে গান্ধারে হত্যাকাণ্ডর খবর পৌঁছে গেছে। অম্বিক এবং তার আচার্য শকুনি অন্য রাজাদের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতবিরোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এবং গান্ধারের দুই নাগরিক, অর্থাৎ পাচক আর খাবার-পরীক্ষককে অবিলম্বে গান্ধারে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়েছে। আচার্য, তবে কি যুদ্ধ হবেই?

- হুমম। রহস্যর সমাধান করতে আমি সক্ষম না হলে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এবং তাতে ফলাফল নির্বিশেষে, মগধের ক্ষতি। আর্থিক ক্ষতি এবং প্রাণহানি।

খানিকক্ষণ দু-জনের কেউই কথা বলল না। চাণক্যই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন,

- আমার মন বলছে যে সমাধান আমার চোখের সামনেই আছে। কিছু একটা অতি সামান্য তথ্য বা ঘটনা সেদিন উল্লেখ করা হয়েছে বা ঘটেছে যা এই রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি। আমি তা দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। কিছু একটা সূত্র আমার সামনেই আছে কিন্তু আমি ধরতে পারছি না।

চাণক্যর কপালে তীব্র ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে। যেন তীব্র মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। আচার্যকে এভাবে দেখে জীবসিদ্ধির দুঃখ হল। আচার্যর মন হালকা করতে বলে উঠল,

- আচার্য। আমি আপনার জন্যে দক্ষিণের রাজ্য থেকে কী নিয়ে এসেছি দেখুন।

জীবসিদ্ধি নিজের কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা প্রমাণ আকারের তরমুজ বের করে আনল। সঙ্গে শালপাতায় মোড়া নারকোলের মিষ্টি। আচার্যর মিষ্টির প্রতি ভালোবাসার কথা তাঁর শিষ্যমাত্রেই জানে।

- শুকনো নারকোলের মিষ্টিটা কয়েকদিন থাকবে। কিন্তু এই তরমুজটা টাটকা থাকতে থাকতেই শেষ করতে হবে। বিক্রেতা দাবি করেছে এটা মধুর মতো মিষ্টি হবে।

শিষ্যর প্রফুল্লতা কিছুটা চাণক্যর মধ্যেও সঞ্চারিত হল। জীবসিদ্ধি নিজেই ততক্ষণে একটা থালা তুলে তাতে তরমুজ কাটার প্রস্তুতি নিতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল।

- আচার্য, একটা ছুরি দেবেন। এটা কাটব।

গুরুর কোনো সাড়া না পেয়ে আবার ডাকল জীবসিদ্ধি,

- আচার্য, কোথায় গেলেন??

এবারও সাড়া না পেয়ে জীবসিদ্ধি বেরিয়ে এল।

- আচার্য...

কথা মাঝপথে থামিয়ে দিল জীবসিদ্ধি। কারণ চাণক্য এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কপালে আর ভ্রূকুটি নেই, বরং তাঁর চোখের তারায় ঔজ্বল্য ফুটে উঠেছে। এই দৃষ্টির সঙ্গে জীবসিদ্ধির বহু বছরের পরিচয় আছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন চাণক্য,

- এই মুহূর্তে রাজমহলের দিকে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেটা চন্দ্রগুপ্তকে দেবে। আমি জানি কে হত্যাকারী। আমি জানি কোন উপায়ে হত্যা করা হয়েছে! সব রহস্যের সমাধান হয়েছে!

১১.

মাঝের একটা দিন প্রায় ঝড়ের গতিতে কেটেছে। মাত্র একদিনের ব্যবধানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত খানিকক্ষণ আগেই গান্ধারকে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। অন্যথায় মগধ পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে গান্ধার আক্রমণ করবে এই কথাও লিখেছেন তাতে। সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর আচার্য চাণক্যর কুটিরে এই মুহূর্তে উপস্থিত আচার্য নিজে আর জীবসিদ্ধি। চাণক্য অতি প্রফুল্ল মনে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। পাশে রাখা ধুনুচি থেকে ধুনো এবং কর্পূর মিশ্রিত সুগন্ধি ধোঁয়া দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে জীবসিদ্ধির।

দু-জনের মাঝে রাখা থালায় ফল-মূল ও মিষ্টি সাজানো। নারকোলের মিষ্টি চাণক্য এক চতুর্থাংশ শেষ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। ওঁরা প্রতীক্ষা করছেন তৃতীয় ব্যক্তির। অন্ধকার নেমেছে নগরের বুকে। সন্ধে হতেই চারদিকের গৃহস্থ কুটিরগুলো থেকে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। আজ সবাই শান্তিতে। গত চারদিন রাজ্যের ওপর যে যুদ্ধ আর অশান্তির ছায়া দেখা দিয়েছিল, তা আজ আর নেই। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল বাইরে

থেকে। কুটিরের সামনে তা থামল। কুটিরের দরজায় কড়া নাড়ল আগন্তুক।

- ভিতরে আসুন, সম্রাট। দরজা খোলা আছে।

আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে বাড়িতে ঢুকলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। দরজা লাগিয়ে গায়ের ঢাকা কাপড় সরিয়ে ফেললেন। প্রথমেই আচার্যর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তারপর জীবসিদ্ধির পাশের আসন গ্রহণ করলেন। জীবসিদ্ধি এতক্ষণ নিদারুণ উত্তেজনা চেপে রেখেছিল। তাই আর থাকতে না পেরে বলে উঠল,

- এইবার তো চন্দ্রগুপ্তও উপস্থিত। এবার বলুন আচার্য রহস্যর সমাধান কীভাবে করলেন। আমি গতকাল থেকে অথই জলে রয়েছি।

জীবসিদ্ধির সুরে সুর মেলান চন্দ্রগুপ্ত,

- হ্যাঁ, আচার্য। আমার কাছেও সব রহস্য পরিষ্কার নয়। আপনি গোড়া থেকেই আরম্ভ করুন।

- একটু ধৈর্য ধরো। আগে একটা খেলা দেখাই তোমাদের।

আচার্য উঠে ভেতরে গেলেন। একটা ছোট্ট ছুরি নিয়ে ফিরলেন। ফলের পাত্র থেকে একটা আঙুর তুলে নিলেন। ছুরি দিয়ে সেটাকে কেটে দু-ভাগ করলেন। পাশে মাটির পাত্রে রাখা একটা গাছের মাটিতে টুকরো দুটো ফেললেন।

- এই গাছের মাটিটায় পিঁপড়ে থাকে। দেখো কী হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আঙুরের দুটো টুকরোতেই পিঁপড়ের ঝাঁক ছেঁকে ধরল। অদ্ভুতভাবে দেখা গেল একটা টুকরোয় ছেঁকে ধরা প্রতিটা পিঁপড়ের মৃত্যু হল। কিন্তু অন্য টুকরোয় থাকা পিঁপড়েগুলোর কিছুই হল না।

সেইদিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে চাণক্য বললেন,

- এই হল হত্যা রহস্যর সমাধান, সম্রাট।

দুই শিষ্য হতবুদ্ধির মতন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে আচার্য বলে উঠলেন,

- বুঝলে না তাও? বেশ। প্রথম থেকেই বলি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে সহজ সমাধানটাই ঠিক সমাধান হয়ে থাকে। এইক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পুরো ঘটনায় কয়েকটা বিষয় প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ছিল। প্রথমত, গান্ধার-রাজ অম্বিকের হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তন। এটা অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সে দূত হিসেবে পাঠাল কাকে? তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অমাত্যকে। সঙ্গে কোনো নিজস্ব সৈনিক পর্যন্ত পাঠাল না। যাতে অনর্থ কিছু ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় চাপানো যায় মগধের ওপর। আমি নিশ্চিত এই সম্পূর্ণ খেলাটার নেপথ্যে রয়েছেন মগধের প্রধানমন্ত্রী আচার্য শকুনি। তিনি জানতেন যে, ব্রাহ্মণ শুকদাসের মৃত্যু যদি পাটলিপুত্রতে ঘটে, তবে এক বাণে দুটো শিকার করা হবে। যে অমাত্য ওঁর গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে

এতদিন, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। এবং সেইসঙ্গেই মগধের বিরুদ্ধে গান্ধারের হাতে একটা মোক্ষম অস্ত্র চলে আসবে। যুক্তি দিয়ে ভাবলেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহর অবকাশ থাকে না যে শুকদাসের হত্যার নেপথ্যে গান্ধারের গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আচার্য শকুনিই এই হত্যা সংগঠিত করিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কীভাবে?

আরও খানিকটা মিষ্টি নিজের মুখে দিয়ে, আচার্য শুরু করলেন,

- প্রথমেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে, অবশ্যই গান্ধার থেকে আসা পাচক আর খাবার-পরীক্ষকের ওপরে। কিন্তু তাদের প্রতিটা গতিবিধি নজরবন্দি ছিল। তবে তারা হত্যা করবে কীভাবে? আমার প্রথম সন্দেহ জাগে হত্যার শস্ত্রটিকে নিয়ে। বিষ-যুক্ত শলাকা। কেন? অন্য কোনো অস্ত্র কেন নয়? যদি রাতে ছাদের দিক দিয়ে আমাদের কোনো সৈনিক ঢুকেই থাকে, তবে সে তলোয়ার দিয়েই হত্যা করবে। এই অতি নাটকীয় হত্যার উপায় কেন বেছে নেবে? ক্রমেই আমার বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে ওই শলাকাটা, আমাদের বিভ্রান্ত করার উপায় মাত্র। আসলে খাবারের সঙ্গেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে খাবারে বিষ নেই। এই বিষয়টাই আসল সমস্যা। এটার সমাধানে একটু পরে আসছি। আপাতত তর্কের খাতিরে যদি শলাকাটাকে ভুলে যাই, তাহলেই কিন্তু বাইরের থেকে হত্যাকারীর প্রবেশের যুক্তিটা আর থাকে না। এবং তাতেই রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। হত্যাকারী অবশ্যই ওই পাচক, অথবা পরীক্ষক, অথবা দু-জনই ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

তাদের প্রশ্ন করলে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের মিথ্যে বলার সম্ভাবনাই বেশি। অন্ধকা কিংবা কুম্ভ, অথবা দু-জনই সম্ভবত গুপ্ত-হত্যাকারী। তারা আসলে পাচক বা খাবার-পরীক্ষক নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যে দু-জনই স্বীকার করেছে যে তারা একে অন্যকে আগে চিনত না। অর্থাৎ যদি একজন মিথ্যে বলে, অপরজন সেটা ধরতে পারবে না। তাই তাদের পরীক্ষা করতে আমি তাদের একটা করে প্রশ্ন করি। পাচক দাবি করে সে গত তিন বছর ধরে ব্রাহ্মণ শুকদাসের কাছে রান্নার কাজ করছে। অথচ যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে একাদশীর দিন সে কী পদ বানায়, সে উত্তর দিল 'রোজ যা হয়'। সব ব্রাহ্মণ বাড়ির পাচকরাই জানে যে একাদশীর দিন ব্রাহ্মণরা অন্ন গ্রহণ করে না। তারা শুধুই ফলাহার করে। অর্থাৎ পাচক অন্ধকা মিথ্যে বলছে। সে খুব সম্ভবত গান্ধারের নিযুক্ত গুপ্ত-হত্যাকারী।

একইভাবে কুম্ভ অর্থাৎ খাবার-পরীক্ষককে প্রশ্ন করি সে হাফুস বা আপুস আম খেয়েছে কি না। এই বিশেষ জাতের আম আমাদের দেশের সবচেয়ে দামি ফলের মধ্যে অন্যতম। এই আম সাধারণত শুধুমাত্র রাজকীয় খাবারেরই অংশ হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ এই আম খাওয়া দুরস্ত, নামও শোনেনি।

কিন্তু এইক্ষেত্রে কুম্ভ হাফুস নাম শুনেই সেটাকে আম বলে চিনল এবং তা সে খেয়েছে বলেও স্বীকার করল। অর্থাৎ সে সত্যিই রাজ পরিবারের খাবার-পরীক্ষকই বটে। গান্ধার-রাজের কর্মচারী শুনেই আমরা তাকে বেশি সন্দেহ করব, তা জেনেও কিন্তু সে সত্য বলেছে। কারণ সে নির্দোষ। নির্দোষের ভয় কম থাকে। মিথ্যে বলার প্রয়োজনও সে বোধ করেনি।

চাণক্য থামতে জীবসিদ্ধি বলল,

- বেশ। অর্থাৎ ওই অন্ধকা নামের পাচকই হত্যাকারী। কিন্তু সে হত্যা করল কীভাবে? খাবারে তো বিষই ছিল না।

- না। খাবারে বিষ ছিল না। কিন্তু খাবারের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণের শরীরে বিষ ঢোকানো হয়েছে।

জীবসিদ্ধি এবং চন্দ্রগুপ্ত দু-জনেই প্রশ্ন করে উঠলেন,

- এটা কীভাবে সম্ভব?

১২.

চাণক্য মিষ্টির অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছেন। বাকিটুকু থেকে আরও একটু তুলে নিয়ে বললেন,

- হুমম। সম্ভব। অতি সরল অথচ অসম্ভব চতুর একটা কৌশলে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্রাটের নিশ্চয়ই মনে আছে হত্যাকাণ্ডর পরের দিনের কথা। যখন আমি উচ্ছিষ্ট খাবারে বিষ আছে কি না পরীক্ষা করতে যাই, সেখানে সমস্ত বাসন এবং উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকলেও, ফল কাটার ছুরিটা সেখানে ছিল না। আমি যখন অমাত্যর কাছে ছুরি চাই, তখন অমাত্য কৃষ্ণনাথ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেন-- 'ছুরি নেই? ছিল তো রাতে... ।' এই কথাটা ওই পরিস্থিতিতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত সামান্য ক্ষুণ্ণও হয়েছিল সেইদিন। অথচ এই কথাটা যদি সেদিনই আমি খেয়াল করতাম, তবে রহস্যর সমাধান সেইদিনই হয়ে যেত। ছুরি সেখানে ছিল না। সমস্ত থালা বাসন পড়ে আছে, শুধু ওই একটা সাধারণ বস্তু নেই। নিশ্চয়ই কেউ সরিয়েছে। কিন্তু কেন? কারণ, সেই ছুরিটাই হল আসল হত্যা-শস্ত্র। হত্যা করা হয়েছে ওই ছুরি ব্যবহার করেই।

- অর্থাৎ? মৃত্যু তো হয়েছে বিষ প্রয়োগে?

চন্দ্রগুপ্তর এই প্রশ্নে চাণক্য মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,

- ঠিক। কিন্তু সেই বিষ খাবারের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ওই ছুরি দিয়ে। পরোক্ষভাবে ওই ছুরি দিয়েই হত্যা করা হয়েছে। একটা সাধারণ ফল কাটার ছুরি, যেমন ধরো এইটা (সামনে পড়ে থাকা ছুরি তুলে নেন আচার্য), এর বাঁ-দিকের ফলায় লাগানো হয় মারণ বিষ এবং ডান দিকের ফলা রাখা হয়

নির্বিষ। শুধু একদিকের ফলা বিষাক্ত। এই ছুরি দিয়ে কোনো ডান হাতি ব্যক্তি যদি ফল বা রুটি কাটে, তবে প্রতি ক্ষেত্রে শুধু প্রথম টুকরোটা হবে নির্বিষ। অথচ পরবর্তী প্রতিটা টুকরো হবে বিষাক্ত। প্রথমবার কাটায় প্রথম টুকরো নির্বিষ হবে, কিন্তু তার সঙ্গেই বিষাক্ত ফলাটা ঘষে যাবে রুটি বা ফলের বাকি অংশের গায়ে। আমি এই ছুরিটাতেও একইভাবে বাঁ-ফলায় বিষ লাগিয়েছি। সাধারণ পিঁপড়ে মারার বিষ। যে কারণে এটা দিয়ে কাটা আঙুরের ডান দিকের ভাগ সাধারণ হলেও অন্য ভাগটা বিষাক্ত। ফলাফল তো নিজের চোখেই দেখলে একটু আগে।

- এ তো সাংঘাতিক কৌশল, আচার্য।

- হুমম। আমি নিশ্চিত এই সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র, এই কৌশল পুরোটা আচার্য শকুনির মস্তিষ্কপ্রসূত। উনি নিজের এই ক্ষুরধার মস্তিস্ক জনকল্যাণে ব্যবহার করলে, আজ আমরা মিত্র হতাম। কিন্তু উনি নিজেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। সেই তক্ষশিলায় অধ্যাপনার সময় থেকেই আমাদের দু-জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তোমরা দু-জনেই সেই সময়ে আমার ছাত্র ছিলে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেইসব কথা।

কিছুক্ষণ অতীতের চিন্তায় ডুবে গেলেন চাণক্য। তারপর বললেন,

- ভেবে দেখো, কী অভিনব হত্যাকৌশল। রুটি এবং ফলের প্রথম যে টুকরোগুলো খাদ্য-পরীক্ষক খাবে, তাতে বিষের চিহ্নমাত্র থাকবে না। অথচ তারপর থেকে যতবারই সেই একই ছুরি দিয়ে রুটি আর ফল কেটে মুখে দিয়েছেন ব্রাহ্মণ, ততবারই নিজের অজান্তেই মারণ বিষ ঢুকেছে তাঁর শরীরে। প্রতি গ্রাসের সঙ্গে তাঁর শরীরে বিষের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেইসঙ্গেই, ছুরির ফলা থেকে বিষও উঠে গেছে। অতিথিশালায় দাঁড়িয়ে থাকা আরও অতগুলো মানুষের চোখের সামনে অপরাধ ঘটেছে। অথচ কেউ টেরও পায়নি। উচ্ছিষ্ট খাবারে যদি বিষ থেকেও থাকে, তা অতি সামান্যই হবে। কারণ প্রতিবার ছুরি দিয়ে এক একটি কাটার সঙ্গেই বিষের পরিমাণ কমে এসেছে। উচ্ছিষ্ট খাবারে আর বিষ না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বিষ ব্যবহারের ফলে ছুরিটার একদিকের ফলার রং নিঃসন্দেহে অন্যদিকের চেয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাই সেটা নজরে পড়ার আগেই পাচক অন্ধকা সরিয়ে ফেলে। হয় সেই রাতেই খাওয়া শেষের পর সেটা সরিয়েছিল, অথবা পরের দিন সকালে যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে, সেই সময়ে। এই সময়ে অন্ধকা আরও একটা কাজ করে। একটা অন্য মারণ বিষ মাখানো শলাকা সবার অলক্ষে ফেলে দেয় ঘরের মেঝেতে। তাতে লাগা রক্ত সম্ভবত কোনো হতভাগ্য পশুর বা পাখির। সে জানত ওইটা আমরা খুঁজে পাব। এবং তাহলেই বিভ্রান্ত হয়ে বাইরে থেকে আততায়ী এসেছিল বলে

অনুমান করে নেব। খাবারে বিষ থাকার কথা মাথায় আসবে না আর। এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড়ো অংশ হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৌশলগুলো। সেই রাতে জেনেবুঝেই উচ্ছিষ্ট খাবার সরিয়ে ফেলেনি পাচক। সে চেয়েছিল যেন সকালে আরও একবার খাবারে বিষ আছে কি না, সেটা পরীক্ষা হোক। এতে তার ওপর থেকে সন্দেহ পুরোপুরি সরে যায়। আমিও প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, যদি না, গতকাল জীবসিদ্ধি আসত।

- আমি? আমি কী করলাম?

বিস্মিত হয়ে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল। স্মিত হেসে আচার্য উত্তর দিলেন,

- তুমি যে তরমুজটা আনলে। ওইজন্যই তো আমার মাথায় সমাধান এল। তুমি তরমুজ কাটার জন্য যেই আমার থেকে ছুরি চাইলে, সেই মুহূর্তে আমার ছুরির কথাটা মনে এল। দু-দিন আগে অমাত্যর ছুরি না থাকার কথাটা মনে পড়ল। মুহূর্তে সব কিছু চোখের সামনে দেখতে পেলাম। সন্দেহ তো আগে থেকেই ছিল পাচকের ওপরে। শুধু হত্যাকৌশলটা আন্দাজ করতে পারছিলাম না। সেটা মাথায় আসতেই পুরো রহস্যের জট খুলে গেল।

- আপনি অসাধারণ, আচার্য!

চন্দ্রগুপ্তর উক্তিটা অগ্রাহ্য করে চাণক্য বললেন,

- এটা একটা প্রায় 'নিখুঁত হত্যাকাণ্ড' ছিল। সম্রাট, তোমার কি সেইদিন রাজ-বৈদ্যর বলা কথাটা মনে আছে? উনি বলেছিলেন যে মৃতদেহর নীল রং দেখে ওঁর প্রাথমিকভাবে সন্দেহ হয়েছিল বিষ প্রয়োগ রাতের প্রথম প্রহরের দিকে করা হয়েছে। ভেবে দেখো, ওঁর অনুমানই কিন্তু ঠিক ছিল। বিষ রাতের শুরুর দিকেই শরীরে প্রবেশ করেছিল। খাবারের সঙ্গে। তারপর বিষ ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। রাত দ্বিতীয় প্রহরের শেষের দিকে বিষক্রিয়ার কারণে, অস্বস্তিতে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙে যায়। বেশিরভাগ বিষেরই উপসর্গ হল গলা শুকিয়ে যাওয়া। এইক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ব্রাহ্মণ জলের পাত্র নিতে পালঙ্ক থেকে হাত বাড়ান। কিন্তু উনি পালঙ্ক থেকে পড়ে যান। সেই মুহূর্তে ওঁর মৃত্যু ঘটে এবং জল ভরতি পাত্র উলটে যায়।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার কথা শুরু করেন আচার্য,

- ওই সামান্য শলাকাটা প্রথম থেকেই আমাদের কতটা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে ভেবে দেখো। আমরা সকালে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলাম যে শলাকার ওই তীব্র বিষেই মৃত্যু ঘটেছে। অথচ ওই শলাকার বিষ আর হত্যায় ব্যবহৃত বিষ সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। শলাকার বিষ অতি তীব্র প্রভাব ফেলে। এই বিষ রক্তর সংস্পর্শে আসার কয়েক মুহূর্তেই মৃত্যু হয়। কিন্তু ছুরিতে ব্যবহৃত বিষ সম্পূর্ণ আলাদা। সেটা প্রভাব বিস্তার করে ধীরে। প্রায় দু-প্রহর সময় ধরে বিষক্রিয়া সারা দেহে ছড়ায়। তারপর মৃত্যু

হয় আক্রান্তর। অর্থাৎ বিষক্রিয়ার মুহূর্ত এবং মৃত্যুর মুহূর্তর মাঝে অনেকটা সময়ের ব্যবধান। রাজ-বৈদ্য নিশ্চিত ছিলেন যে মৃত্যু শেষরাতের দিকে হয়েছে। তাই ধরেই নেন যে বিষ প্রয়োগ সেই সময়েই করা হয়েছে। এই জায়গাটাই বুঝতে ভুল করে ফেলেন তিনি। হত্যা-শস্ত্র হিসাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে শলাকাটাই নির্বাচন করার কারণ হল সেটার ক্ষুদ্রতা। খুব সহজেই সবার নজর এড়িয়ে সেটা নিয়ে ঢুকেছিল অন্ধকা এবং সবার অলক্ষে ওই ছোটো শলাকাটা ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল।

কথা থামিয়ে দুই শিষ্যর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন চাণক্য। বললেন,

- আশা করি, তোমাদের সমস্ত প্রশ্নর উত্তর দিতে পেরেছি। কালকে সন্ধেবেলা রহস্যর সমাধান করতে পেরেই জীবসিদ্ধিকে পাঠাই তোমার কাছে, চন্দ্রগুপ্ত। চিঠিতে নির্দেশ দিই যে এক্ষুনি যেন পাচককে গ্রেফতার করা হয় আর তার ঘর তল্লাশি করা হয়। এই কারণেই অম্বি তার দু-জন লোককে ছেড়ে দেয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছিল। কারণ একবার তারা মগধ ত্যাগ করলে আর কোনোদিনই দোষ প্রমাণ করার উপায় থাকত না। আমি অনুমান করেছিলাম যে ওই একদিকের ফলায় বিষ মাখানো ছুরি সে সাবধানে লুকিয়ে রাখবে। যত্রতত্র সেটা ফেলে দেয়ার সুযোগ পাবে না। কারণ সে নজরবন্দি। তার মনে সর্বক্ষণ ধরা পড়ার ভয় কাজ করবে। এবং ছুরিটাই এই পুরো পরিকল্পনার ভিত্তি। ওটা খুঁজে পাওয়া গেলেই অন্ধকা দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এবং ঘটেছেও ঠিক তাই। এই পুরো ঘটনায় কুম্ভ নামের খাবার-পরীক্ষকটি নিজের অজান্তেই হত্যাকাণ্ডর সহায়ক হয়েছে। সে নির্দোষ।

- জানি, আচার্য। সেই কারণেই, তাকে নিজের দূত করে আজ গান্ধারে পাঠিয়েছি।

চন্দ্রগুপ্তর কথায় মৃদু হাসলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধির দিকে ফিরে বললেন,

- হুম। সাধু। ওহে জীবসিদ্ধি, তুমি কি একটু কষ্ট করে ভাঁড়ার থেকে অন্য একটা ছুরি নিয়ে আসবে? এই ছুরিটা তো তোমাদের খেলা দেখাতে গিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেল। আজ আমরা তিনজন মিলে তোমার আনা তরমুজটার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। এই তরমুজটার জন্যই আজ সম্রাটের জয় হল বটে।

* * *

উপসংহার:

প্রিয় আচার্য,

আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না। আজ আপনার কারণেই একটা অযাচিত যুদ্ধ থেকে মৌর্য সাম্রাজ্য রক্ষা পেয়েছে।

আপনার অবগতির জন্য জানাই, গান্ধার আত্মসমর্পণ করেছে। অম্বির অবশ্য আর কোনো উপায় ছিল না। ব্রহ্মহত্যা আর ষড়যন্ত্রর দায়ে তার নিজের রাজ্যবাসী এবং অন্যান্য রাজারা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। এদিকে তার গুরু, আচার্য শকুনি নিখোঁজ। তিনি তাঁর শিষ্যকে পরিত্যাগ করে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তবে তিনি নাকি আপনাকে এবং মগধকে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছেন। তাঁর সন্ধান করছে আমাদের গুপ্তচরেরা।

আমার প্রণাম নেবেন। আশীর্বাদ করবেন।

ইতি,
আপনার শিষ্য,
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

পুনশ্চ: আপনার অর্থশাস্ত্র লেখার কাজ কতদূর অগ্রসর হল?

---

১. এই গল্পে বর্ণিত হত্যার পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাচীন গ্রিসের এক রানি তাঁর শাশুড়ি, অর্থাৎ রাজমাতাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

২. ভূর্জপত্র বা ভূজপাতা আসলে ভূজ গাছের পাতলা ছাল। এই ছাল একবার ছাড়িয়ে নিলে আবারও গজিয়ে যায়। এই ছাল আদিকালে লেখার কাজে ব্যবহার হত।

References:

1. T. Ganapati Śāstri, *Kouṭaliyam Arthaŝāstra - Śrimulākhyayā vyākhyā*, Raṣtriya Sanskrit Samsthān, New Delhi, Edition 2002, Part -1 and Part – 2.

2. More Sharda Hanumantrao and Pol Hemant Sambhajirao, Poisoning In Ancient India W.S.R. To Kautilya Arthashastra, International Journal of Applied Ayurved Research.

শীল-শাস্ত্র

উপক্রম:

প্রিয় আচার্য,

প্রণাম নেবেন। আপনাকে অবসর সময়েও বিরক্ত করার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি 'অর্থশাস্ত্র' লেখার কাজে পূর্ণ নিমজ্জিত এবং ব্যস্ত, একথাও আমার অজানা নয়। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে যে এর সমাধান করার মতো একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি আপনি।

আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে 'তোসালি'-র শাসক মহিপাল দু-দিন আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর রাজ্য মগধেরই অঙ্গরাজ্য এবং কলিঙ্গর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে, কলিঙ্গর কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে তোসালি বড়োই অপরিহার্য। এহেন সময়ে রাজার মৃত্যুতে সেখানকার উত্তরাধিকারী নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে মগধের প্রতিনিধি হিসেবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিত প্রয়োজনীয়। এমন কেউ যে মগধের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং রাজনীতিজ্ঞ। আমার জানা মতে, আপনার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি এই আর্যাবর্তে দ্বিতীয় কেউ নেই।

আপনি যদি কৃপা করে আপনার যাওয়ার তিথি এবং সময় জানিয়ে দেন তবে আমি একটা ছোটো সৈন্যদল সহ আপনার যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারি।

আপনাকে বিব্রত করার জন্যে একান্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

ইতি,
আপনারই চির অনুগত,
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

চিঠির নীচে রাজকীয় অঙ্গুরী মুদ্রার সিলমোহরে আঙুল বোলালেন আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। পত্রবাহক তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ উত্তর

নিয়ে ফেরার নির্দেশ আছে তার ওপর। একটা ভূর্জপত্র বের করে, কলম দোয়াতে ডুবিয়ে, তাতে উত্তর লিখলেন চাণক্য।

প্রিয় সম্রাট,

আয়ুষ্মান এবং সদা সুমতি ভবঃ। দু-দিন পরে, যাত্রা করব। সঙ্গে জীবসিদ্ধিকেও নিয়ে যাব। সেই অনুসারে ব্যবস্থা নিয়ো।

ইতি,

বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য।

১.

- এই তবে তোসালির দুর্গ। সত্যি বিশাল এর পরিধি, গুরুদেব।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধির ঘোড়া। সামনে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দুর্গটার দিকে দু-জনে চেয়ে আছেন। জীবসিদ্ধির কথা শুনে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- হুম। জীবসিদ্ধি আমাদের আসার খবর দিয়ে তুমি আগেই দূত পাঠিয়েছ তো?

- হ্যাঁ, আচার্য। ওই তো, দেখুন। প্রধান দরজা খুলে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক দিনের যাত্রার পরে মগধের প্রতিনিধি দল পৌঁছেছে তোসালির দুর্গে। ঘোড়ার পিঠে করে আচার্য চাণক্য, ওঁর শিষ্য জীবসিদ্ধি এবং তাঁদের সঙ্গে জনা পঞ্চাশ সৈনিকের দলটা এগিয়ে চলল বিরাট লোহার ফটক পার করে দুর্গের ভেতরে। তাঁদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল এক বলিষ্ঠ যুবক। পরনের রাজবেশ এবং ভূষণ দেখেই যুবককে রাজপরিবারের সদস্য বলে চিহ্নিত করা যায়। ততক্ষণে আচার্য এবং জীবসিদ্ধি ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। যুবক প্রথমেই এগিয়ে এসে জীবসিদ্ধিকে উদ্দেশ করে বলল,

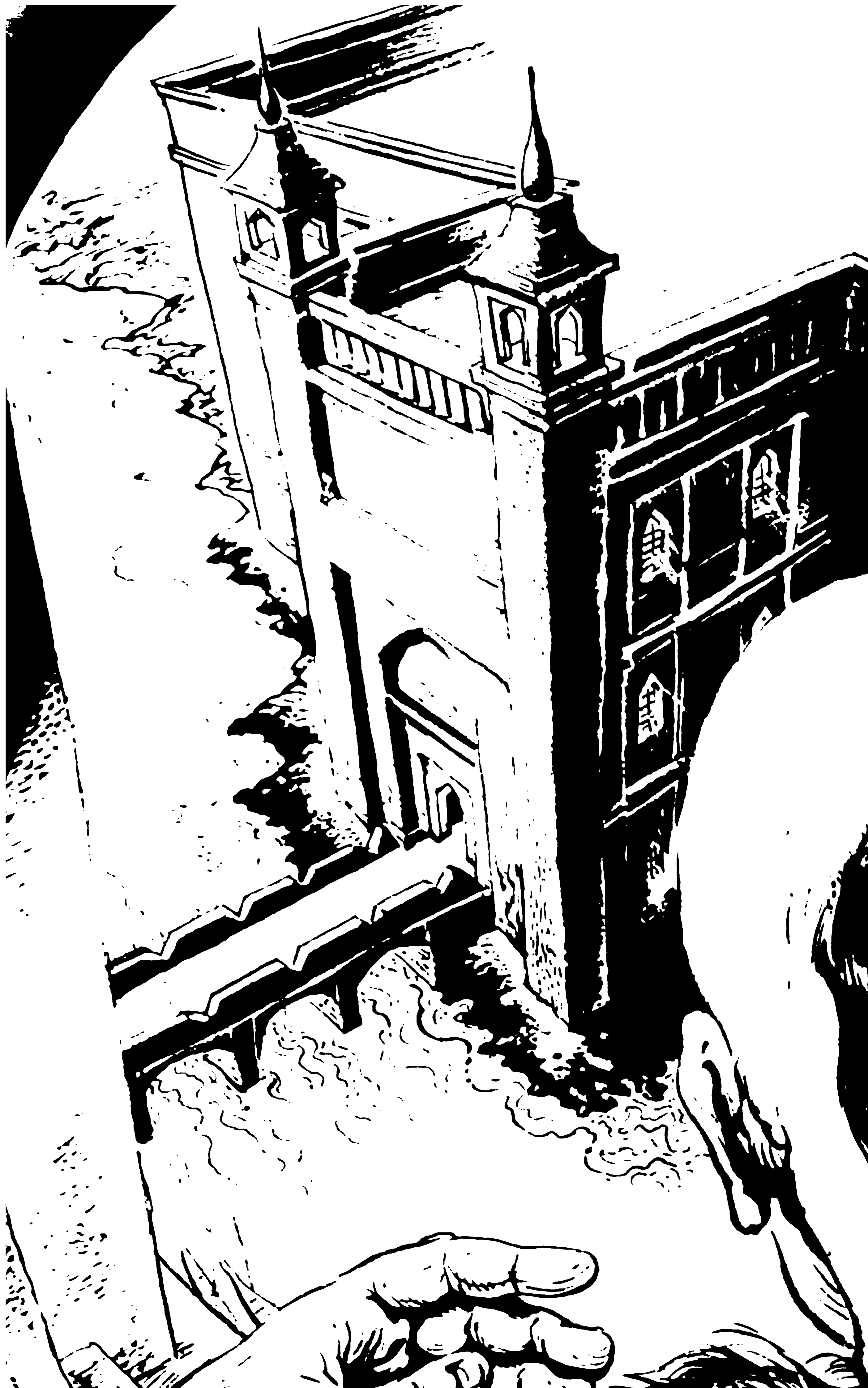
- চাণক পুত্র, মহামতি আচার্য চাণক্যকে আমার প্রণাম।

জীবসিদ্ধি আচার্যর দিকে ইঙ্গিত করে বলল,

- ইনি আচার্য চাণক্য।

যুবক চাণক্যর দিকে চেয়ে বিস্মিত হল। চাণক্য মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন। এই যুবক বোধ হয় কোনো সুদর্শন, দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে আশা করেছিল। বাস্তবে একজন কৃষ্ণবর্ণ, অতি সাধারণ চেহারার ব্রাহ্মণকে দেখে বিস্মিত হয়েছে। এই প্রথম নয়। আগেও বহুবার আচার্যর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। যুবক নিজের ভুল শুধরে নিয়ে এইবার চাণক্যর সামনে এসে বলল,

- ক্ষমা করবেন, আচার্য। আপনাকে আমাদের অতিথি হিসেবে পেয়ে আমরা যারপরনাই সম্মানিত। আমি রাজকুমার বলদেব। মহারাজ মহিপালের পুত্র এবং তোসালির যুবরাজ। দুর্গে আপনাদের স্বাগত।



- আপনার পিতৃবিয়োগে আমরা শোকান্বিত, যুবরাজ। সমবেদনা জানাই। এই আমার শিষ্য এবং ছায়াসঙ্গী জীবসিদ্ধি।

- নমস্কার। আসুন, ভেতরে আসুন। সৈনিকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আস্তাবলে ঘোড়া ছেড়ে তারাও দুর্গে প্রবেশ করুক।

ইতিমধ্যে বলদেবের পেছনে আরও এক রাজবেশধারী যুবক, কিছুটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে লক্ষ করে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- আর আপনি? আপনার পরিচয় তো জানা হল না?

বলদেব ঘুরে এই যুবককে দেখে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল:

- তুমি এখানে কেন? বললাম যে তোমার প্রয়োজন নেই আসার। যাও। মগধ সৈনিকদের কোনো প্রয়োজন আছে কি না, দেখো।

দ্বিতীয় যুবকটি মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলে, বলদেব বলল:

- ও রবিনাথ। আমার বাবার আর তার এক দাসীর গর্ভের সন্তান। আপনারা ভেতরে আসুন।

রবিনাথকে নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলে যে বলদেব পরিচয় দিল না, সেটা নজর এড়াল না চাণক্য এবং জীবসিদ্ধির। বলদেবের সঙ্গে দু-জন প্রবেশ করলেন দুর্গের ভেতরে।

২.

শরীর ক্লান্ত থাকায় সামান্য খাওয়া-দাওয়ার শেষে নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন চাণক্য। ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দুর্গের গঠন বোঝা যায়। দুর্গটা দু-মহলা এবং বিশাল। খরস্রোতা মহানদ থেকে খাল কেটে নদী বানানো হয়েছে এবং দুর্গের দুটো মহল নদীর দু-পাড়ে অবস্থান করছে। দু-দিকের মহল হুবহু একইভাবে তৈরি করা। অর্থাৎ আয়নার প্রতিচ্ছবির মতো। আচার্যর নিজের ঘর তিনতলায়। সামনের মহল দেখে বোঝা যায় তাঁর ঘরের জানলার ওপরে আরও তিনটে তলার জানলা আছে। দুটো মহলের মাঝে একটা যোগাযোগ সেতু আছে যেটা দুটো মহলের তৃতীয় তল জোড়া লাগিয়েছে। সেতুর নীচে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের নীচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে নীচে তাকালেই নদী দেখা যায়। দুর্গের স্থাপত্যশৈলী দেখে এককথায় মুগ্ধ হলেন চাণক্য।

অসময়ে ঘুমোনোর অভ্যাস না থাকলেও আজ ক্লান্ত থাকায় কিছু সময়ের জন্যে ঘুম নেমে আসে আচার্যর চোখে। ঘুম থেকে জেগে আবার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখছিলেন চাণক্য, তখনই দরজায় মৃদু করাঘাত হল। দরজা খুলতে প্রথমে জীবসিদ্ধি ঢুকল এবং তার সঙ্গে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জীবসিদ্ধি পরিচয় করিয়ে দিল,

- ইনি হলেন অখণ্ড আর্যাবর্তের কাণ্ডারি তথা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর গুরু আচার্য চাণক্য। এবং ইনি হলেন রাজা মহিপালের প্রধান অমাত্য ভদ্রদাস মহাশয়।

দু-জনেই একে অন্যের প্রতি নমস্কার জানালেন। বৃদ্ধ বললেন,

- আপনার বিশ্রামে কি বিঘ্ন ঘটালাম মহামতি?

- আজ্ঞে না। আমার বিশ্রাম সম্পূর্ণ হয়েছে অল্প আগে। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনুজ এবং তক্ষশিলার একজন প্রাক্তন আচার্য মাত্র। তাই আমায় মহামতি সম্বোধন নিষ্প্রয়োজন।

- আপনার কথায় বুঝতে পারছি যে বিনয়-ই জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

মৃদু হাসলেন চাণক্য, মুখে কিছু বললেন না। জীবসিদ্ধি জানে যে তার আচার্য মনে মনে আনন্দিত হয়েছেন। প্রকাশ না করলেও, আচার্য নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন। সেটা তাঁর সব কাছের শিষ্যরাই জানে। চাণক্য দু-জনকে আসন দেখালেন,

- আসন গ্রহণ করুন, আর্য। আর বলুন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের হেতু কি শুধুই আলাপচারিতা, নাকি, বিশেষ কোনো কারণ?

- না, আচার্য। নতুন রাজার অভিষেক হওয়ার আগেই এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাকে একটু পরিচিত করিয়ে রাখাই আমার আজকের আসার উদ্দেশ্য। কারণ আজ সূর্যাস্তর পর মহারাজ মহিপালের ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র পাঠ করা হবে সকলের উপস্থিতিতে। আমার ধারণা এর ফলে পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

- হুম। আপনার কথা থেকে অনুমান করতে পারি যে এই ইচ্ছাপত্রে মহারাজ কাকে নিজের উত্তরাধিকার বানিয়ে গিয়েছেন, তা আপনি জানেন। তাই নয় কি?

- হ্যাঁ। আমি জানি। আমার উপস্থিতিতে এবং আমার পরামর্শেই মহারাজ ওঁর ইচ্ছাপত্র নথিভুক্ত করেন। আর এতে উনি রবিনাথকে তোসালির যুবরাজ তথা ভাবী শাসক নির্বাচন করে গেছেন।

- সেকী? জ্যেষ্ঠপুত্র বলদেব তো এতে খুবই ক্ষুণ্ণ হবেন বলে ধারণা করতে পারি।

- অবশ্যই হবেন। বলদেব অতি বদরাগী এবং... ক্ষমা করবেন... মন্দবুদ্ধি। পিতার অতিরিক্ত আশকারায় সে বিগড়ে গেছে বাল্যকাল থেকেই। মহারাজ মহিপাল শেষের দিকে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নিজের দিন আসন্ন বুঝে তিনি নিজের সিংহাসন রবিনাথকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

- হুমম। হঠাৎ এই উপলব্ধির কারণ? তিনি কি অসুস্থ ছিলেন?

- তা ছিলেন। কিন্তু ওঁর নিজের মৃত্যু আসন্ন মনে হওয়ার কারণ অন্য ছিল।

- কী সেই কারণ?

- উনি বিশ্বাস করতেন যে এই রাজবংশের ওপর অভিশাপ আছে। মহারাজ মহিপালের কোনো এক পূর্বপুরুষকে, এক মৃত্যুপথযাত্রী সন্ন্যাসী অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে এই প্রদেশে জনশ্রুতি আছে। প্রথমদিকে মহারাজ এই সমস্ত বিশ্বাস না করলেও, বয়সের সঙ্গেই তাঁর মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। গত কয়েক মাস ধরেই মহারাজ আতঙ্কে ভুগছিলেন। তিনি নাকি রাতের বেলায়, এই দুর্গের অন্ধকার আনাচেকানাচে এক সন্ন্যাসীর অবয়ব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সেটাকে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

- সেকী? অশরীরী উপস্থিত। আপনি নিজে কি এই কাহিনিতে বিশ্বাসী, আর্য?

দৃঢ়ভাবে দু-পাশে ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ,

- একদমই না। ওটা অসুস্থ মানুষের বয়সকালীন অনুভূতিমাত্র। তবে যাই হোক, সেই কারণেই এই হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তন।

- আপনার এই বিষয়ে কী মতামত ছিল? শুনেছি রবিনাথ রানির পুত্র নয়, সে দাসীপুত্র?

- আমি মহারাজের নির্ণয়কে স্বাগত জানিয়েছিলাম। রবিনাথের মা কুন্তী দেবী অতি দুঃখী এবং ভালোমানুষ। তাঁর ছেলেও তাঁরই মতো ভদ্র এবং শান্ত।

- স্বর্গত মহারাজ এবং ওঁর পারিবারিক ইতিহাস যদি একটু বলেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়।

- রাজা মহিপালের পাটরানি ছিলেন রানি মণিমালা। উনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। রাজার সঙ্গে রানির কোনোদিনই বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল না। সেই সময়ে রানির একজন দাসী ছিল কুন্তী। রাজা একবার অসুস্থ হলে এই দাসী তাঁর সেবা করেন। আর সেই থেকেই নিঃসঙ্গ মহারাজ মহিপালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কয়েক মাস পর রানি একসময় যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন প্রায় একই সময়ে কুন্তীরও গর্ভে রাজার সন্তান আসে। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। রানি মণিমালা এই অপমান মেনে নিতে পারেননি। তিনি দাসী কুন্তীকে তীব্র ভর্ৎসনা আর তিরস্কার করা শুরু করলেন। একসময় তা প্রায় অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছোয়। রানি গোপনে কুন্তীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। আমি কুন্তীকে সেই সময় রানির প্রকোপ থেকে বাঁচাই। রাজাও চেষ্টা করতেন কুন্তীকে যতটা সম্ভব রক্ষা করতে। কিন্তু রানির ক্রোধের আগুনে ওঁকেও কম দগ্ধ হতে হয়নি।

টানা অনেকক্ষণ কথা বলে একটু থামলেন বৃদ্ধ। জীবসিদ্ধি একটা পানপাত্রে সামান্য জল ভরে এগিয়ে দিল বৃদ্ধর দিকে। দু-চুমুক জল খেয়ে অমাত্য ভদ্রদাস আবার অতীতের কাহিনি শুরু করলেন,

- বলদেব ও রবিনাথ মাত্র কয়েক ঘণ্টার তফাতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বলদেবের জন্ম দিতে গিয়েই রানি মণিমালার মৃত্যু হয়। এবং তখন নিজের

সন্তানের সঙ্গেই, মৃত রানির শিশুপুত্রর দায়িত্বও হাসিমুখে নিজের কাঁধে তুলে নেন কুন্তীদেবী। আজ অবধি তিনি নিজের সন্তান রবিনাথ এবং নিজের হত্যার চক্রান্তকারী মহারানির সন্তান বলদেবের মধ্যে কখনো ফারাক করেননি। দাসী কুলে জন্ম হলেও কুন্তী একজন সত্যিকারের মহীয়সী নারী এবং মা। সে আমার বোনের মতো। অথচ এত বছর তার নিজের হাতে মানুষ করা বলদেবের থেকেও তিরস্কার বই আর কিছু পায়নি। দাসী বলে বলদেব নিজের বিমাতাকে মায়ের সম্মান দেয়নি কোনোদিনই। রবিনাথকেও সে সারাজীবন দাসীপুত্র বলে হেয় করে এসেছে। অতএব যখন বলদেব জানতে পারবে যে তার বাবা তাকে যুবরাজের পদ থেকে সরিয়ে, তার বিমাতার সন্তানকে যুবরাজ বানিয়ে গেছেন, সে এর বিরোধিতা করবেই। কিন্তু আমি মনে করি রবিনাথ মানুষ হিসেবে বলদেবের চেয়ে উত্তম। এবং এইবার রবিনাথ রাজসিংহাসনে বসলে অন্তত কুন্তী দেবী তার যোগ্য সম্মান পাবে। রাজমাতা হবে সে।

- সত্যিই সাক্ষাৎ মাতৃরূপা নারী তিনি। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে রইল। তা, মহারাজের এই দুই সন্তানই আছে শুধু? অন্য কোনো রানি...

- আছে। ছোটোরানি কৌশল্যা। তার এবং মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র হল বিরাট। কিন্তু সে... সে ঠিক আর পাঁচটা শিশুর মতো স্বাভাবিক নয়। তার মুখের গঠন অস্বাভাবিক, বোধবুদ্ধি কম এবং কথা বলতে পারে না ঠিকমতো। এই সন্তানকে নিয়ে মহারাজ মহিপালের লজ্জা ছিল। ছোটোরানি কৌশল্যাকে তিনি সুস্থ পুত্রর জন্ম না দিতে পারার দোষে ভর্ৎসনা করতেন। এই কারণেই ছোটোরানি জনসমক্ষ থেকে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলে। সে তার সন্তানকে নিয়ে থাকে শুধু অন্দরমহলে।

- আহা! বড়োই দুঃখের বিষয়।

- সত্যিই দুঃখের। মহারাজ নিজে এবং বলদেব বিরাটকে খুবই হেয় করত। অথচ ওই অবোধ সারাদিন তাদেরই আশেপাশে থাকার চেষ্টা করত। যাই হোক, আজ একটু পরে সবার সঙ্গেই আপনাদের সাক্ষাৎ হবে। বলদেবকে রাজা করা হবে না জানতে পারলে সে প্রচণ্ড রেগে যাবে। হয়তো রাজদ্রোহ করতেও উদ্যত হবে। সেই কারণেই আপনাদের উপস্থিতি আমার বিশেষ প্রয়োজন, আচার্য।

- হুম। আমার থেকে আপনি কী ধরনের সহযোগিতা আশা করেন?

- রবিনাথকে যুবরাজ করার পর আপনি শুধু মগধের হয়ে নিজের সমর্থন জানাবেন। ব্যস। এইটুকুই যথেষ্ট। কেউ আর বলদেবের হয়ে বিদ্রোহ করে শক্তিশালী মৌর্যদের বিরাগভাজন হওয়ার সাহস করবে না।

- বেশ। তাই হবে। মগধও চায় যেন এই রাজ্য ঠিক আগের মতোই

সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে থাকে। আপনি যদি আশ্বাস দেন যে রবিনাথকে সমর্থন করাই মগধের পক্ষে হিতকর হবে, তবে তাই হোক।

- অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আচার্য। আমায় তবে বিদায় দিন।

- বেশ। সূর্যাস্তের পর সাক্ষাৎ হবে তাহলে। প্রণাম।

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ অমাত্য। চাণক্য পিছু ডাকলেন।

- আর্য।

পিছু ফিরলেন বৃদ্ধ। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- একটা সংশয় আছে। ভালোমানুষ মানেই সবসময় ভালো শাসক হয় না। রবিনাথের মধ্যে রাজগুণ কতখানি আছে?

মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন,

- আশ্চর্যভাবে তার অর্ধ রাজরক্তের মধ্যে রাজলক্ষণ পূর্ণ রাজরক্তধারী যুবরাজের চেয়ে বেশি আছে বলেই আমি এত বছরে দেখেছি। আমি মনে করি রবিনাথের মধ্যে সমস্ত রাজগুণ আছে। সে একজন উৎকৃষ্ট শাসক হবে।

- যাক। নিশ্চিন্ত হলাম আপনার কথায়।

৩.

সন্ধ্যার সময়। সভাঘরে একত্র হয়েছেন সকলে। চাণক্য শেষ কোনায় একটা আসনে বসেছেন। এই জায়গা থেকে বাকি প্রত্যেকের মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তবে ওঁর জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। আখের রস ওঁর পছন্দ নয়। মিষ্টি জাতীয় কিছুর স্বাদ নিতে ইচ্ছে করছে ওঁর। আচার্যর পাশেই জীবসিদ্ধি বসে আছে। সভাঘরের উলটো মাথায় বসে আছেন অমাত্য ভদ্রদাস এবং তাঁকে ঘিরে স্বর্গীয় মহারাজের পরিবারের সদস্যরা। নিজের নিজের বাকি আসনে অপেক্ষারত আরও কয়েকজন সভাসদ। সাধারণ সাদা কাপড়ে তুলনামূলক বয়স্ক মহিলা যিনি বসে আছেন, ওঁকে কুন্তী দেবী বলে চিনতে অসুবিধা হয় না। মহিলার মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ী ভাব স্পষ্ট। মায়ের পাশেই শান্তভাবে বসে রবিনাথ। তাদের মুখোমুখি উলটো দিকে বসে আছে বলদেব। তার মুখে অধৈর্য ভাব ফুটে উঠছে। ছোটোরানি কৌশল্যা আর রাজকুমার বিরাটের জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

নূপুরের শব্দে চোখ ঘুরে গেল সকলের। সভাঘরে প্রবেশ করলেন রানি কৌশল্যা সঙ্গে তার মায়ের হাত ধরে বিরাট। মুখ সামান্য বাঁকা, একপাশে টানা। পদক্ষেপ টলোমলো। তার আচরণ বা চাহনি থেকেই অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে। তার মা তাকে বলদেবের পাশের আসনে বসাতে গেল, কিন্তু সে কিছুতেই বসল না। মুখ দিয়ে 'গোঁ গোঁ' শব্দ করতে লাগল। বলদেব বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে চাইল ভাইয়ের দিকে। বিরাট কিছুই না বুঝে বলদেবের

দিকে নিজের খর্বকায় আঙুল তুলে 'গোঁ গোঁ' করতে লাগল। জড়ানো জিভে উচ্চারণ করল,

- শি... শি... শিব! শিব। শিব।

পরক্ষণেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিল বিরাট। তার মা আতঙ্কিত চোখে একবার বলদেবের দিকে তাকালেন।

জীবসিদ্ধি চাণক্যর কানের কাছে নিজের মাথা এনে বলল:

- বলদেবের রাগকে প্রত্যেকেই বেশ সমীহ করে দেখছি।

- হুম।

বলদেব মেজাজ হারাচ্ছে দেখে পরিস্থিতি সামাল দিলেন স্বয়ং কুন্তী দেবী। নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বিরাটের মাথায় হাত রেখে তাকে শান্ত করলেন। তাকে বলদেবের সামনে থেকে সরিয়ে এনে রবিনাথ আর তাঁর নিজের মাঝের আসনে বসালেন। ছেলে শান্ত হওয়ায় কৌশল্যা দেবী একবার কুন্তী দেবীর দিকে চেয়ে মাথা নত করে নিঃশব্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। নিজে বলদেবের থেকে একটা আসন ছেড়ে পরের আসনে বসলেন।

সবাই এসে গেছে দেখে বৃদ্ধ অমাত্য শুরু করার অনুমতির অপেক্ষায় একবার চাণক্যদেবের দিকে চাইলেন। আচার্য মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। অমাত্য শুরু করতেই যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বলদেব উঠে দাঁড়াল।

- বাবার শেষ নথি পাঠ করার আগেই আমি কয়েকটা কথা স্পষ্ট বলে দিতে চাই। এই দাসী পুত্র আর তার মাকে বাবা দয়াপরবশ হয়ে মহলে জায়গা দিয়েছিলেন এত বছর। কিন্তু আমি তাদের নিজের সম্বন্ধী বলে মানি না। আমার সিংহাসনে বসার তিন দিনের মধ্যে এই দু-জন যেন দুর্গ ত্যাগ করে।

দূর থেকেই চাণক্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে অপমানে রবিনাথের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কুন্তী দেবী কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ চেপে মাথা নীচু করে আছেন। রবিনাথ মেঝের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল,

- আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, যুবরাজ। আপনার কাছে মাকে এমনিতেও আমি আর অপমানিত হতে দেব না। মা শুধুমাত্র বাবার টানে এতদিন এখানে পড়ে ছিলেন। আমরা কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই এই রাজ্য ত্যাগ করব। নেহাত অমাত্য মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করতে আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি।

বিরাট আরও একবার বলে উঠল, 'শ... শিব।' আর তার দিকে চোখ পড়তেই বলদেব তাকাল রানি কৌশল্যার দিকে।

- আপনিও শুনুন, আপনাদের আমি দুর্গ থেকে বিতাড়িত করব না ঠিকই। কারণ বিরাট যাই হোক রাজবংশের পুত্র। কিন্তু এই অপদার্থটাকে

আমার নজরের থেকে যেন দূরে রাখা হয়। এর প্রলাপ আমার কানে যেন না আসে। আমার ধারে-কাছে যেন এ না আসে। বুঝলেন?

মিন মিন করে কৌশল্যা দেবী কিছু একটা বললেন। এইবার অমাত্য শক্ত কণ্ঠে বাধা দিলেন,

- রাজকুমার বলদেব, আসন গ্রহণ করুন। অতি উৎসাহ ভালো নয়। সম্মানীয় অতিথিদের সামনে একজন রাজপুরুষের পক্ষে কি নিজের এই ব্যবহার প্রকাশ শোভনীয়?

দাঁতের ফাঁক দিয়ে কিছু অপশব্দ বলে নিজের আসনে ফিরে গেল রাজকুমার বলদেব। গলাখাঁকারি দিয়ে বৃদ্ধ অমাত্য কথা শুরু করলেন।

- আমাদের মধ্যে আজ মগধের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত মহামতি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। তোসালির পক্ষ থেকে আসুন আমরা ওঁকে এবং ওঁর শিষ্য মহাশয় জীবসিদ্ধিকে স্বাগত জানাই।

প্রত্যেকে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে অভিবাদন জানালেন। আরও একবার গলা পরিষ্কার করে বৃদ্ধ বললেন,

- এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে স্বর্গীয় মহারাজ মহিপালের নিজের হাতে লেখা এবং মোহর লাগানো নথি। এতেই তিনি নিজের পরবর্তী উত্তরসূরির নাম লিখে গেছেন। এই আমি সর্বসমক্ষে রাজমুদ্রিকার মোহর খুলেছি। এবার তাঁর ইচ্ছাপত্র আমি পাঠ করে এখানে উপস্থিত সকলকে জানাব।

'আমি মহারাজ মহিপাল স্বেচ্ছায় বলে যেতে চাই যে আমার মৃত্যুর পেছনে...'

পাঠ যত এগোতে থাকল, সভায় উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। যুবরাজ হিসেবে রবিনাথকে পেয়ে সকলেরই মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলেও, চাণক্য লক্ষ করলেন যে প্রত্যেকেই যেন খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু রবিনাথের নাম উচ্চারিত হতেই ক্রোধে ফেটে পড়ল বলদেব। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করতে লাগল রবিনাথ এবং নিজের বিমাতাকে। হয়তো শারীরিক আক্রমণও করত যদি না অমাত্যর নির্দেশমতো আগেই দু-জন সৈনিক রবিনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকত।

- এই মহিলা। এই নীচ দাসী আমার বাবাকে বশ করেছিল: এই মহিলাই আমার বাবার মনে আমার বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে তাঁর হৃদয় বিষিয়ে দিয়েছে। এই দাসী...

- মৌন!

সারা সভা গমগম করে উঠল রবিনাথের হুংকারে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বলদেবের চোখে চোখ রেখে বলল,

- আর একবার আমার মায়ের নামে কুকথা উচ্চারণ করলে এই মুহূর্তে তোমায় কারাগারে নিক্ষেপ করব!

শান্ত রবিনাথের মুখে এহেন হুংকার শুনে কেমন থতোমতো খেয়ে গেছে বলদেব। হতবাক দৃষ্টিতে প্রথমে রবিনাথ, তারপর কুন্তী দেবী আর সব শেষে অমাত্য ভদ্রদাসের মুখের দিকে একে একে চাইল। তারপর সভাসদদের মুখের দিকে চাইল। বোধ হয় কোনো সভাসদের সমর্থন আশা করছিল। কিন্তু কারুর থেকেই সেই রকম কোনো প্রতিক্রিয়া না পেয়ে মুহূর্তে নিজের অবস্থান বুঝে নিল রাজকুমার। নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল সে।

ছেলের এরকম দৃঢ়তায় প্রচণ্ড হতবাক হয়েছেন কুন্তী দেবীও। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন রবিনাথের রাগত মুখের দিকে। রবিনাথ দু-পা বলদেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

- পাশার দান পালটে গেছে, রাজকুমার। এইবার আমি তোমায় তিন দিন সময় দিলাম। তারমধ্যে তোসালি ছেড়ে চলে যাবে তুমি।

এই প্রথম মুখ খুললেন কুন্তী দেবী। চিৎকার করে উঠলেন,

- রবিনাথ! এ তুমি কী বলছ? বলদেব তোমার বড়ো দাদা, সেটা ভুলে যেয়ো না।

রবিবনাথ তার মায়ের দিকে চোখ ফেরাল। মায়ের এই রুদ্রমূর্তি দেখে সেও একটু হতবাক হয়েছে। তার চোখের তারা থেকে নিমেষে রাগ বিদায় নিল। হাত জোড় করে মায়ের উদ্দেশে বলল:

- আমায় ক্ষমা করবেন, মা। আপনার অপমানে আমি রেগে গেছিলাম। সত্যিই তো। বলদেব ভাইকে বিতাড়িত করলে তার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য কী থেকে যাবে। আমায় ক্ষমা করুন, জ্যেষ্ঠ।

রবিনাথের কথায় প্রচ্ছন্ন তিরস্কার স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তার এই ব্যবহার সত্যিই রাজোচিত ছিল। রবিনাথ অমাত্য এবং উপস্থিত সমস্ত সভাসদকে প্রণাম জানাল। প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানাল তাকে। সবার শেষে রবিনাথ এগিয়ে এল চাণক্যর দিকে। হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বলল:

- মহামতি চাণক পুত্র, মহাপণ্ডিত কৌটিল্যর সাক্ষাতে আমি ধন্য। আশা করি মগধ আমাকেও আগের মতোই তার সমর্থন দিয়ে যাবে। এবং আমিও নিজের পূর্ণ সমর্থন এবং আপনাদের বহুদিনের দাবি অনুযায়ী মগধের নির্ধারিত রাজকর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

উত্তরে চাণক্য বললেন,

- অতি উত্তম, রাজন। আমাদের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবে।

- অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনুরোধ করব আপনি আরও কিছুদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। অন্তত আমার রাজ্যাভিষেক হওয়া অবধি আপনার সেবা করার সুযোগ দিন। আপনার মতো একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আমার কাছে মূল্যবান।

রবিনাথের এরকম রাজোচিত সুআচরণে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি দু-জনই প্রসন্ন হল। যাক, বৃদ্ধ অমাত্য এবং মহারাজ মহিপাল তবে ভুল করেননি। একে একে সভাসদদের বিদায় দিয়ে রবিনাথ নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতেই কৌশল্যা আর বিরাট দ্রুত বেরিয়ে গেল। কুন্তী দেবী কিছু বলতে গেলেন বলদেবকে। কিন্তু বলদেবের অবস্থা দেখে আর তিনি সাহস করে তা বলে উঠতে পারলেন না। চাণক্যকে প্রণাম জানিয়ে তিনিও প্রস্থান করলেন। বৃদ্ধ অমাত্য হাসিমুখে এগিয়ে এলেন চাণক্যর দিকে। জীবসিদ্ধি এবং চাণক্যর সঙ্গেই তিনিও প্রস্থান করলেন। পাথরের মতো স্থবির হয়ে, মেঝের দিকে চেয়ে শুধু বসে রইল বলদেব।

সত্যিই, ভাগ্যদেব কত সহজেই না কয়েক মুহূর্তে পরিস্থিতি অদলবদল করে দিতে পারে। আজকের রাজা মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে আশ্রিত আর দাস হয়ে যেতে পারে রাজা।

৪.

পরদিন সকাল। চাণক্য বরাবরই সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই শয্যা ত্যাগ করেন। কয়েক ঘণ্টা প্রার্থনা, ধ্যান এবং স্বল্পাহারের পর অধ্যয়ন। আজও সে রকমই মেঝেতে বসে প্রাণায়াম করছিলেন তিনি। দরজায় মৃদু করাঘাত হল। দরজা খুলতে জীবসিদ্ধি ঢুকল।

- সুপ্রভাত, আচার্য।

- সুপ্রভাত।

- এইদিকের সমস্যা তবে সহজেই মিটল। কি বলেন?

- হুম। আশা করছি তাই, জীবসিদ্ধি। মনেপ্রাণে তাই আশা করছি।

- অর্থাৎ? আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন?

- আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কী জানি না, কিন্তু কিছু একটা ঘটবে, জীবসিদ্ধি।

কথা মাঝপথে থামাতে হল কারণ তখনই এক ভৃত্য এসে তাঁদের দু-জনকে প্রাতরাশের জন্যে আসতে বলল। দু-জন পৌঁছে দেখলেন প্রচুর ফল-মূল সাজিয়ে তাঁদের অপেক্ষায় বসে আছেন রবিনাথ এবং কুন্তী দেবী। মা এবং ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বাগত জানাল। আপ্যায়ন করে তাঁদের বসালেন কুন্তী দেবী।

কুন্তী দেবীকে উদ্দেশ করে চাণক্য বললেন,

- আপনার মতো এক জীবনযুদ্ধে জয়ী নারীর সাক্ষাৎ পেয়ে আমি সম্মানিত, মা।

- না, না। একথা বলে আপনি আমার পাপ বাড়াবেন না, আচার্য। আপনার মতো পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সামনে একইসঙ্গে বসে খাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। আপনাদের অতিথি হিসেবে পেয়ে আমরা ধন্য।

বিভিন্ন কথাবার্তার মাঝেই খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হল। রবিনাথ আচার্য এবং জীবসিদ্ধিকে তার সঙ্গে বাগানে আসতে আমন্ত্রণ জানাল। তাদের সঙ্গে কুন্তী দেবীও এলেন বাগানে এবং এক দাসীকে ডেকে নিলেন। দাসীটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফুল তুলতে চলে গেলেন বাগানের অন্যপাশে। মা দূরে চলে যেতেই রবিনাথ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল,

- আচার্য, আপনাকে কয়েকদিন এখানে থেকে যেতে বলার পেছনে আমার আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।

- বলুন, যুবরাজ।

খানিক থেমে রবিনাথ বলল,

- আমার ধারণা আমার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আপনি কি জানেন যে উনি মৃত্যুর আগে এক সন্ন্যাসীর প্রেতমূর্তি দেখতে পেতেন এই দুর্গে?

- হ্যাঁ। অমাত্যর কথায় শুনেছি সেকথা। উনি সেটাকে মহারাজের কল্পনা বলে মনে করেন।

- আমিও তাই মনে করতাম। যদি না সেই ছায়ামূর্তি আমি স্বচক্ষে দেখতাম।

- সেকী?

- আজ্ঞে, হ্যাঁ। প্রথমে বাবার কথা আমিও ভেবেছিলাম কল্পনামাত্র। কিন্তু একদিন রাতে আমার ঘুম না আসায় আমি পূর্ব মহলে নিজের ঘরের জানলায় বসে ছিলাম। তখনই উলটো দিকের মহলের একটা জানলায় সেই ছায়ামূর্তিটা দেখি। জ্বলতে থাকা রাতপ্রদীপের আবছা আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পাই তাকে, বাবার ঘর যে তলায়, সেই তলার জানলায়।

- হুম। আপনি কি বিশ্বাস করেন সেটা অলৌকিক প্রেতমূর্তি?

- না। আমি মনে করি কেউ একজন ওই প্রেতের ভেক ধরে মহারাজকে ভয় দেখাত।

- আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

- হ্যাঁ। বলদেব। এটা নিঃসন্দেহে তারই কাজ। তার সঙ্গে মহারাজের একদিন প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। তারপর থেকেই এই প্রেতমূর্তি দেখতে শুরু করেন বাবা। বার্ধক্যে পৌঁছে বাবার মন এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আমার ধারণা বলদেব এটাই চেয়েছিল যাতে এই অলৌকিক কাহিনি ছড়িয়ে পড়ে বাবার মাধ্যমে। আর তাতেই তার পরবর্তী কাজে সুবিধা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- হুমম। অর্থাৎ, আপনি আপনার বড়ো দাদাকে পিতৃহত্যার দোষী হিসেবে সন্দেহ করেন?

- হ্যাঁ। তার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা কুন্তী দেবী যেখানে ফুল তুলছিলেন সেখানে এসে পড়েছেন। এবং মায়ের কাছাকাছি আসতেই রবিনাথ চুপ করে গেল। কুন্তী দেবীর দৃষ্টিশক্তি সম্ভবত ক্ষীণ। তাই একজন দাসী জবা গাছের ফুল ফোটা ডালগুলো টেনে দিচ্ছে আর তা থেকে তিনি ফুল তুলছেন। রবিনাথ চুপ করে গেছে সেটা লক্ষ করে চাণক্য নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন,

- আপনার সন্দেহর কথা বোধ হয় আপনার মা জানেন না?

- জানেন। কিন্তু বিশ্বাস করেননি। উনি অতি সরল মনের মানুষ। বলদেবকে খুবই স্নেহ করেন। এত অপমানের পরেও আমায় কিছুই বলতে দেন না। কালকের ঘটনা তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনারা।

- সেই। অন্যদিকে চলুন তবে।

কুন্তী দেবীর থেকে সামান্য তফাতে এসে রবিনাথ আবার কথা শুরু করল,

- এই সম্ভাবনার কথা মাকে বলতেই তিনি আমার ওপর সাংঘাতিক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বলেন এইসব কথা দ্বিতীয়বার কারুর সামনে বললে আমি তাঁর মরা মুখ দেখব। তাই এখন আপনাকে এই কথা যে বলছি তা ওঁকে না জানিয়েই।

- আপনি কি চান এই বিষয়টা আমরাও ওঁর থেকে গোপন রাখি?

একটু ভেবে যুবরাজ উত্তর দিলেন,

- তার প্রয়োজন হবে না, আচার্য। আমি আমার মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। উনি সারাটা জীবন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, তীব্র লাঞ্ছনা সহ্য করে আমায় মানুষ করেছেন। আমি মায়ের থেকে কোনো কথাই গোপন করি না। তাই আজ রাতেই আমি সব কথা বুঝিয়ে বলব মাকে। আশা করি উনি বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন।

- হুম। কিন্তু আপনি আমাকে এই কথা কেন বললেন? কী সাহায্য চান আপনি আমার থেকে?

- আচার্য, আপনার ক্ষুরধার মস্তিস্ক এবং অনুধাবন ক্ষমতার কথা আমার অজ্ঞাত নয়। আগেও বহুবার আপনি রহস্যের জট খুলে মগধকে সাহায্য করেছেন। আমি চাই বাবার মৃত্যুর জন্যে যদি সত্যিই কেউ দায়ী হয়ে থাকে তবে সে যথাযথ শাস্তি পাক। আমি চাই এই বিষয়ে আপনি বিচার বিশ্লেষণ

করুন। আপনাকে কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না। আপনি আপনার মতো করে সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন। আমার বিশ্বাস তাতেই ফল হবে।

- হুম। আমি চেষ্টা করব, যুবরাজ। কিন্তু আপনিও সতর্ক থাকবেন।

একটু অবাক হয়ে রবিনাথ প্রশ্ন করল,

- আমি? কেন?

- যদি আপনার ধারণা অমূলক না হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় যে আপনার ভাই সিংহাসনের লোভে পিতৃহত্যা করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু এরপরেও সে আপনার কাছে তার প্রাপ্য সিংহাসন হারিয়েছে। অতএব, এইবার তার সম্পূর্ণ আক্রোশ কিন্তু আপনার ওপর পড়বে।

মৃদু হেসে নিজের কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ারের ওপর হাত রেখে রবিনাথ বললেন,

- সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আচার্য। আমি তার থেকে সদা সতর্ক থাকব।

- হুম।

৫.

চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি দুর্গ পরিক্রমা করছেন। স্বয়ং রাজমাতা কুন্তী দেবী আজ অতিথিদের দুর্গ পরিক্রমায় তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন। গতকালই চাণক্য অমাত্যকে দুর্গ পরিভ্রমণ করার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। আজ কুন্তী দেবী নিজেই এসে জানিয়েছেন যে যুবরাজ ও অমাত্য, দু-জনেই আজ খুব ব্যস্ত থাকায় তিনিই এসেছেন।

দুর্গর বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন,

- এই দুর্গর দুটো মহল। উত্তর ও দক্ষিণ। এই উত্তর মহলের পাঁচতলায় থাকতেন মহারাজ মহিপাল স্বয়ং। তার ওপরের তলা ফাঁকা। কারণ রাজার জায়গা সবচেয়ে ওপরে হওয়াই নিয়ম। বলদেব থাকে উত্তরেরই চারতলায় এবং প্রধান-অমাত্য মহাশয় দোতলায়। আপনাদের অতিথি কক্ষ দুটো উত্তর মহলের তিনতলায়। বাসিন্দাদের নিজস্ব দাস-দাসী থাকে একদম নীচের তলায়।

দুর্গর বারান্দা থেকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন কুন্তী দেবী।

- আপনি এবং আপনার ছেলে?

- আমরা থাকি দক্ষিণ মহলে আপনার মুখোমুখি। অর্থাৎ তিনতলায়। আমি এবং অন্যান্য কিছু দাসী থাকতাম এই তলায়। তবে বৈধব্য জীবন পালন করতে আমি তাদের স্থানান্তরিত করেছি। বর্তমানে আমি একাই পুরো তলাটা জুড়ে থাকি। ছেলে রবিনাথ অবশ্য আমার ওপরের তলাতেই, অর্থাৎ

চারতলাতেই এতদিন থেকে এসেছে। তবে আজ থেকেই অমাত্যর পরামর্শে তাকে উত্তরের মহলে, মহারাজের ঘরে স্থানান্তরিত করা হবে। দোতলায় থাকেন রানি কৌশল্যা আর তাঁর ছেলে রাজকুমার বিরাট। দক্ষিণ মহলের সবার ওপরের দুটো তলা ফাঁকা। কেউই বসবাস করে না। একসময়ে রাজবংশের প্রচুর সদস্য ছিল বলে শুনেছি। সেই সময়ে এই সবকটা ঘরই ব্যবহার হত। এখন সেই বড়ো পরিবার অথবা এত দাস-দাসী পালন করার সামর্থ্য ও প্রয়োজন কোনোটাই নেই।

চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- বেশ, বেশ। রাজকুমার বলদেব কেমন আছেন এখন?

ঠোঁট একবার চেপে রাজমাতা বললেন,

- সেই সন্ধের পর থেকে সে নিজের ঘর থেকে বিশেষ বের হয়নি শুনেছি। আপনারা কি তার সঙ্গে দেখা করতে চান?

- অবশ্যই। তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার আছে।

এই কথায় চকিতে পায়চারি থামিয়ে দেন কুন্তী দেবী। চাণক্যর দিকে ঘুরে দাঁড়ান মুখোমুখি। বললেন,

- আচার্য, রবিনাথ আপনাদের কী বলেছে আমি গতকাল তারই মুখে তা শুনেছি। আপনি পণ্ডিত মানুষ। আমার ছেলের এই কল্পকথায় আপনি প্রভাবিত হবেন না দয়া করে। তার মনে একটা ভয়ংকর সন্দেহ উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এ অসত্য এবং অমূলক। মহারাজের মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

- হুমম। কিন্তু এক সন্ন্যাসীর প্রেতমূর্তি শুনেছি মহারাজ দেখতে পেতেন? আপনি কি কখনো সেই অবয়ব চাক্ষুষ করেছেন?

- না। কখনোই নয়। ওটা মহারাজের কল্পনামাত্র।

কথা বলতে বলতেই রাজকুমার বলদেবের ঘরের কাছে এসে হাজির হয়েছেন তাঁরা। রাজকুমার দু-দিন আগেই যুবরাজের পদ থেকে স্খলিত হয়েছেন। অতএব তাঁর যে মাথার ঠিক থাকবে না তা অনুমান করেই চাণক্য তাঁর তরফ থেকে যেকোনো দুর্ব্যবহারের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে নিলেন। মৃদু করাঘাত করতেই ভেতর থেকে এক অল্পবয়সি রমণী এসে দরজা খুলে দিল। রমণীর পরনের স্বল্প পোশাক এবং উগ্র সাজ দেখেই অনুমান করা যায় যে এই নারী একজন নর্তকী। রাজপুরুষদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে এদের অন্তঃপুরে স্থান দেয়া হয়। ভেতরে আরও দুই নারীর মাঝখানে রাজকুমার বলদেব বসে আছেন। একজন তাঁর মুখে পানপাত্রে সুরা তুলে দিচ্ছে এবং অন্যজন তাঁর শরীরের ওপর শরীর এলিয়ে বসে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁদের দেখেই ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল,

- আরে, আরে। এ যে স্বয়ং রাজমাতা! কী সৌভাগ্য আমার। ওরে তোরা



কে কোথায় আছিস? শাঁখ বাজা! পুষ্পবৃষ্টি কর। হা-হা-হা। দাসী যে রাজমাতা হয়েছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

লজ্জায় কুন্তী দেবীর মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। গোটা ঘর সুরা এবং সুগন্ধি আতরের গন্ধে ম-ম করছে। এই দু-দিন রাজকুমার বলদেব যে খাবারের চেয়ে পানীয় সেবন বেশি করেছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। চাণক্য এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে,

- আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

- আমার থেকে অনুমতি চাইছেন নাকি? অনুমতি দেয়ার আমি কে? রাজমাতার থেকে অনুমতি নিন। হে হে। রা-জ-মা-তা!

তাঁর ব্যঙ্গোক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

- অভিশাপ।

- আপনি বিশ্বাস করেন উনি প্রেতের হাতে খুন হয়েছেন?

- অবশ্যই। আমি নিজে দেখেছি ওই সন্ন্যাসীর প্রেতকে।

- তাই নাকি? তা তাকে কেমন দেখতে?

- ঝাঁকড়া চুল, বিশাল বপু, এক হাতে রুদ্রাক্ষ জড়ানো আর গলায় আরও দুটো রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে আলখাল্লা এবং হাতে নরবলির খড়্গ। চোখ তার জ্বলে কয়লার মতো। যান যান। গ্রেফতার করুন তাকে। কারাগারে দিন।

- রাজকুমার বলদেব!!

চিৎকার করে উঠেছেন কুন্তী দেবী। রাগতভাবে তিনি চেয়ে আছেন রাজকুমারের দিকে। ঘরে থাকা তিন রমণীর উদ্দেশে বললেন,

- বেরিয়ে যাও! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। আর এই সমস্ত সুরা নিয়ে যাও। রক্ষী! রক্ষী! রাজকুমারকে সুস্থ স্বাভাবিক করতে এখনই ব্যবস্থা নেয়া হোক।

বলদেব হাতে ধরা পানপাত্রটা ছুড়ে মারল তার বিমাতার মাথা লক্ষ করে। তিনি বোধ হয় এইরকম আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেনই। সময়মতো একদিকে সরে গিয়ে বাঁচলেন তিনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে দেখেই রাগে ফেটে পড়ল রাজকুমার।

তিন জন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখনও প্রচণ্ড নোংরা কটূক্তির বর্ষণ চলছে ভেতর থেকে।

চাণক্যকে একটু একান্তে পেয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

- আচার্য! এ তো পুরোপুরি মাতাল।

- হুম। কিন্তু প্রেতের বর্ণনা বেশ আশ্চর্য রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ।

৬.

বাকি সময়টা কুন্তী দেবী অতিথিদের সঙ্গ দিলেন না। বলদেবের আচরণে তিনি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং এক ভৃত্যকে তাঁদের সঙ্গে দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে নিজে বিদায় নিলেন।

- সত্যিই মহীয়সী স্ত্রীলোক। এইভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলানোর জন্যে ধৈর্য লাগে।

প্রশংসার সুরে বলে ওঠে জীবসিদ্ধি।

- হুমম। তা বটে। সে-বিষয়ে কোনো দ্বিমত হবে না।

ভৃত্য তাঁদের পুরো উত্তর মহল দেখিয়ে সব শেষে তাঁদের নিয়ে ঢুকল একটা বড়ো ঘরে। নাকে ভেষজ রঙের গন্ধ লাগল। ঘর জুড়ে বহু চিত্র। আবার কিছু অসম্পূর্ণ আঁকাও চোখে পড়ে। সঙ্গে কিছু আছে শুধুই সাদা-কালোয় ফুটিয়ে তোলা চিত্র। এগুলো রঙিন আঁকাগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

- এই দুর্গে কেউ শিল্পকলায় এরকম পারদর্শী তা তো আগে জানতাম না। প্রতিটি চিত্রই অপূর্ব।

প্রশংসার সুরে বললেন চাণক্য। উত্তরে ভৃত্য বলল,

- আমাদের মহারাজ মহিপাল শখের শিল্পী ছিলেন। এইসব রঙিন চিত্র উনি বানাতেন।

- হুমম। কিন্তু ওই সাদা-কালো চিত্রগুলো? ওগুলোও কি ওঁরই কাজ? ওগুলো তো একদম আলাদা ধরনের।

- ওগুলো রাজকুমার বলদেবের।

- বাহ! অপূর্ব। বাবা ছেলের এই শখের কথা তো আগে কেউ বলেনি। তাদের মনে একটা শিল্পীসত্তা আছে দেখছি। কিন্তু একটা বিষয় বুঝলাম না। রাজকুমারের অঙ্কিত সমস্ত চিত্রই রংহীন কেন?

- কারণ রাজকুমার বলদেব রং দেখতে পান না, আচার্য।

- বর্ণান্ধ?

কথাটা বুঝতে না পেরে ভৃত্য প্রশ্ন করল,

- সে কী বস্তু, আচার্য?

- কিছু না। রঙের পার্থক্য না করতে পারার এক বিশেষ সমস্যা। যাক গে। যদিও আমার মধ্যে শিল্পীসত্তা অতি ক্ষীণ। তবে এইটুকু বুঝতে পারি যে সব চিত্রই বড়ো সুন্দর। সাদা-কালোগুলোও নিজের মতো করে সুন্দর। তোমার কী অভিমত, জীবসিদ্ধি?

জীবসিদ্ধিও সম্মত হল যে চিত্রগুলো বাবা ছেলের উৎকৃষ্ট শিল্প-জ্ঞানের প্রমাণ দেয়।

বেরিয়ে এসে, ভৃত্যর দেখানো পথে, দুই মহলের মাঝখানের সেতু পেরিয়ে তাঁরা দক্ষিণ মহলে পৌঁছোলেন। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন দোতলায়। ছোটোরানি কৌশল্যা বাইরে বারান্দায় নিজের ছেলের সঙ্গে বসে আছেন। অতিথিদের আসতে দেখেই বিরাট ভয় পেয়ে মায়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। রানি কৌশল্যা মৃদু হেসে বললেন,

- ও নতুন লোকদের ভয় করে। আপনারা ওর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হবেন না, ব্রাহ্মণদেব।

- না, না। আমরা বুঝতে পারছি। ওর বয়স কত হল মহারানি?

- এই ভাদ্র মাসে ষোলো বছর পূর্ণ হবে।

- বেশ, বেশ।

বিরাটের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন চাণক্য। তা দেখে আরও একটু আড়ালে লুকিয়ে পড়ল বিরাট। তার আচরণের ব্যাখ্যা দেয়ার ভঙ্গিতে রানি বললেন,

- আমার ছেলে বুদ্ধির দিক থেকে শিশু, আচার্য। কিছুই বোঝে না। অথচ তিরস্কার ছাড়া কিছুই জোটেনি ওর কপালে। বাবার ভালোবাসা থেকেও ও বরাবরই বঞ্চিত ছিল। কারণ ওর অস্বাভাবিকতা। শুধু কুন্তী দিদি আর রবি কোনোদিন ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেনি।

- মাতৃস্নেহ এই জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা, মহারানি। আপনার ছেলে সেই স্নেহ থেকে মোটেই বঞ্চিত নয়। সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এইবার রবিনাথ সিংহাসনে বসলে আপনাদের মঙ্গলই হবে।

মাথা নত করলেন রানি কৌশল্যা। চাণক্য এইবার প্রসঙ্গ বদলে প্রশ্ন করলেন,

- আচ্ছা, আপনার স্বামী অর্থাৎ মহারাজের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?

একটুও না ভেবে দ্রুত উত্তর দিলেন রানি,

- কোনো ধারণাই নেই, আচার্য। অস্বাভাবিক ছেলে জন্ম দেয়ার পুরো দায় উনি আমার ওপর দিয়ে আমায় প্রায় বিতাড়িত করে দেন। এই মহলে আমাদের দু-জনের প্রায় নির্বাসিত জীবনই কেটেছে। আমারও এত বছরে সবসময় আড়ালে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। মহারাজের সঙ্গে আমার অনেক বছর কোনো যোগাযোগই ছিল না। তাই তাঁর সম্পর্কে কোনোরকম তথ্য দিতেই আমি অপারগ। সব কিছুর থেকে দূরে, নির্বিবাদে বাকি জীবন এই ছেলেটাকে নিয়েই কাটিয়ে দেব।

রানি কৌশল্যার চোখের কোণে জলের ফোঁটা দেখা গেল।

চাণক্য আবার প্রশ্ন করলেন,

- আপনি কখনো উত্তর মহলের জানলায় প্রেতমূর্তি দেখেছেন?

- না। তবে অনেকের মুখে এরকম কথা শুনেছি।

এতক্ষণে বিরাট একটু স্বাভাবিক হয়ে বেরিয়ে এসেছে মায়ের আড়াল থেকে। মেঝেতে বসে আছে। জীবসিদ্ধি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে নরম সুরে বলল:

- তোমার নাম কী রাজকুমার? নাম। তোমার নাম?

- র... রবি। রা... বি।

জীবসিদ্ধি মৃদু হেসে উঠল। রবিনাথ সত্যিই বেশ প্রিয় ব্যক্তি এই বালকের কাছে। শিশুরা অনেক সময় নিজের প্রিয় মানুষের নাম নিজের নামে বলে থাকে। এও তাই করছে।

চাণক্য তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

- আজ বিদায় দিন, মহারানি। আপনার মতো মা পাওয়া একজন ছেলের পক্ষে সৌভাগ্যের।

প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলেন দু-জন। ভৃত্যের সঙ্গে, ওপরতলার মহল পরিদর্শন করলেন বাকি সময়টুকু।

৭.

গভীর রাত। আচমকা তীব্র আর্ত চিৎকারে সারা দুর্গ কেঁপে উঠল। ঘুম ভেঙে যায় চাণক্যর। গলা চিনতে অসুবিধা হয় না। রবিনাথ। তার ওপর আক্রমণ হয়েছে নিঃসন্দেহে। আর্তনাদ ভেসে এল দক্ষিণের মহল থেকে।

দ্রুত নিজের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ালেন চাণক্য। যে দৃশ্য দেখলেন তাতে ওঁর মতো লৌহ-স্নায়ু মানুষও কেঁপে উঠলেন এক মুহূর্তের জন্যে।

দক্ষিণ মহলের একটা জানলায়, প্রদীপের মৃদু হলদে আলোয়, রবিনাথকে দেখা যাচ্ছে। জানলার ধারে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে। তার ঠিক পেছনেই তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী মূর্তি। মৃদু আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু আলখাল্লা পরা অবয়বটা দেখা যাচ্ছে। অবয়বটা রবিনাথের দুই কাঁধে হাত দিয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তে মূর্তিটার হাতে ঝলক দিয়ে উঠল একটা বড়ো কৃপাণ। বিদ্যুদ্‌বেগে সে সেটা চালিয়ে দিল রবিনাথের গলা লক্ষ করে। এধার থেকে ওধার টেনে দিল কৃপাণটা। তারপর মৃদু ধাক্কায় রবিনাথের দেহ ফেলে দিল নীচে বয়ে চলা খরস্রোতা নদীতে। চোখের সামনে যুবরাজের দেহ মিলিয়ে গেল অতল অন্ধকারে। শুধু জলে দেহ পতনের শব্দ এল কানে। পরমুহূর্তে দক্ষিণের জানলায় জ্বলতে থাকা প্রদীপ নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হল আততায়ী মূর্তি।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্ত চাণক্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন জানলা আঁকড়ে ধরে। তিনি এখনও নিশ্চিত হতে পারছেন না যে এটা দুঃস্বপ্ন নাকি সত্যিই তিনি এইমাত্র একটা হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন।

ঘোর কাটতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে একটু আগেই তিনি যা চাক্ষুষ করলেন, সেটা একটা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। বাস্তব। নিশ্চয়ই তিনি একা নন, উত্তর মহলের প্রতিটি বাসিন্দা এই ঘটনা দেখেছে। দ্রুত তিনি গুনলেন কোন তলার এবং সিঁড়ির দিক থেকে কত নম্বর ঘরে ঘটল ঘটনাটা। প্রায় প্রতি তলায় একটা বা দুটো প্রদীপ জ্বলছে, যার ফলে প্রতি তলার দুটো একটা জানলা আলো হয়ে রয়েছে। সেই মতো, একদম নীচের তলা থেকে গুনে দেখলেন চার তলার ঘর সেটা। তবে অন্ধকারে সেটা সিঁড়ির থেকে কোন ঘর তা ঠিক অনুমান করতে পারলেন না। তবে সম্ভবত সেটা রবিনাথের পুরোনো ঘর।



দ্রুত নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চাণক্য। ততক্ষণে সারা উত্তর মহলে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ শুধু তিনি একা নন। উত্তর মহলের সব বাসিন্দাই এই দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে ঠিকই। পাশের ঘর থেকে হতবাক দৃষ্টি নিয়ে বেরিয়ে এল জীবসিদ্ধি।

- আচার্য! আচার্য! প্রেত... রাজা... হত্যা...

- দেরি নয়! দ্রুত চলো দক্ষিণ মহলে।

চাণক্য দেয়াল থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন দুটো মহলের মাঝের সেতুপথের দিকে। ততক্ষণে একদল সৈনিকও তাদের পিছু নিয়েছে। সেতু পার করে দক্ষিণ মহলে আসতেই দেখলেন নিজের ঘর থেকে কুন্তী দেবী বিহ্বল ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে নিজের দরজা বন্ধ করছেন। ওঁর চোখে জিজ্ঞাসু এবং আতঙ্কিত দৃষ্টি। তিনিও নিজের ছেলের আর্তনাদ শুনেছেন নিঃসন্দেহে। তাঁদের দেখে তিনি ছুটে এলেন চাণক্যর কাছে সিঁড়ির দিকে। ততক্ষণে নীচের সিঁড়ি থেকেও লোকজনের উঠে আসার আওয়াজ আসছে।

- কী হয়েছে?? রবিনাথের চিৎকার এল! কোথায় সে?

তীব্র আতঙ্কে মুখ সাদা হয়ে গেছে রাজমাতার। তিনি ছেলের বিপদের আশঙ্কা করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ মহলের কেউই ঘটনা চাক্ষুষ করেনি। তাই যে অনর্থ ঘটে গেছে তা তিনি জানেন না। তিনি বাকি সকলের মতোই জানেন যে যুবরাজ উত্তর মহলে আছেন। মহারাজের ঘরে। তাই এই মহলে তাঁর আর্তনাদ শুনে তিনি বিভ্রান্ত।

ওঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চাণক্য সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠতে থাকলেন। সারা তলাটা অন্ধকার। দ্রুত দেখলেন যে পর পর আটটা ঘরের মধ্যে কোন ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু দেখা গেল প্রতিটা দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ। এতক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন রানি কৌশল্যা, বলদেব এবং অমাত্য ভদ্রদাস তথা আরও কিছু সৈনিক এবং দাস-দাসী। দক্ষিণ মহলের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই বিস্মিত কারণ তারা ঠিক বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন আচার্য,

- এই তলায় হত্যাকারী নেই। ওপরের দুটো ফাঁকা তলার কোনো একটাতে সে গা-ঢাকা দিয়েছে নিঃসন্দেহে। সৈনিকরা চার ভাগে ভাগ হও। দু-ভাগ ওপরের দুটো তলা খোঁজো। তৃতীয় দল এইখানেই পাহারায় থাকো আর চতুর্থ দল নীচের দুটো তলা তল্লাশি করো।

বহুক্ষণ চলল পুরো দক্ষিণ মহল তল্লাশি। কিন্তু মহলের কোনো ফাঁকা ঘরেই আততায়ীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। নীচের দুটো তলায় যদিও আগে

থেকেই প্রহরী ছিল, তবু আবার তল্লাশি চালানো হল। এই ফাঁকে চাণক্য চোখ বুলিয়ে নিলেন সেখানে উপস্থিত সবকটা মানুষের দিকে। কুন্তী দেবী ইতিমধ্যে অন্যের মুখে ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। শোকে পাথর হয়ে মেঝেতেই বসে আছেন তিনি। রানি কৌশল্যা নিজের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আছেন। এবং বৃদ্ধ অমাত্য হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে। বলদেবের চোখে-মুখে নেশা এবং বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। তার মুখ দেখে মনে হয় সে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ঘটনাটা। এ ছাড়া কিছু দাস-দাসী এবং সৈনিক এই চারতলায় উপস্থিত। প্রত্যেকেই ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি ও বিস্মিত।

- এই তলায় সৈনিক নেই কেন? পাহারার ব্যবস্থা নেই কেন? এই তলাতেই তো যুবরাজের কক্ষ।

চাণক্যর প্রশ্নবাণের উত্তরে বৃদ্ধ অমাত্য আমতা আমতা করে বললেন,

- আসলে, গতকাল থেকেই তো যুবরাজ নিজস্ব ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তরের মহলে স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন। তাই এই তলা ফাঁকা বলে আর রক্ষী রাখা হয়নি।

- যুবরাজের নিজস্ব রক্ষীরা কই? তাদের কেউ কি এখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে?

চারজন সৈনিক এগিয়ে এল। চাণক্য তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

- তোমরা কোথায় ছিলে? যুবরাজ এখানে কীভাবে এলেন?

- আচার্য, মহারাজ কিছুক্ষণ আগে নিজেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বলেন ওঁর একটা কাজ আছে। এবং আমাদের নির্দেশ দেন ওঁর সঙ্গে না যেতে।

- তলোয়ার ছিল তার সঙ্গে?

এ প্রশ্নের প্রয়োজন যদিও ছিল না। কারণ সকলেই দেখেছে যে রবিনাথের হত্যার সময়েই তার কোমরে তলোয়ার ছিল। তবুও নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করলেন চাণক্য। প্রত্যেকেই জানাল যে যুবরাজ সাধারণ পোশাকে থাকলেও, সঙ্গে তলোয়ার নিতে ভুলে যাননি।

- কী কাজে যাচ্ছেন উনি বলেছিলেন?

- আজ্ঞে না, আচার্য।

কিছুক্ষণ বাদেই একজন সৈনিক এসে জানাল যে সারা মহল খোঁজা হয়েছে। আততায়ী দুরন্ত, সামান্য একটা রক্তের দাগও পাওয়া যায়নি কোনো জানলায়। দক্ষিণ মহলেও খোঁজা শুরু হয়েছে। তবে সেখানে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা যে নেই তা বলে দিতে হয় না। কারণ দুটো মহলের যোগাযোগের একটামাত্র পথ হল সেই সেতু। আর এতজন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে সেতুপথ ধরে কারুর পক্ষেই পার হওয়া সম্ভব ছিল না। কেউ দক্ষিণ মহল থেকে

উত্তর মহলে পালাতে গেলে, তাকে উত্তর মহল থেকে ছুটে আসা মানুষদের মুখোমুখি পড়তেই হত। কিন্তু সেইরকম কাউকেই আসতে দেখা যায়নি।

হতাশাজনক ভঙ্গিতে চাণক্য ডান মুঠো দিয়ে দেয়ালে একটা আঘাত করলেন।

৮.

গতকাল রাত থেকেই সারা দুর্গ জেগে। সকাল হতেই যুবরাজের হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা তোসালিতে। হত্যার ভয়ংকরতা আর অলৌকিকতার গল্প ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। এখন দুর্গর বেশিরভাগ মানুষেরই বিশ্বাস যে এই কাজটা প্রেতের।

চাণক্য রাত থেকেই ঠায় বসে রয়েছেন নিজের কাছের জানলার সামনে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দক্ষিণ মহলের দিকে। রাতের অন্ধকারে দেখা জানলা ঠিক কোনটা ছিল, সেটা এখন আর তিনি নিজেই ঠিক চিহ্নিত করতে পারবেন না। সবারই তথৈবচ অবস্থা। পুরো দৃশ্যটা ঘটতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল গতকাল রাতে। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সম্ভাব্য জানলার কথা বলছেন আর সবই নিছক অনুমান। চাণক্য জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ধ্যান মুদ্রায় শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। ওঁর কপালে গভীর ভ্রূকুটি।

জীবসিদ্ধি দু-একবার কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করে বিফল হওয়ায় এখন চুপ করে চাণক্যরই ঘরে বসে আছে। দুপুরের দিকে সে সামান্য কিছু খাবার খেল এবং দুর্গর বাকি বাসিন্দাদের খবরাখবর নিল। আচার্যকে বার কয়েক খাওয়ার কথা বললেও তিনি আসন ছেড়ে একচুলও ওঠেননি বা একটা শব্দও বলেননি। অতএব জীবসিদ্ধি দুপুরে আর খিদে সইতে না পেরে একাই খেয়ে এল। ফিরে দেখল গুরুদেব এখনও একইভাবে বসে আছেন। তবে এইবার তাকে আসতে দেখে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- দুর্গর বাসিন্দাদের কী অবস্থা দেখলে?

- সবাই আতঙ্কিত। কুন্তী দেবী নিজের ঘরে দরজা দিয়ে বসে ছিলেন। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না। সবাই আশঙ্কা করছিল যে তিনি পুত্রশোকে কিছু একটা অঘটন না ঘটিয়ে ফেলেন। পরে রানি কৌশল্যা গিয়ে তাঁকে সামলিয়েছেন। ছোটোরানির বহু অনুরোধের পর দরজা খুলেছেন কুন্তী দেবী। যদিও এখনও তিনি ছেলের মৃত্যুটা মানতে পারেননি। উনি প্রলাপের মতো বলে চলেছেন যে ওঁর পুত্র নিশ্চয়ই নিখোঁজ হয়েছে। খুঁজলে পাওয়া যাবে।

- আর বাকিরা?

- বলদেবও সকাল থেকে বের হয়নি নিজের ঘর থেকে। সেও হতভম্ব। অমাত্য মহাশয় আপাতত ঠান্ডা মাথায় সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

- হুম।

- আপনি ভেবে কোনো আলো দেখতে পেলেন, আচার্য?

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন চাণক্য। আচার্যকে আবার মৌন অবস্থায় ফিরে যেতে দেবে না ঠিক করেই কথা বাড়াতে জীবসিদ্ধি বলে,

- আচার্য, চলুন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কথায় বলে স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে ভাবনার পরিবর্তন হয়।

এইবার আর আপত্তি না করে চাণক্য উঠে দাঁড়ালেন। দু-জনে দুর্গর বাইরে বাগানে এলেন। পাশ দিয়ে মহানদী বয়ে চলেছে আর বাগানের সমস্ত গাছে ফুলের সমাহার। এখানে এসে ভালো লাগছিল দু-জনেরই। রাতের বিষণ্ণতা কিছুটা হলেও কেটেছে। চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। যদিও বেশিরভাগ কথা জীবসিদ্ধিই বলছে। আচার্য কেবল 'হুম' বলছেন মাঝে মাঝে। বহুবার তাঁর চিন্তাসূত্র নিয়ে প্রশ্ন করায় চাণক্য বললেন,

- সমস্যা হল আগের মৃত্যুটা আদৌ হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু সে-বিষয়ে ভাবতে ভাবতেই গতকালের ঘটনা আমায় নাড়া দিয়ে গেল। এই পুরো ঘটনায় দোষী হিসেবে খুব সহজেই বলদেবকে চিহ্নিত করা যেত, যদি না কাল রাতে তাকে আমরা সবাই নিজের চোখে উত্তর মহল থেকে আসতে দেখতাম। অতএব তার পক্ষে কালকের হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়।

- বেশ। কিন্তু সেইটাই তো সমস্যা। কালকে আমরা প্রত্যেককেই আমাদের পিছু পিছু আসতে দেখেছি। সেই অনুযায়ী তো তবে তাদের কারুর পক্ষেই হত্যাকারী হওয়া সম্ভব নয়। যদি না কোনো সৈনিক বা প্রহরী এই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে।

- সে কী? অশরীরী হত্যাকারীর সম্ভাবনা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলে?

এই কথায় গুরু শিষ্য দু-জনেই হেসে উঠল। সুযোগ বুঝে জীবসিদ্ধি আচার্যর হাতে একটা আপেল ধরিয়ে দিল। সে জানে আচার্য কাল রাত থেকে অভুক্ত। তাই অপেক্ষায় ছিল কখন গুরুর মন একটু হালকা হতেই তাঁকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবে।

- আপেলটি বেশ মিষ্টি, আচার্য। পুরো মধু।

চাণক্য আপেলে একবার কামড় দিয়ে কথা শুরু করলেন,

- সৈনিকের পক্ষে হত্যা সম্ভব বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তা হয়নি। কারণ সেক্ষেত্রে সত্য আজ নয়তো কাল প্রকাশ পাবেই। এবং রাজপরিবারের কেউ যদি এই হত্যাকাণ্ডর নেপথ্যে থাকে, তার নামও প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমার মনে হয় না এতটা মূর্খামি কেউ করবে। হত্যাকাণ্ডর কথা গোপন রাখতে চাইলে নিজের হাতে হত্যা করাই শ্রেয়।

- তাহলে?

- কালকের রাতের ঘটনা নিয়ে আবার চিন্তাভাবনা করতে হবে। কাল রাতে প্রত্যেক বাসিন্দার অবস্থানগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমেই আসি রাজকুমার বলদেবের কথায়। বলদেব গভীর নেশাচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রামগ্ন ছিল। সে ঘর থেকে বের হয়নি সেটা তার ঘরের রক্ষী জানিয়েছে। আমাদের সঙ্গেই সে রাতে প্রথম বের হয়। যদিও এই ক্ষেত্রে বলদেবের নিজস্ব রক্ষীদের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

- আপনাকে এই কথা কে জানাল?

- তুমি যখন খেতে গিয়েছিলে, সেই সময়ে অমাত্য মহাশয় এসেছিলেন। তিনিই নিজের মতো করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। তিনি আজ সকাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা যা তথ্য পেয়েছেন তা আমায় জানালেন।

- বেশ।

- অমাত্য নিজেও রাতে আমাদের পেছনেই ছিলেন তা আমরা জানি। অতএব তিনিও উত্তর মহলেই নিজের ঘরে ছিলেন বলে জানিয়েছেন। এইবার আসা যাক দক্ষিণ মহলে। কুন্তী দেবী। তাঁর পুরো তলায় তিনি একা। তাঁর পক্ষে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চারতলায় যাওয়া সম্ভব। কারণ তিনতলা থেকে সিঁড়িতে কোনো প্রহরী ছিল না। কিন্তু...

- কিন্তু ওঁকে সবার প্রথমেই বাদ দেয়া যেতে পারে। কারণ উনি মা।

- হুমম। ঠিক। কোনো মানসিকভাবে সুস্থ মা তার সন্তানকে হত্যা করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে যেখানে রবিনাথের মৃত্যুতে উনি আবার সর্বহারা হলেন। রাজমাতা হওয়ার বা সুখের দিন দেখার শেষ আশাটাও আর থাকল না। তা ছাড়া, আমরা ওঁকে তিনতলার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। ওঁর পক্ষে কখনোই ওপরের তলায় গিয়ে, হত্যা করে, আবার আমাদের দক্ষিণ মহলে পৌঁছোনোর আগেই সিঁড়ি ধরে নেমে এসে নিজের ঘরে ফেরা সম্ভব না। অতএব এই সম্ভাবনাও বাদ যায়।

- ঠিক।

- এইবার আসা যাক দোতলার অন্য দুই বাসিন্দার কথায়। রানি কৌশল্যা ও তাঁর পুত্র বিরাট।

- আচার্য! আপনি কি বিরাটকেও সন্দেহ করছেন নাকি?

- আমি এখানে মানবিক প্রসঙ্গ দূরে রেখে শুধু যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা করছি। পক্ষপাতিত্বহীন সমান নজরে প্রত্যেককে রেখে সত্যান্বেষণ করাই যেকোনো অপরাধের তদন্তের প্রাথমিক শর্ত। আর তা ছাড়া, আরও একটা বিষয় আছে।

- কী আচার্য?

আপেলটা শেষ করে মাঝের অংশটা একদিকে ছুড়ে ফেলে চাণক্য বললেন,

- রানি কৌশল্যার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে উনি কিছু একটা গোপন করছেন। এমন কিছু তথ্য তিনি জানেন কিন্তু আমাদের কাছে তা প্রকাশ করছেন না। সম্ভবত ভয় পাচ্ছেন তিনি।

- কীসের ভয়?

- একজন মা যে কারণে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বোধ হয় সেই ভয়। তাঁর জীবনে হারানোর মতো তো একটাই জিনিস আছে। তবে কাল রাতের ঘটনায় দোতলার রক্ষীরা জানিয়েছে যে রানি বা রাজকুমার কেউই ওপরে ওঠেনি। আমরা পৌঁছোনোর পরে রানি ওপরে উঠেছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও রক্ষীরা মিথ্যে বলে থাকতে পারে। কিন্তু তাতেও সেই একই প্রশ্ন থেকে যায় যে রানি অথবা বিরাট, হত্যা করে আবার চারতলা থেকে দোতলায় কী করে এত দ্রুত ফিরতে পারলেন।

- তাহলে তো সন্দেহর তালিকা থেকে সকলেই বাদ পড়ল।

- হুম, জীবসিদ্ধি। কিছু একটা আমি ধরতে পারছি না। আমার একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি হচ্ছে যে এই রহস্যর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমি অনেক আগেই পেয়েছি। কিন্তু সেটা আমার মনে পড়ছে না। অতি সামান্য কোনো একটা ঘটনা। অথবা সামান্য কোনো সাধারণ, আপাত গুরুত্বহীন তথ্য। যেটা মনে পড়লেই ধরা দেবে রহস্যর সমাধান সূত্র।

চলতে চলতে একটা বাঁক ঘুরতেই তাঁরা দেখতে পেলেন রাজকুমার বিরাটকে। একটা গুলমোহর ফুলগাছের পেছনে লুকিয়ে আছে বিরাট। ঠিক যেমন একটা শিশু লুকোচুরি খেলে, সেভাবে। সে দু-জনকে আসতে দেখেনি। নিজের খেলায় মেতে আছে উৎফুল্ল মনে। দূর থেকে তার মায়ের ডাক শুনতে পাওয়া গেল,

- বীরা! বীরা! কই লুকোল আমার চাঁদের কণা?

খিল খিল করে হেসে উঠল বিরাট। সত্যিই সরল শিশু। মনে মনে ভাবল জীবসিদ্ধি। আর আচার্য কিনা একেও সন্দেহর তালিকায় রেখেছেন।

মাকে আসতে দেখেই বিরাট আবার অন্য একটা জবাফুল গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়তে দৌড় দিল।

- বীরা! বীরা!

রানি কৌশল্যা এগিয়ে আসতে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধিকে দেখতে পেলেন। দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে গেলেন ছেলেকে খুঁজতে। জীবসিদ্ধি আবার পা বাড়াল সামনে। দু-পা এগিয়েই খেয়াল করল আচার্য তার পাশে নেই। পেছন ঘুরে চাণক্যকে দেখে চমকে গেল জীবসিদ্ধি।

চাণক্য নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। কপালে ভ্রূকুটি এবং

চোখের তারা জ্বলজ্বল করছে। তাঁর দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ, কিন্তু মানসচক্ষুতে অন্য কিছু দেখছেন। এই দৃষ্টি জীবসিদ্ধির পরিচিত। খুব পরিচিত। এই দৃষ্টি রহস্যের অন্ধকারে আলোকবিন্দু দেখতে পাওয়ার ইঙ্গিত। বিড়বিড় করে নিজের মনে কিছু বলছেন চাণক্য। তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে কয়েকটা খাপছাড়া শব্দ শুনতে পেল শুধু।

- প্রথমটা হল... দ্বিতীয়টা আলাদা?... কিন্তু কীভাবে?

কয়েক মুহূর্ত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ চিন্তাজাল থেকে নিজেই বেরিয়ে এলেন চাণক্য। বললেন,

- ওহে জীবসিদ্ধি, ঘরে ফিরে চলো। আমার জন্যে আরও কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। পারলে কিছু মিষ্টিও। এখন তা উদরস্থ করে আমি ধ্যানে বসব। রাতে আর আমায় ডাকবে না। ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। শেষ সূত্রটা খুঁজতে হবে।

দ্রুত ফিরে চললেন আচার্য। হাঁটার গতি বাড়িয়ে জীবসিদ্ধি ওঁর পাশাপাশি পৌঁছে প্রশ্ন করল,

- সূত্র পেলেন??

- হুম। তাও আবার একটা নয়। একসঙ্গে দুটো।

এরপর আর হাজার প্রশ্ন করলেও একটা উত্তরও আচার্য যে দেবেন না, সেটা জীবসিদ্ধি জানে। তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে, দুর্গে প্রবেশ করে গুরুর নির্দেশ পালন করতে লাগল সে। মা আর ছেলের সামান্য এই লুকোচুরি খেলা থেকে তার গুরুদেব কী এমন সূত্র পেলেন তা অনেক ভেবেও জীবসিদ্ধি অনুমান করতে পারল না।

৯.

পরের দিন সকালে জীবসিদ্ধির ঘুম ভাঙল তার নিজের ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দে। দরজা খুলে দেখল স্বয়ং আচার্য চাণক্য দাঁড়িয়ে আছেন।

- কী হল আচার্য? কী ঘটেছে?

- সুপ্রভাত। কিছুই ঘটেনি। তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আচার্যদের এই যৎসামান্য অত্যাচার শিষ্যদের সহ্য করতেই হয়। এটা তাদের শিষ্য ধর্মেরই অঙ্গ। গুরুদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাঁর ছাত্রর ঘুম ভাঙানোর।

গুরুর কথায় হেসে ফেলে জীবসিদ্ধি। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে কালকের চিন্তাভাবনা নেহাতই বিফল হয়নি। তাই আজ আচার্যর মনে সামান্য কৌতুকের আভাস দেখা দিয়েছে।

- কিছুক্ষণ সময় দিলাম। তৈরি হয়ে নাও। বেশ কিছু করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার আছে আজ আমাদের। তোমায় ছাড়া এই কাজগুলো আমি একা করলে তুমিই পরে আমায় দোষারোপ করবে যে তোমায় কোনো তথ্য আমি দিইনি।

এই কথা বলেই আচার্য সোজা নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই জীবসিদ্ধি হাজির হল গুরুর সামনে। চাণক্য প্রথমেই একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন অমাত্য ভদ্রদাসকে তলব করতে। খানিক বাদেই অমাত্য চাণক্যর ঘরে ঢুকলেন। একে অপরকে প্রণাম জানিয়ে চাণক্য বললেন,

- অমাত্য মহোদয়, প্রথমেই আপনাকে এভাবে তলব করার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। এইবার আপনাকে আমি কিছু কথা বলব যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তোসালির বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে এই মুহূর্তে বলা চলে রাজ্য শাসকহীন। তাই আমি এই রাজ্যের আপতকালীন শাসন সরাসরি মগধের হাতে তুলে নিচ্ছি। এই মুহূর্ত থেকে তা কার্যকর করা হল। আপনি এই নির্দেশ ঘোষণা করে দিন। মগধের অঙ্গরাজ্য হিসেবে সেই ক্ষমতা আইনত মগধের আছে।

প্রধান অমাত্যর মুখে স্পষ্ট উদ্‌বেগ আর ভয় ফুটে উঠল। তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সম্ভবত সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে আচার্য তোসালির স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চাইছেন। বৃদ্ধর মনের ভাব অনুমান করতে পেরেই চাণক্য ওঁকে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন,

- আহা! আপনি যে দেখছি ভীত হয়ে পড়লেন, আর্য। আপনাকে আমি আশ্বস্ত করছি যে আপনার উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে এটা সম্পূর্ণ সাময়িক। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

প্রায় হাফ ছেড়ে বাঁচলেন বৃদ্ধ। বললেন,

- বেশ। আপনার কথায় আমি ভরসা করছি, মহামতি।

- হুম। এইবার, যেহেতু এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যর প্রতিনিধি স্বয়ং আমি, অতএব আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে রাজকুমার বলদেবের ঘর এবং তার ছবি আঁকার ঘরে তল্লাশি চালানো হোক। এই তল্লাশি আপনার এবং জীবসিদ্ধির তত্ত্বাবধানে, মগধের সৈনিকরা করবে। আমি যে বিশেষ জিনিসটা খুঁজছি সেটা হল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের অংশ। বিশেষ করে একটা রুদ্রাক্ষের মালা। তবে এগুলো নাও পাওয়া যেতে পারে। বলদেব বাধা দিলে মগধের সৈনিকদের দ্বারা বল প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলাম জীবসিদ্ধিকে।

- বেশ। তাই হবে।

- আমি দু-জনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম জন হলেন কুন্তী দেবী। আর দ্বিতীয় জন হলেন ছোটোরানি কৌশল্যা। আপাতত আপনার আর কোনো দায়িত্ব নেই, অমাত্য মহোদয়। আপনি আমার নিজস্ব সৈন্যদের তৈরি হতে বলুন। তাদের নিয়েই তল্লাশির কাজ সমাধা হবে।

নমস্কার জানিয়ে বৃদ্ধ অমাত্য চলে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- অর্থাৎ বলদেবই সেই ছদ্মবেশে অশরীরী কাপালিক?

- হুমম। তা তো বটেই। অন্যথায় এত সুন্দরভাবে অশরীরীর বর্ণনা কীভাবে দেবে? তুমি যাও হে জীবসিদ্ধি। গিয়ে কুন্তী দেবীকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। প্রহরী যেন ওঁকে বলে যে ওঁর সঙ্গে আচার্য চাণক্যর বিশেষ প্রয়োজন।

- বেশ। তার মানে আপনি সব সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন?

এইবার গম্ভীর হল চাণক্যর মুখমণ্ডল। বললেন,

- নাহ। শেষ একটা সূত্র এখনও অধরা।

- অর্থাৎ?

- যেকোনো রহস্যর সমাধানে তিনটে প্রশ্নের উত্তর পেতে হয়। 'কে?'-র উত্তর আমি জানি। 'কেন?'-র উত্তরও আমার এখন জানা। কিন্তু 'কীভাবে?'-র উত্তর এখনও আমার অধরা।

১০.

কুন্তী দেবী ঘরে ঢুকে প্রণাম জানালেন চাণক্যকে। চোখে-মুখে এখনও বিষণ্ণতার ভাব স্পষ্ট। প্রতিনমস্কার জানিয়ে চাণক্য সোজাসুজি কাজের কথায় চলে গেলেন।

- কুন্তী দেবী। এই শোকের সময়ে আপনাকে বিব্রত করার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে দিয়ে আমার একটা জিনিস পরীক্ষা করাতে হবে বলে এখানে ডেকে পাঠালাম। দেখুন তো এই চিঠিটা। এই হাতের লেখা আপনার পরিচিত? আমি সন্দেহ করছি এই হাতের লেখা আপনার দুই ছেলের মধ্যে একজনের।

কুন্তী দেবী চিঠিটা আচার্যর হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। যদিও তিনি নিজে পড়তে পারবেন না। কিন্তু হাতের লেখা তিনি দেখে বুঝতে পারবেন হয়তো। বেশ কিছুক্ষণ দেখে তিনি চিঠিটা ফেরত দিলেন।

- না, আচার্য। ক্ষমা করবেন। লেখা পড়তে না পারলেও আমি প্রত্যেকের হাতের লেখা চিনি। তাই নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই হাতের লেখা আমার অচেনা। কী লেখা আছে এই চিঠিতে?

- এটা কারুর নিজের প্রেয়সীকে লেখা প্রেমপত্র। কিন্তু এতে বেশ কিছু গোপন তথ্য আছে। আমি এই চিঠিটা খুঁজে পেয়েছি গতকাল। এটা যদি রাজপরিবারের কারুর লেখা না হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ দাঁড়াল যে সৈনিকদের মধ্যে কেউ গোপন তথ্য ফাঁস করছে। আপনাকে অকারণ বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, মহাশয়া।

নমস্কার জানিয়ে কুন্তী দেবী চলে গেলেন। জীবসিদ্ধি এতক্ষণ উৎসুক হয়ে

ছিল। হঠাৎ এই চিঠি কোথা থেকে এল তা তার অজানা। এবং আচার্য যে আগে এই বিষয়ে কিছু বলেননি, সেই কথা ভেবেও মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হল।

- আচার্য, কীসের চিঠি? আমায় তো কিছু বলেননি। এর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডর যোগ কোথায়?

চোখে কৌতুকের আভাস ফুটল চাণক্যর। ভূর্জপত্রটা শিষ্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

- নিজেই দেখে নাও।

চিঠিটা দেখে অবাক হল জীবসিদ্ধি। এতে একগাদা অসংলগ্ন কথা লেখা আছে। লেখাটার বিশেষ কোনো অর্থই দাঁড়ায় না। সবচেয়ে অদ্ভুত হল এতে তিনটে আলাদা রঙের কালি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। এবং এই হাতের লেখা জীবসিদ্ধির অতি পরিচিত। এই লেখা স্বয়ং আচার্য চাণক্যর।

- এর অর্থ কী আচার্য? এ কেমন রসিকতা আপনার?

উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ পালটে চাণক্য বললেন,

- যাও হে, জীবসিদ্ধি। এইবার ছোটোরানিকে ডেকে আনো। সঙ্গে বিরাট আসতে চাইলেও আপত্তি কোরো না।

* * *

রানি কৌশল্যা একাই এলেন আচার্যর ঘরে। আচার্য তাঁর দিকে চেয়ে বললেন,

- মহাশয়া, আমি জানি বিরাট কী দেখেছিল।

এই কথার আশ্চর্য প্রভাব পড়ল রানি কৌশল্যার ওপর। তিনি চাণক্যর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। মিনতির ভঙ্গিতে বললেন,

- আচার্য! দয়া করুন! এই কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেলে আমার ছেলের নিশ্চিত জীবনহানি হবে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। যেখানে রবিনাথের মৃত্যুর পর আর কয়েকদিন পরেই বলদেব রাজসিংহাসনে বসতে চলেছে।

- আরে... আরে... উঠুন রানি। আপনি যা করেছেন তা নিজের ছেলের জীবন রক্ষার্থে। আমি সবই বুঝি এবং আপনাকে একবারও দোষ দিই না। উঠুন চোখের জল মুছে নিন।

রানি উঠে দাঁড়াতে আবার বললেন আচার্য,

- বিরাটের ওপর কোনো আঘাত আসতে দেব না এই কথা দিলাম আপনাকে। কিন্তু আপনাকেও আমার কথা রাখতে হবে। আপনাকে যথাসময়ে সর্বসমক্ষে সত্যটা প্রকাশ করতেই হবে।

- আপনি অভয় দিলে আমি রাজি।

- অনেক ধন্যবাদ, মহাশয়া। আপনি আসতে পারেন।

- আপনাকে ধন্যবাদ, আচার্য। আপনি কীভাবে এই তথ্য জানলেন আমি

জানি না। এই তথ্য আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না। অথচ আপনি কোন অলৌকিক ক্ষমতায় তা জানলেন?

মৃদু হেসে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- যুক্তিনির্ভর অনুধাবন এবং অনুমানের সাহায্যে, মহাশয়া।

রানি কৌশল্যা বেরিয়ে যেতেই আবার জীবসিদ্ধির প্রশ্নবাণ ছুটে গেল,

- আচার্য! কী ঘটল একটু আগে? আমি তো এক বর্ণও বুঝিনি কী বিষয় নিয়ে কথা হল আপনাদের মধ্যে। রানি কি তবে জানেন যে রবিনাথের হত্যাকারী কে?

- না। তিনি জানেন না। তবে ছোটোরানি অসম্ভব বুদ্ধিধারী রমণী। বোধ হয় উনি ঠিক না জানলেও অনুমান করতে পারেন হত্যাকারীর পরিচয়।

- তাই যদি হয় তো এতক্ষণ কোন গোপন কথা জানার কথা হচ্ছিল?

উত্তর না দিয়ে চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে শুধুই মৃদু হাসলেন।

১১.

পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই চাণক্য ও জীবসিদ্ধি নদীর তটের উদ্দেশে হাঁটছেন। তাঁদের পেছনে অনতিদূরে দু-জন রক্ষী চলেছে। প্রভাতকালীন ভ্রমণের প্রস্তাবটা জীবসিদ্ধিই উপস্থাপন করেছিল গতকাল। মহানদীর কূলে সূর্যোদয় দেখা তাঁদের উদ্দেশ্য।

গতকাল রাজকুমার বলদেবের ঘর তল্লাশি করে কিছু না পাওয়া গেলেও ছবি আঁকার ঘরে একটা রুদ্রাক্ষের মালা ঠিকই পাওয়া গেল। বলদেব সেটা তার নয় বলে অস্বীকার করেছে। অতএব প্রমাণ না হওয়া অবধি চাণক্যর আদেশে তাকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। দু-জন মগধের সৈনিক সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকবে।

পথ চলতে চলতে আলোচনা আবার হত্যাকাণ্ডর প্রসঙ্গে চলে আসে।

- আচার্য। আপনি কীভাবে গতকাল বললেন যে রুদ্রাক্ষের মালা ওই আঁকার ঘরেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

- একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই তা তুমিও অনুমান করতে সক্ষম হবে।

- আচ্ছা, বেশ। সে না-হয় বললেন না। কিন্তু আমরা যদি নিশ্চিতই হই যে বলদেবই হত্যাকারী, তবে তাকে গ্রেফতার কেন করছি না?

- কারণ আমি এখনও শেষ সূত্রটা পাইনি। আমি এখনও জানি না যে হত্যাকারী কীভাবে সবার সামনে হত্যা করে কোন মন্ত্রবলে আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হল। এই একটা প্রশ্নই আমায় ভাবিয়ে চলেছে সবচেয়ে বেশি।

- ঠিকই। বলদেব কীভাবে উত্তরের মহল থেকে সবার নজর এড়িয়ে

দক্ষিণে গেল এবং কীভাবে হত্যা করার পর আবার আমাদের আগেই ফিরে এল সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

- জীবসিদ্ধি। এতে বোঝার কিছু নেই। এই কাজ অসম্ভব।

- তবে?

প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে চাণক্য দূরের নদীর দিকে দেখালেন।

- ওই দেখো। সামনেই নদী চওড়া হয়েছে। ওই দেখা যায়। ঠিক সময়ে এসেছি। সূর্যোদয়ের ক্ষণ আসন্ন। এখন চুপ করে আমরা সূর্যদেবের দর্শন করব।

সূর্যর প্রথম কিরণ এসে পৃথিবীকে স্পর্শ করল। চাণক্য নদী থেকে অঞ্জলি ভরে জল তুলে সূর্যপ্রণাম মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। অঞ্জলির জল সূর্যের উদ্দেশে অর্পণ করে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন এবং বললেন,

- হে সূর্যদেব, তোমার কিরণ যেমন আঁধার সরিয়ে আলোর পথ দেখায়, আমারও মনের আঁধার সরিয়ে আলোর পথ দেখাও। আহা! প্রকৃতির কী অপূর্ব শোভা দেখো, জীবসিদ্ধি। তোমার কথায় রাজি হয়ে আজ এখানে এসে বড়োই ভালো লাগল। মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। চলো, ওই জায়গাটায় একটু বসি। প্রকৃতির শোভা দেখি একটু।

বসলেন দু-জন। চাণক্য পদ্মাসনে বসে নদীর বাহার দেখছিলেন। নদীর দিক থেকে কয়েকটা ছোটো নৌকো অনেকক্ষণ ধরে কিনারের দিকে এগিয়ে আসছিল। এতক্ষণে এসে পাড়ে ভিড়ল। কাঁধে জাল আর প্রচুর মাছ নিয়ে একদল মৎস্যজীবী নেমে এল। দুই ব্রাহ্মণকে বসে থাকতে দেখে তারা প্রণাম জানাল। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- ওহে, শোনো। তোমরা কি সারারাত মাছ শিকার কর?

- হ্যাঁ, ব্রাহ্মণদেব। এই শেষরাতের দিকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে নদীর জল নেমে যায়। তখন মাছ ধরা পড়ে অনেক। আবার একটু পরেই জল ফুলে ওঠে। তখন আমরা ফেরার পথ ধরি। আসতে আসতে সকাল হয়ে যায়।

- বেশ, বেশ।

মৎস্যজীবীরা তাদের পথ ধরল। তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন আচার্য। জীবসিদ্ধি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার আচার্যর মুখের ভাব দেখে থমকে গেল। চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি, চোখ উজ্জ্বল। আচমকা উঠে দাঁড়ালেন।

- তাড়াতাড়ি দুর্গে চলো। একটা বিষয় এক্ষুনি নিজের চোখে দেখা দরকার।

- কী? কী হল, আচার্য?

উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ফিরে চললেন চাণক্য। দুর্গের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে সিঁড়ির কাছে এলেন। সিঁড়ির ঠিক পাশ থেকে নদীর জল শুরু হয়েছে। সেই জলের দিকে পা বাড়ালেন আচার্য। আটকানোর আগেই তিনি জলে তিন পা নেমে গেছেন।

জীবসিদ্ধি বলে উঠল,

- আরে, করেন কী আচার্য?

- জলের নীচে সিঁড়ি নেমে গেছে, জীবসিদ্ধি! এর তাৎপর্য বুঝতে পারছ?

- ন... না? কী বলতে চাইছেন?

- জলের নীচে, দুর্গর আরও একটা তলা আছে। আমি শেষ সূত্রটা পেয়ে গেছি, জীবসিদ্ধি। অবশেষে রহস্যর সমাধান হয়েছে !!

১২.

চাণক্যর নির্দেশে সভাঘরে সবাই উপস্থিত হয়েছেন। বলদেবের আসতে আপত্তি ছিল। কিন্তু তাকে জোর করেই নিয়ে এসেছে দুই সৈনিক। কুন্তী দেবী বিহ্বল চোখে বসে আছেন। তাঁকে উদ্ভ্রান্ত লাগছে এই প্রথমবার। বৃদ্ধ অমাত্য ভদ্রদাসের বয়স এই কয়েক দিনের ধকলে যেন আরও কয়েক বছর বেড়ে গেছে। একমাত্র ছোটোরানি কৌশল্যার দৃষ্টি দৃঢ় এবং তিনি চোয়াল শক্ত করে বসে আছেন। তাঁর পাশেই বিরাট একটা কাঠের পুতুল নিয়ে খেলছে। এ ছাড়া দুর্গর সমস্ত দাস-দাসী, রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং সৈনিকরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চাণক্য ঢুকেই প্রথমে প্রত্যেকের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি দিলেন। প্রত্যেকে উপস্থিত হয়েছে সেটা লক্ষ করে সভার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে জীবসিদ্ধি অমাত্যর পাশের আসনটা দখল করল। যাতে তাঁর কথা সভার প্রত্যেকটা মানুষ শুনতে পায় তাই উচ্চকণ্ঠে কথা শুরু করলেন চাণক্য,

- আজ আপনাদের সবাইকে এখানে একত্রিত করার কারণ আপনারা অনেকেই হয়তো অনুমান করতে পারছেন। তবু আমি নিজের মুখে বলে দিই। আজ এখানে আমি দুটো হত্যারহস্যর সমাধান করব।

সারা সভায় গুঞ্জন উঠল। আচার্য আবার শুরু করলেন,

- হ্যাঁ। ঠিকই শুনছেন। গত এক মাসের মধ্যে একটা নয় দু-দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে এই দুর্গে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে প্রথম হত্যাকাণ্ডটাকে হত্যা হিসেবে চিহ্নিতই করা হয়নি। বেশিরভাগ মানুষই সেটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা অলৌকিক অভিশাপের ফল ভেবে নিয়েছেন। হ্যাঁ। আমি মহারাজ মহিপালের হত্যার কথা বলছি। ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এবং আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে তা কোনো প্রেতের দ্বারা সমাধা হয়নি। ওঁর মৃত্যু হয় বিষ প্রয়োগে!

একটু বিরতি নিয়ে সবার দিকে একবার দেখে নিলেন চাণক্য।

- এইবার প্রশ্ন হল কে হত্যাকারী? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর হয়। রাজার মৃত্যুতে যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে, হত্যাকারী সে-ই। এই ক্ষেত্রে মহারাজের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিলেন রাজকুমার রবিনাথ এবং তাঁর মা কুন্তী দেবী। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই তথ্য কিন্তু মহারাজার মৃত্যুর আগে অজানা ছিল। রবিনাথ ও কুন্তী দেবী আশাও করেননি যে মহারাজ রবিনাথকে যুবরাজ ঘোষণা করতে চলেছেন। কারণ মহারাজের ইচ্ছাপত্রর কথা কেবলমাত্র জানতেন অমাত্য মহাশয়। অতএব অন্য সকলের মতোই রাজকুমার বলদেব ধরেই নিয়েছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ-পুত্র হিসেবে উনিই রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তাই বাবা যখন তাঁর অরাজকীয় চালচলন নিয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন তখনই বলদেব বাবাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

- সব মিথ্যে! এ মগধের ষড়যন্ত্র! আমাকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করে, মগধ চায় তোসালির শাসন নিজেদের হাতে নিতে। এই ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ফেটে পড়লেন রাজকুমার বলদেব। চাণক্য শান্ত কণ্ঠে বললেন,

- রাজকুমার। আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগ পাবেন। তার আগে আমি আমার কথা শেষ করে নিই?

দুই প্রহরী বলদেবের কাঁধে চাপ দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিল। চাণক্য কথা শুরু করলেন,

- প্রথমত বলদেব জানতেন যে বিষ প্রয়োগের হত্যাকে প্রাকৃতিক মৃত্যু বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যাবে। যদি কেউ সন্দেহ করে হত্যাকাণ্ড বলে, তাদের জন্যে উনি ছড়াতে লাগলেন এক অশরীরী কাপালিকের অভিশাপের গল্প। নিজে ছদ্মবেশে মাঝে মাঝেই রাতে দেখা দিতেন তাঁর বাবাকে। অবশ্যই যতটা সম্ভব অন্যের নজর এড়িয়ে। হয়তো আশা করেছিলেন দুর্বল হৃদয় মহারাজের ভয় পেয়ে মৃত্যু হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় বলদেব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করলেন নিজের পিতাকে। রাজকুমার ছদ্মবেশ, নিজের কাছে না রেখে, তা লুকিয়ে রাখতেন ছবি আঁকার ঘরে, যাতে রাতে নিজের ঘর থেকে সন্ন্যাসীর সাজে তাঁকে বের হতে কেউ না দেখে। ছবি আঁকার অছিলায় মাঝে মাঝেই রাতে চলে যেতেন আঁকার ঘরে। এবং সেখান থেকে আলখাল্লা, দাড়ি, রুদ্রাক্ষ আর কৃপাণ নিয়ে অশরীরীর বেশে বেরোতেন। কিন্তু তিনি অনেকেরই চোখে পড়ে যান। দাস-দাসীরা তাঁকে অশরীরী ভাবলেও, অন্তত একজন কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করল। রাজকুমার রবিনাথ। কিন্তু নিজের পরিস্থিতি বুঝে রবিনাথ চুপ থাকলেন।

নিজের সন্দেহর কথা শুধু তাঁর মাকে জানালেন। কিন্তু মা কুন্তী দেবী এই কথা তাঁকে অন্যকে বলতে বারণ করলেন। কারণ পরিস্থিতি তাঁদের অনুকূল ছিল না সেই সময়ে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর যখন রবিনাথ জানতে পারেন যে তিনি যুবরাজ এবং তাঁর আর ভয়ের কিছু নেই, তখন তিনি নিজের সন্দেহর কথা আমায় বলেন। জীবসিদ্ধি আমার কথার সাক্ষী।

আবার বাধা দিল বলদেব,

- সব মিথ্যে। কী প্রমাণ আছে? ওই ছবি আঁকার ঘরের একটা রুদ্রাক্ষের মালা? হা-হা! ওটা প্রমাণ নয়। বাকি ছদ্মবেশ কই?

আবার শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন চাণক্য,

- ঠিক বলেছেন। ওটা হত্যাকাণ্ডর প্রমাণ নয়। ওটা খুঁজে পাওয়া শুধুমাত্র আমার অনুমান সত্যতার প্রমাণ। বাকি ছদ্মবেশ কোথায়, সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাতত আপনার হত্যাকাণ্ডর প্রমাণ দিই। আপনার অপকর্মর একজন সাক্ষী আছে, রাজকুমার বলদেব। সে নিজের চোখে আপনাকে বিষ প্রয়োগ করতে দেখেছিল। এ তথ্য আপনার অজানা। কারণ সেই ব্যক্তির নাম আপনার জানা থাকলে আপনি তাকে আগেই হত্যা করতেন। বাবাকে হত্যা করতে আপনাকে যে নিজের চোখে দেখেছিল সে এই মুহূর্তে এই সভায় উপস্থিত।

এইবার কথা বেরোয় না বলদেবের মুখ থেকে। মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

- আপনার পাপের সাক্ষী স্বয়ং ছোটো রাজকুমার। রাজকুমার বিরাট!

সভায় উপস্থিত প্রতিটা চোখ ঘুরে গেছে বিরাটের দিকে। সে অবশ্যই নিজের মনে খেলে চলেছে। কোনো কথাই সে খেয়াল করেনি।

- ওই উন্মাদ? ওর কথা কে বিশ্বাস করবে?

কথাটা বলদেব বলল। উত্তর দিলেন আচার্য।

- আমি। তার মা। সকলেই করবে। কারণ তার পক্ষে বানিয়ে মিথ্যে বলা সম্ভব নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হল, এই দুর্গে আমি আসার প্রথম দিনেই রাজকুমার বিরাট সবার সামনে আপনাকে হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু আমরা কেউ তার কথা বুঝিনি, শুধু তার মা ছাড়া। বিরাটকে কয়েকদিন আগে তার নাম জিজ্ঞেস করায় সে জীবসিদ্ধিকে উত্তর দিয়েছিল তার নাম-'রবি'। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে বিরাট নিজের বড়ো দাদা রবিনাথের নাম বলছে। এটা আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। বিরাট ঠিক উত্তরই দিয়েছিল। সে বলেছিল 'রাবি'। আসলে বিরাট বেশি উত্তেজিত হলে, তার কথার অক্ষর উল্টে যায়। এই ব্যাপারটা পরে অনুমান করতে পারি যখন দু-দিন আগে বিরাটকে তার মায়ের সঙ্গে বাগানে খেলতে দেখলাম। তার মা তাকে ডাকে

‘বীরা’ নামে। বিরাট নিজেকে তার মায়ের দেয়া নামেই পরিচয় দেয়। কিন্তু উত্তেজনায় ‘বীরা’ হয়ে গিয়েছিল ‘রাবি’। এইবার আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। মহারাজের ইচ্ছাপত্র পাঠের সন্ধ্যায় রাজকুমার বিরাট বড়ো রাজকুমারকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বলদেবের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলে একটা শব্দ বার বার উচ্চারণ করেছিল বিরাট। মনে পড়ে শব্দটা কী ছিল?

- শিব!

একসঙ্গে উত্তর দিল জীবসিদ্ধি এবং অমাত্য। চাণক্য বললেন,

- ঠিক! কিন্তু এখানেও আমরা ভুল করি তার কথা বুঝতে। সে বলছিল ‘ষিব’, কিন্তু বলতে চেয়েছিল ‘বিষ’। তার মা আগেই জানতেন পুরো ঘটনা। কিন্তু নিজের পরিস্থিতি বিচার করে কথাটা কাউকে তিনি জানাননি। কারণ ভাবী মহারাজের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা মূর্খতা। এতে বিরাটের প্রাণ সংশয় দেখা দেবে। কিন্তু বিরাট এত কিছু না ভেবেই সবার সামনে কথাটা বলে ফেলায় তার মা ভীত হয়ে পড়েন সেই সন্ধ্যায়। রানি কৌশল্যাকে অনেক আগেই বিরাট সব বলেছিল। একমাত্র মা-ই সবসময় তার সন্তানের ভাষা বুঝতে পারে। রানি সেইসব কথা সর্বসমক্ষে এতদিন বলেননি। কিন্তু এইবার তিনি বলবেন।

উঠে দাঁড়ালেন রানি কৌশল্যা। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

- হ্যাঁ, আচার্যর বলা প্রতিটা কথা সত্য। ছেলের প্রাণের ভয়ে এতদিন আমি মৌন ছিলাম। কিন্তু এখন আমি প্রস্তুত। মহারাজের মৃত্যুর দিন তাঁর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার ছেলে সব দেখেছিল। এবং এসে আমায় রাজকুমার বলদেবের দ্বারা ঘটানো হত্যাকাণ্ডর বিবরণ সে দেয়। আমি নিজের সন্তানের এবং নিজের রাজকুলের নামে শপথ করে বলছি। রাজকুমার বলদেব তার বাবা তথা আমার স্বামী মহারাজ মহিপালের হত্যাকারী!

সারা সভা ফেটে পড়ল গুঞ্জনে। কুন্তী দেবীর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। তিনি অনেক কষ্টে নিজের গলা থেকে নির্গত হতে চাওয়া চিৎকার সংবরণ করে রেখেছেন মনে হল। কিন্তু এতক্ষণে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ অমাত্য এবং অন্যান্য সভাসদ। অমাত্য বললেন,

- বাবার এবং ভাইয়ের হত্যার অপরাধে আমি রাজকুমার বলদেবকে আটক করার নির্দেশ দিচ্ছি।

- না! না! আমি রবিনাথকে হত্যা করিনি। আমি... আমি করিনি তাকে হত্যা।

বলদেবের কথায় কান না দিয়ে অমাত্য বললেন,

- এখনও মিথ্যের আশ্রয় নেবে তুমি, বলদেব? ধিক্কার তোমায়! বাবার হত্যায় তোমায় এমনিতেই শূলে চড়ানো হবে। ভাইয়ের হত্যার দায়ে আমি সম্ভব হলে তোমায় দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড দিতাম।

- কিন্তু... কিন্তু আমি সত্যি রবিনাথকে হত্যা করিনি।

- রাজকুমার ঠিক কথাই বলছেন।

সকলে চমকে ওঠে এইবার। কারণ আগের কথাটা যার মুখ থেকে বেরিয়েছে তিনি স্বয়ং আচার্য চাণক্য। ওঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আরও একবার ঘুরে গেছে উপস্থিত সভাসদদের দিকে। বললেন,

- রবিনাথের হত্যাকারী বলদেব নয়। তার হত্যাকারী অন্য এক ব্যক্তি।

১৩.

উপস্থিত সকলের তীব্র গুঞ্জন প্রায় কোলাহলের পর্যায়ে পৌঁছেছে। চাণক্য ডান হাত তুলতেই পরমুহূর্তে নিশ্চুপ হয়ে গেল সভাঘর। সূচ পতনের নীরবতা ঘরে। চাণক্য গম্ভীর মুখে বলে চললেন,

- শীল বড়ো তাৎপর্যময় জিনিস। শীল অর্থাৎ মা-বাবা তথা বংশ সূত্রে পাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। পণ্ডিতরা বলেন রক্ত কথা বলে। রক্তের মাধ্যমে পাওয়া গুণ-সমষ্টি মানুষের চরিত্র, গতিবিধি, স্বভাব তথা ভবিষ্যৎ সব নির্ধারণ করে। এই পুরো ঘটনাক্রমে শীলের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান।

কথাগুলো কিছুটা যেন নিজের মনেই বললেন আচার্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

- যুবরাজ রবিনাথের হত্যার ঘটনায় আসা যাক। রাত তৃতীয় প্রহরে তার চিৎকার শোনা যায় দক্ষিণ মহলে। তার পরের দৃশ্য এখানে উপস্থিত বেশিরভাগ মানুষেরই চোখের সামনে ঘটে। কিন্তু তার মৃত্যু রেখে যায় কিছু প্রশ্নচিহ্ন। প্রথমত তার আর্তনাদ সর্বপ্রথম শোনা গেছিল। অর্থাৎ ধারণা করা যায় যে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাহলে তারপর তাকে আমাদের সামনে, জানলায় দেখিয়ে কেন আবার গলায় কৃপাণ চালানো হল? তবে কি হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাকে সবাই দেখে হত্যা করতে? দ্বিতীয়ত, আমি রবিনাথকে সাবধান করেছিলাম যে তার ভাই তাকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। সে নিজেও সেই সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত ছিল। অথচ তার পরেও সে রাতে স্বেচ্ছায় নিজের ঘর ছেড়ে একলা গেল কেন? তার সঙ্গে তলোয়ার ছিল। তবুও তাকে হত্যা করা হল সহজেই। কেন? এর একটাই উত্তর হয়। সেই রাতে রবিনাথ যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তি তার পরিচিত এবং অত্যন্ত ভরসাযোগ্য ব্যক্তি, যার কাছে রাজকুমার এতটাই নিশ্চিন্ত ছিল যে অসাবধান হয়ে পড়েছিল। এখানে সেইরকম মানুষ একজনই উপস্থিত আছেন। এমন একজন যাকে রবিনাথ এতটাই ভরসা করতেন যে তাঁর মনের সব কথা তাঁকেই প্রথম বলতেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি সেই ব্যক্তির থেকে কোনো কথা গোপন করেন না।

- আচার্য? এ আপনি কী ইঙ্গিত করছেন? মা কি তার সন্তানের...

অমাত্যর কথা মাঝপথেই হাত তুলে থামিয়ে দিলেন চাণক্য। কুন্তী দেবী একইভাবে স্থির হয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে এক মুহূর্ত দৃষ্টি দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন আচার্য। বললেন,

- না। মা কখনোই তার ছেলের প্রাণ নিতে পারে না। মমতার টানের কাছে এই বিশ্বের সব শক্তি তুচ্ছ। এই ক্ষেত্রেও তারই প্রমাণ দেব আমি। একজন মা তার ছেলের জন্যে কতদূর যেতে পারে আজ তারই কাহিনি শোনাব আমি। একজন দাসী রাজার প্রেমে পড়ে। তার গর্ভে আসে রাজার সন্তান। এদিকে দৈবাৎ রাজার পাটরানিও প্রায় একই সময়ে সন্তান ধারণ করেন। দুটো শিশুর জন্ম হয় প্রায় একইসঙ্গে। একদিন আগে পরে। কিন্তু রানির মৃত্যু হয় এবং তার ফলে শিশু দুটোর দায়িত্ব বর্তায় দাসীর ওপর। এবং এইখানেই মা, তার সন্তানের সুখের স্বার্থে একটা অভাবনীয় কাজ করেন। তিনি শিশু দুটোর পরিচয়ের অদলবদল করেন। নিজের সন্তানকে তিনি সবার কাছে মাতৃহারা পালিত রাজকুমার বলে পরিচয় করান। এবং রাজকুমারকে নিজের সন্তান হিসেবে। কারণ দাসী চেয়েছিলেন অদূর ভবিষ্যতে যেন তাঁর সন্তানই সিংহাসনে বসে। নিজের গর্ভে ধারণ করা সন্তান, তাঁর নিজের রক্ত, যেন সেই সম্মান পায় যা থেকে তিনি নিজে বঞ্চিত হয়েছেন। এটা এক অর্থে, মৃত রানির প্রতি তাঁর চরম প্রতিশোধও বটে। যে রানি তাঁকে এবং তাঁর পেটের সন্তানকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই সন্তানকে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন তিনি। কিন্তু বিধাতাপুরুষ সেইদিন হেসেছিলেন।

- না! না! না!! এ... এ হতে পারে না। আমি... আমি রাজকুমার! আমার ধমনিতে রাজরক্ত! আমি রাজকুল-শীল, আমি ওই দাসীর পুত্র না। এ হতে পারে না!

থরথর কাঁপছে বলদেব। একইভাবে কাঁপছেন কুন্তী দেবী। একবারের জন্যেও দৃষ্টি তুলছেন না তিনি। নির্মমভাবে চাণক্য বলতে থাকলেন,

- আপনার কুল-গৌরব মিথ্যে, রাজকুমার। আমার দাবির প্রমাণ আমি দেব। কারণ পরিচয় পালটে গেলেও শীল অপরিবর্তিত থাকে। আপনারা উপস্থিত প্রত্যেকেই, প্রতিনিয়ত একটা দৃশ্য দেখে এসেছেন। অতি সাধারণ দৃশ্য, যা আমি নিজেও এখানে আসার পরের দিন সকালেই চাক্ষুষ করি। কুন্তী দেবী দেবতার পুজোর জন্যে ফুল তুলতে যান গাছ থেকে, অন্য কারুর সহায়তা ছাড়া খুঁজে পান না তিনি। তাঁকে একজন দাসী সেদিন ফুলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিল। তারপর তিনি তা গাছ থেকে তুলেছিলেন। এই ব্যাপারটা দেখে আমি সেদিন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। কারণ তখনও কোনো ঘটনা ঘটেইনি। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কুন্তী দেবীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। এরপরে, রাজকুমারের ছবি আঁকার ঘরে গিয়ে জানতে পারি রাজকুমার বলদেব বর্ণান্ধ। আমি তখনও এই ঘটনা দুটোর যোগসূত্র খুঁজে পাইনি। কারণ

ফুল তোলার মতো সামান্য ঘটনা আমার মনে ছিল না। কিন্তু দু-দিন আগেই রাজকুমার বিরাট তার খেলার ছলে অজান্তেই আমায় সেই ঘটনা মনে করায়। সেইদিন বিরাট আমায় একটা নয়, দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছে। 'বিষ'-এর কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় সূত্র পাই যখন সে খেলার ছলে একটা জবা গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ে। সেই জবা গাছ দেখেই আমার সেই দ্বিতীয় দিন দেখা দৃশ্য মনে পড়ে যায়। আমার মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। তবে কি কুন্তী দেবীও বর্ণান্ধ? এবং তিনি কি সেটা গোপন করছেন?

মহারাজা মহিপাল যে বর্ণান্ধ ছিলেন না সেটা তাঁর আঁকা রঙিন ছবিদেখেই নিশ্চিত হওয়া যায়। হতে পারে বড়োরানি বর্ণান্ধ ছিলেন। কিন্তু সেটা অতি কাকতালীয় হয়ে যায়। অতএব আমি একটা পরীক্ষা করি। আমি নিজে একটা চিঠি লিখি তিনটে আলাদা রঙের কালিতে। হাতের লেখা পরীক্ষার অজুহাতে আমি সেটা দেখতে দিই কুন্তী দেবীকে। উনি হাতের লেখা দেখতে পান, অর্থাৎ ওঁর দৃষ্টিশক্তি মোটেই ক্ষীণ নয়। কিন্তু চিঠিটা পরীক্ষা করার সময়ে তিনি একবারও প্রশ্ন করেন না, যে সেটা তিনটে আলাদা রঙে কেন লেখা। অর্থাৎ তিনি রঙের পার্থক্য করতে পারেননি। এতেই আমি নিশ্চিত হলাম যে আমার সন্দেহ অমূলক নয়! এরপর বলদেবের মায়ের পরিচয় অনুমান করা কঠিন কাজ নয়। কী কুন্তী দেবী? আমি কি এখনও অবধি ঠিক বলছি?

দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন কুন্তী দেবী ও বলদেব। তাঁদের ভঙ্গিমা এই মুহূর্তে সত্যিই মা-ছেলে বলেই চিনিয়ে দিচ্ছে যেন। এত বড়ো ঘটনা সবার মনে থিতু হতে সামান্য সময় দিলেন আচার্য। কয়েক মুহূর্ত মৌন থেকে বললেন,

- আপনার ওপর আমার করুণা হয়, কুন্তী দেবী। এত বছরের ত্যাগ, অপমান আর নিজের ছেলের কাছে তিরস্কার সব সহ্য করেও শেষরক্ষা হল না। এত কিছুর পর যেদিন শুনলেন যে মহারাজ আপনার ছেলেকে বঞ্চিত করে তাঁর সিংহাসন রবিনাথকে দিয়ে গেছেন, সেদিন আপনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মহারাজ সত্যি বুঝতে পেরেছিলেন, নাকি সত্যি তিনি রবিনাথকে যোগ্য শাসক হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে এতে আপনার সতিন, মৃত রানি আরও জিতে গেল। আপনি তা সহ্য করতে পারলেন না এবং তখনই আপনি এক ভয়ংকর নির্মম সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনি ঠিক করলেন যে নিজের এত বছরের সাধনা আপনি বিফল হতে দেবেন না। তারজন্য রবিনাথকে তার রাজ্যাভিষেকের আগেই মরতে হবে। আপনি নিজে তাকে হত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন। তাকে হত্যা করায় আপনার ছেলে বলদেবের দুটো লাভ। প্রথমত, তার পথের কাঁটা দূর হবে। দ্বিতীয়ত, তার ওপর থেকে অশরীরীর বেশে রাজহত্যার সন্দেহ সরে যাবে।

রবিনাথ আগেই আপনাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি নিজের ভাইকে সন্দেহ করেন। আপনি সেই সময় নিজেদের পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে তাকে মৌন রাখতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এরপরেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। রবিনাথ যুবরাজ হয়ে নিজের সন্দেহর কথা আমায় জানাল। রাতে যখন সেই কথা আপনাকে বলল সেই মুহূর্তে আপনি বুঝলেন যে আপনার পালিত ছেলে না মরলে আপনার নিজের ছেলেকে রক্ষা করে যাবে না। এরপরেই আমরা যেদিন তার ঘরে গেলাম, সেইদিন সুরার নেশায় সে নিজেই অশরীরীর বর্ণনা আমাদের দিয়ে দিল। আপনি তখনও তাকে বাঁচালেন এবং মাঝপথেই তার কথা থামিয়ে দিলেন। আপনি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে বলদেবই তার বাবার হত্যাকারী। আপনি এও জানতেন, অথবা রবিনাথই নিজের সন্দেহর কথা আপনাকে জানিয়েছিল, যে, বলদেবের ছদ্মবেশ তার ছবি আঁকার ঘরে লুকোনো থাকে। আপনি সেটা সরিয়ে ফেললেন। কিন্তু আপনি যেহেতু তার সম্পূর্ণ সাজের কথা জানতেন না, তাই একটা রুদ্রাক্ষের মালা আপনি ভুলে না নিয়েই চলে এলেন। এর পরের দিন রাতে রবিনাথকে দক্ষিণ মহলে ডেকে পাঠালেন। গোপন জরুরি কথা বলার অজুহাতে তাকে একলা আসতে বললেন। আপনি কাপালিকের ছদ্মবেশে তৈরি ছিলেন।

পরের ঘটনা শুধুই আমি অনুমান করতে পারি। সে আপনাকে সেই বেশে দেখে চমকাল। কী ঘটছে জানতে চাইল। আপনি বললেন তাকে ঘরের উলটো দিকের জানলা দিয়ে উত্তর মহলে দেখতে। তাহলেই সব উত্তর পেয়ে যাবে। আপনার কথামতো সে জানলার ধারে এসে দেখতে গেল। আর তখনই তাকে আপনি পেছন থেকে আঘাত করলেন। ততক্ষণে রাজকুমারের আর্তনাদে উত্তরের সমস্ত দর্শক জেগে উঠেছে। অতএব, সর্বসমক্ষে আরও একবার তার গলায় কৃপাণ চালিয়ে তার দেহ ঠেলে ফেলে দিলেন নদীতে। মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলে দেখা যেত যে গলায় আঘাতের আগেই তার শরীরে অন্য একটা মারণ আঘাত করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই রাতে সবাই দেখল এক অশরীরীকে হত্যা করতে। এতে সেই সময়ে উত্তর মহলে থাকা বলদেবের ওপর কারুর আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। সে এই ছদ্মবেশী কাপালিক হতেই পারে না। কিন্তু মৃদু আলোয় মুখ না দেখা গেলেও একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল উত্তর মহল থেকে। ডান হাত দিয়ে হত্যা করার মুহূর্তে আপনার হাত সামনে উঠে আসে এবং আমি দেখেছিলাম যে ছায়ামূর্তির হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নেই, যেটা বলদেবের বর্ণনা অনুযায়ী তার ডান হাতে থাকত। তাই কিছুটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই বলেছিলাম যে ওই রুদ্রাক্ষের মালাটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এতক্ষণ সবার মনে চলতে থাকা প্রশ্নটা করেই ফেলল জীবসিদ্ধি।

- কিন্তু গুরুদেব, একটা বিষয় আপনি ভুল বলছেন যে। হত্যাকাণ্ড কুন্তী দেবীর ঘরে কীভাবে হয়? আমরা প্রত্যেকে দেখেছি যে আততায়ী তিন নয়, চার তলার কোনো একটা জানলায় ছিল।

- হুম। এই একটা প্রশ্নই ছিল আমার কাছে শেষ অমীমাংসিত রহস্য, যা আজ ভোর বেলা পর্যন্ত আমায় ধন্দে রেখেছিল। এর সমাধান সূত্র আমি পাই মৎস্যজীবীর কথা থেকে। এরজন্যে তোমায় বিশেষ করে ধন্যবাদ হে, জীবসিদ্ধি। আজ সূর্যোদয় না দেখতে গেলে সম্ভবত এখনও আমি অন্ধকারেই রয়ে যেতাম।

- কীভাবে গুরুদেব?

জীবসিদ্ধির প্রশ্নর সোজাসুজি উত্তর দিলেন না চাণক্য। বললেন,

- রোজকার সাধারণ ঘটনা আমরা সবসময়ই সহজে উপেক্ষা করে ফেলি। এখানে উপস্থিত প্রত্যেকে হয় এই দুর্গর বহুদিনের বাসিন্দা অথবা আপনাদের নিয়মিত যাতায়াত। আপনারা প্রতিদিন দিনের তৃতীয় প্রহরে একটি ঘটনা চাক্ষুষ করেন। দুর্গর দুটো মহলের মাঝে বয়ে চলেছে মহানদী। প্রতিদিন একটা বিশেষ সময়ে নদীর জল ভাটার টানে নেমে যায়। আর তখন বেরিয়ে আসে নদীর নীচে থাকা এই দুর্গর আসল প্রথম তলা। এর কারণ বলতে পারেন, অমাত্য?

অমাত্য উত্তর দিলেন,

- হ্যাঁ। আসলে এই দুর্গ তৈরির পরে নদী কেটে মাঝখান দিয়ে জল আনা হয়। কিন্তু নদীর জল আনার পর একটা সমস্যা দেখা দেয়। নদীর জল জোয়ারের সময়ে প্রথম তলাটা প্লাবিত করে ফেলে। তাই এই দুর্গর চারপাশের মাটি ফেলে উঁচু করে, দ্বিতীয় তলাকেই প্রথম তলা বানিয়ে ব্যবহার শুরু হয়।

- হুম। কিন্তু সেই তলা বেশিরভাগ সময়েই ডুবে থাকলেও নদীতে ভাটার সময় সেটা উন্মুক্ত হয়। উন্মুক্ত হয় সেখানে প্রবেশ করার সিঁড়ি। তাই নয় কি?

- হ্যাঁ। তা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে হত্যার কীসের সম্পর্ক? - বড়োই গভীর সম্পর্ক, আর্য। আমি আজ সকালে মৎস্যজীবীদের থেকে জানতে পারি যে ভাটা শুধু দিনেই নয়, রাতেও আসে। কয়েক দণ্ডর* জন্যে। আর তখনই আমার কাছে সেই রাতের ঘটনা পরিষ্কার হয়।

কুন্তী দেবী এই রাতে জলের স্তর নেমে যাওয়ার প্রাকৃতিক ঘটনাটাকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করেন। রাতে দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে যখন জল নেমে লুকোনো তলাটা উন্মুক্ত হয়, তিনি সেইসময়ে নীচে গিয়ে অব্যবহৃত তলায় কয়েকটা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন নিজের ঘরে, তিনতলায়। তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের শেষের দিকে রবিনাথকে আসতে

বলেছিলেন নিজের ঘরে। প্রসঙ্গত এই তৃতীয় তলায় কুন্তী দেবীর আদেশে প্রহরী বা দাস-দাসী ছিল না তা তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছিলেন। কথামতো রবিনাথ আসে এবং নিজের বিমাতার হাতে প্রাণ দেয়। কিন্তু উত্তরের জানলায় দাঁড়ানো প্রতিটা মানুষ যখন রাতের অন্ধকারে, অনতিদূরের দক্ষিণ মহলের দিকে দেখেন, অভ্যাসমতো তাঁরা প্রতিটা তলায় আলো দেখে সেটা কোন তলা তা হিসেব করেন। অন্ধকারে ওপরের তলা থেকে বোঝা অসম্ভব। কারণ একদম ওপরের তলা অব্যবহৃত এবং অন্ধকার। অতএব আমি, আপনি এবং আমরা প্রত্যেকে একদম নীচের প্রজ্বলিত তলা থেকে গুনতে শুরু করি। নীচের অব্যবহৃত তলাতেও আলো থাকায় ওটাকে আমরা প্রথম তলা বলে ভুল করলাম। অতএব তৃতীয় তলা, সেই রাতের অন্ধকারে উত্তর মহলের বাসিন্দাদের কাছে হয়ে গেল চতুর্থ তলা!

দুই মহলের মাঝের সেতু, দু-দিকের তিনতলা জোড়া লাগায়। আমরা দৌড়ে পৌঁছোলাম দক্ষিণের তৃতীয় তলায়। আর সেই অপেক্ষায় ছিলেন কুন্তী দেবী। ততক্ষণে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে সবার সামনে তিনি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করেন। এরপর আমরা যখন কয়েক মুহূর্ত আগেই দেখা একটা বিভ্রমের উদ্দেশে ওপরে ছুটে চললাম, তিনিও সঙ্গে গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই চারতলায় কাউকে পাওয়া গেল না। এদিকে বাকি তলা যখন তল্লাশি হল তখন কুন্তী দেবীর ঘর বাদ দিয়েই দেখা হল। কারুর সন্দেহ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ তা বাইরে থেকে তালা দেয়া ছিল। ভেবে দেখুন অমাত্য, সেই সময়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে, যখন কুন্তী দেবী চারতলায় বসে আমাদের সামনে ছেলে হারানোর শোকে বিলাপ করছেন, সে সময়ে, তাঁরই ঘরে রক্তাক্ত একটা কৃপাণ, ছদ্মবেশ এবং রক্তের দাগ পড়ে আছে। এদিকে সৈনিকরা সেটাই অন্য সর্বত্র খুঁজে চলেছে। এই পুরো ঘটনায় ততক্ষণে তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে গেছে এবং নীচের লুকোনো তলা আবার প্লাবিত হয়ে সেখানে আলো নিভে গেছে বহু আগেই। উত্তর মহলে ফিরে গিয়ে আর অনুধাবন করার কোনো উপায় নেই কোনটা কোন তলা ছিল। কারণ ততক্ষণে আসল চারতলায় আলো জ্বলে উঠেছে এবং নীচের অতিরিক্ত তলাটা আবার নদীর নীচে লুকিয়ে পড়েছে। কী অভাবনীয় পরিকল্পনা! এতগুলো মানুষের চোখের সামনে পুরো অপরাধ ঘটানো হল। অথচ কেউ সেটা দেখেও দেখতে পেল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আচার্য তাকালেন কুন্তী দেবীর দিকে।

- এরপর ভোরের একটু আগে তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে। শোকার্ত হওয়ার ভান করে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে একান্তে কাটালেন সারা সকাল। এই সময়ে উনি ছদ্মবেশ এবং রক্তাক্ত কৃপাণ, জানলা দিয়ে নদীর জলে ছুড়ে ফেলেন অথবা হয়তো পুড়িয়ে ফেলেন নিজের ঘরেই। পরিষ্কার করে ফেলেন

ঘর, যাতে হত্যাকাণ্ডের কোনো চিহ্ন বা রক্তের দাগ না থেকে যায়। অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি আজ বিফল হলেন।

সারা সভাঘর নিশ্চুপ হয়ে আছে। রহস্যের আকস্মিকতা আর অপ্রত্যাশিত সমাধানে সবাই হতবাক। এতক্ষণ দু-হাতে মুখ ঢেকে কুন্তী দেবী শুধু সমস্ত কথা শুনছিলেন। একটা বাক্য বলেননি এতক্ষণ। হঠাৎ এইবার তিনি শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ। কাঁপা অথচ দৃঢ় গলায় বললেন,

- আমি দুটো হত্যার দায় স্বীকার করছি। দুটো হত্যাই আমি একা ঘটিয়েছি। এতে রাজকুমার বলদেবের কোনো দায় নেই।

- তা হয় না, কুন্তী দেবী। আপনারা দু-জনই দুটো আলাদা হত্যার দায়ে দোষী।

শান্ত কণ্ঠে বললেন আচার্য। এইবার কেঁপে উঠল কুন্তী দেবীর স্বর। এই প্রথম দুর্বল শোনাল তাঁকে।

- আমি আপনার কাছে নিজের ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, আচার্য! দয়া করুন! এটা এক মায়ের শেষ আর্তি।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে আচার্য চাণক্য ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন,

- বেশ। কথা দিলাম রাজকুমার বলদেবের প্রাণদণ্ড হবে না। তাকে আজীবন কারাবাসে দণ্ডিত করা হবে। কিন্তু এর বেশি কিছু আমার কাছে চাইবেন না। এর বেশি কিছু করতে আমি অপারগ। শুধু গর্ভে ধারণ করলেই মা হওয়া যায় না। রবিনাথের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনি সমগ্র স্ত্রীজাতি ও মায়েদের কলঙ্কিত করেছেন। এর ক্ষমা নেই।

- আমি এই অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করছি না, আচার্য। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আচার্য।

দু-জন সৈনিক এগিয়ে এসে কুন্তী দেবীকে নিয়ে চলল সভাঘরের বাইরে। তিনি বাধা দিলেন না বা প্রতিবাদ করলেন না। সম্ভবত তিনি এই ভবিতব্যের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। দরজা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার শুধু জলে-ভেজা চোখে তিনি ফিরে চাইলেন রাজকুমার বলদেবের দিকে। বলদেবও তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। এই প্রথমবার বলদেবের কাঁপা ঠোঁটে একটা শব্দ উচ্চারিত হল। যে শব্দটা তার মুখে শোনার জন্যে কুন্তী দেবীকে একুশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

- মা!

১ দণ্ড = ২৪ মিনিট।

উপসংহার:

আচার্য চাণক্যর ঘরে বসে আছেন বৃদ্ধ অমাত্য এবং জীবসিদ্ধি। বৃদ্ধ বললেন,

- তোসালি-র এইবার কী হবে, আচার্য? রাজসিংহাসন তো খালি রাখা যায় না।

- হুম। খালি কেন থাকবে? কালকেই তো রবিনাথের অভিষেকের তিথি। সেই শুভ তিথিতেই রাজকুমার বিরাটের অভিষেক হোক।

- বিরাট? কিন্তু...

- সে সিংহাসনে বসুক। আর রাজ্যপাট তার মা কৌশল্যা দেবী সামলাবেন। আমি যতদূর তাঁকে চিনেছি এই কয়েক দিনে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং মেধাবী। যোগ্য শাসক হবেন তিনি। আপনার মতো যোগ্য প্রধান অমাত্য পাশে থাকলে এই রাজ্যের কুশল হবে তাতে আমি নিশ্চিত।

- আপনি যা বলবেন, আচার্য। আমার মনেও কৌশল্যা দেবীর কথা এসেছিল। কিন্তু বাকি অমাত্যরা কি বিরাটকে রাজা হিসেবে মেনে নেবে? এক স্ত্রীলোকের নির্দেশ কি তারা মানবে?

মৃদু হেসে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- মগধের পূর্ণ সমর্থন থাকলে তারা মানতে বাধ্য। আমার উপস্থিতিতেই কালকে বিরাটের রাজ্যাভিষেক হোক।

- বেশ। তাই হোক।

- হুম। আমরাও তার পরের দিন রওনা হয়ে যাব। ওহে জীবসিদ্ধি, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে আগেই একটা চিঠি লিখে পাঠাও। দু-দিন পরে আমাদের রওনা হওয়ার খবর দাও। তাকে জানাতে ভুলো না যে এদিকে সব ভালোভাবে মিটেছে।

হত্যা-শাস্ত্র

উপক্রম:

কুয়াশার চাদরে ঢাকা মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র। কালো আকাশে ফুটে থাকা তারার অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে, সময় রাত দ্বিতীয় প্রহর। স্থান নগরের মধ্যে অবস্থিত একটি পতিতাপল্লি। আলো-আঁধারিতে ঢাকা সড়কে দাঁড়িয়ে আছে কিছু নারী। অপেক্ষায়, কখন কোনো পুরুষ তাদের একটা রাত কিনে নেবে অর্থর বিনিময়ে। দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসছে। অভাবী এই রমণীরা আশায় বুক বাঁধে। খিদে আর অভাবের সামনে লজ্জা, সম্মান এই কথাগুলো বড়ো ঠুনকো। মুখ ঢাকা এক ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসে কুয়াশা সরিয়ে। মেয়েদের কাছে এসে গতি ধীর করে সে। একে একে সব মেয়েদের সামনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জরিপ করে। পছন্দমতো একজনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে। সেই মেয়েটা মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে আসে। নিজের কাপড়ের ফাঁক থেকে একটা রৌপ্য মুদ্রা মেয়েটার সামনে ধরে। কিন্তু সেটা দেয় না। আবার সেটা নিজের কাপড়ের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখে। এটা একধরনের আশ্বাসন, যে, তাকে ন্যায্য মূল্য দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। মেয়েটাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে লোকটা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। ঘন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায় ঘোড়া আর তার দুই সওয়ার।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা নির্জন জায়গায় এসে ঘোড়া থামাল ঘোড়সওয়ার। পথে মেয়েটার সঙ্গে একবারও কথা বলেনি পুরুষটা। একটু অবাক হয় মেয়েটা। এক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে মেয়েটাকে নামতে ইশারা করে পুরুষটা। মেয়েটা নামলে লোকটাও নেমে আসে ঘোড়া থেকে। একটা গলিপথে এগিয়ে গেল লোকটা এবং মেয়েটাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করল। মেয়েটা তার পিছু নিল। লোকটা এখনও মুখ ঢেকে রেখেছে। বোধ হয় সম্মানিত কুলের কেউ।



লোকটা বেশ খানিকটা অন্ধকারে ঢুকে গেল। মেয়েটা কাছে আসতেই লোকটা তাকে একটা দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল। এক ধরনের বর্বরতা ছিল লোকটার আচরণে। মেয়েটা তার ভাগ্যকে দোষ দিল এবং দাঁতে দাঁত চেপে

পরবর্তী ঘটনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হল। এক্ষুনি তার শরীর ছিঁড়ে খাবে এই পশুটা। চোখ বন্ধ করে প্রমাদ গণল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল যে কিছু একটা ভুল হচ্ছে। কারণ লোকটার একটা হাত তার মুখ চেপে ধরেছে। চোখ খুলতেই মেয়েটা দেখতে পেল লোকটার হাতে কিছু একটা চকচক করছে। একী!!! এটা তো একটা বড়ো ছুরি!!

তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করল মেয়েটাকে। পুরুষটার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ফল হল না। বাহুবলে সে একজন শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? ছটফট করতেই লোকটা একটা হাঁটু দিয়ে আঘাত করল মেয়েটার পেটে। অস্ফুট যন্ত্রণার কাতরানি বেরোয় শুধু তার চেপে ধরে থাকা মুখ থেকে। মেয়েটা শেষ মুহূর্তে তার আততায়ীর মুখ দেখতে পেল। তার চোখের তীব্র আক্রোশ যেন ঝলসে দিতে চায় মেয়েটার শরীর। অনুভব করল তার পেটের ভেতর ঠান্ডা লোহার ফলা ঢুকে যাচ্ছে। তীব্র একটা যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে।

১.

'ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।
নমঃ সূর্য্যায় নম।'

সূর্যপ্রণাম সেরে সবে নিজের কুটিরের দিকে এগিয়েছেন আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত। পরনে সাদা-গেরুয়া কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে ত্রিবলি টিকা, ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি এবং বুকের পইতে তাঁর ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়। আর পাঁচজন ব্রাহ্মণের থেকে তাঁকে আলাদা করে তাঁর চোখ। চোখের তারায় তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি বিদ্যুৎ খেলে যায়। অন্তরভেদী সেই দৃষ্টি থেকে যেন জগতের কোনো রহস্যই গোপন থাকতে পারে না। অতি সাধারণ দর্শন এই ব্রাহ্মণকে সামনে দেখলে কেউ অনুমানও করতে পারবে না যে এই ব্যক্তি স্বয়ং বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। অনেকের মতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্বয়ং সম্রাটের চেয়েও বেশি। দেখলেন একটু দূরে দু-জন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সামরিক সাজে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে অসুবিধা হল না। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি মগধ সেনাপতি কিথক। দ্বিতীয় ব্যক্তি যুবক এবং অপরিচিত।

- কী ব্যাপার সেনাপতি কিথক? এত ভোরে ঘুম ছেড়ে আমার দরজায় কেন?

ভক্তি ভরে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন সেনাপতি এবং তাঁর সঙ্গী। সেনাপতি কিথক উত্তর দিলেন,

- আচার্য, এই ভোরে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার পূজা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করছি। আপনি আপনার কাজ সেরে নিন।

- আমার সকালের পূজা শেষ হয়েছে, আর্য। আমার কুটিরে আসুন। আর আপনার সঙ্গীকে তো চিনলাম না।

- ধন্যবাদ, আচার্য। এ হল সুসেন। রক্ষীবাহিনীর নতুন আধিকারিক।

- হুম। বেশ, বেশ। তা এত সকালে আপনাদের আমার কাছে আসার কারণ?

- আচার্য, আপনি নিশ্চয়ই নগরের বুকে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা শুনেছেন?? আপনার না জানার কথা নয়। কারণ এই পাটলিপুত্রের প্রতিটি মানুষ জানে যে মগধে একটা পায়রাও মহামান্য চাণক্যর অজ্ঞাতে ডানা ঝাপটায় না।

সেনাপতি এবং তাঁর সঙ্গীকে নিজের কুটিরের উঠোনে আসন গ্রহণ করতে বলে চাণক্য নিজেও মুখোমুখি একটা আসনে বসলেন।

- ওহে বীর কিথক, আপনি আমার ক্ষমতার একটু বেশিই অনুমান করে ফেলছেন। আমি এখন রাজকার্য থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে আমার জীবনের সকল অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লিখিত রূপে 'অর্থ-শাস্ত্র'-তে একত্রিত করার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছি। সম্রাট, রাজ্য সব আসে যায়, শুধু জ্ঞান চিরস্থায়ী হয়।

খানিক চুপ থেকে আবার চাণক্য বললেন,

- তবে, আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, হ্যাঁ, আমি রূপজীবী রমণীদের হত্যার ঘটনা শুনেছি। ইতিমধ্যে দু-জন রমণীকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করেছে এক অজানা আততায়ী। সে-সংবাদ আমার কানে এসেছে।

এইবার সুসেন নামের যুবকটি বলল:

- আচার্য, কাল রাতে আরও একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

- সেকী! আবার? এত পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও??

কিথক উত্তর দিল,

- সেটাই আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য। সেই কারণেই আপনার কাছে আসা। এইবারের ঘটনা ঘটেছে নগরের উত্তরে।

- হুম। আমি যদিও আগের দুটো ঘটনার কথা শুনেছি। তবু আপনার থেকে আরও একবার শুনতে চাই আগের দুটো হত্যার বিষয়ে আপনার তদন্তে কী কী তথ্য উঠে এসেছে।

- সুসেন বলুক। আমি এবং সুসেন, দু-জনেই এর তদন্তভার নিয়েছি। সুসেন গুছিয়ে বলুক প্রথম থেকে।

একটু গুছিয়ে নিয়ে সুসেন শুরু করে,

- প্রথম ঘটনাটা দু-মাস আগে ঘটে। সকালে জনৈক নাগরিক একজন

নারীর রক্তাক্ত মৃতদেহ একটা কানাগলিতে পড়ে থাকতে দেখে। সে প্রহরীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে আমি নিজেও গিয়েছিলাম। তলপেটে ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বোঝা যায়। কিন্তু ভয়ংকর হল নৃশংসতা। প্রথমে সেই দৃশ্য দেখে ভেবেছিলাম হয়তো কোনো শেয়ালের কাজ। পেটের ভেতরের অন্ত্রাদি বাইরে শরীরের পাশে ছড়িয়ে ছিল। আমি মৃতদেহ শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করলাম। এবং সেই থেকেই জানতে পারি যে মৃতা রমণী একজন গণিকা। তার সঙ্গী অন্যান্য গণিকাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি যে আগের দিন রাতে একজন মুখ ঢাকা ব্যক্তি এই গণিকাকে নিজের ঘোড়ায় করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অজানা ব্যক্তির মুখ তারা দেখেনি। এই অবধি ঘটনাটা আমার কাছে সাধারণ হত্যাই মনে হয়েছিল। কিন্তু বৈদ্য দেহ পরীক্ষা করে যখন জানালেন যে মৃত মেয়েটির শরীরে জরায়ু নেই,হত্যাকারী হত্যার পরে তার শরীর থেকে জরায়ু ছিন্ন করেছে এবং সেটার আর খোঁজ মেলেনি, বিষয়টা খুব অদ্ভুত লেগেছিল আমার। সেনাপতিকে তখনই আমি ঘটনাটা জানাই। কিন্তু আমি ভাবিনি যে পরের মাসে, আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। দ্বিতীয়বারের মৃতা স্ত্রীলোকটিও একজন গণিকা। যদিও অন্য গণিকালয়ের। কিন্তু একই হত্যা পদ্ধতি আর এবারও জরায়ু নেই শরীরে। পাহারা বাড়ানো হয়েছে যতটা সম্ভব। সৈনিকরা রাতে টহল দিচ্ছে পথে পথে। তারপরেও আজ, খানিক আগেই দু-জন টহলদার প্রহরী আরও একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- হুমম। সম্রাট জানেন এই বিষয়ে?

- কাল রাতের ঘটনা তিনি জানেন না এখনও। কিন্তু তাঁকে বলেই-বা কী লাভ?? আপনি তো সবই বোঝেন, আচার্য। বেশ্যাদের জীবনের দাম কেউ দেয় না। সম্রাট বা ওঁর মন্ত্রীরা এই হত্যাগুলো নিয়ে সভার কোনো সময় ব্যয় করতেই রাজি নয়। সম্রাট নিজে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করলেও, মন্ত্রীরা এইসব উড়িয়ে দেয়। আমি বহুবার দরবার করেও ফিরে এসেছি।

- হুমম। আচ্ছা, এবারও কি একইভাবে...?

- হ্যাঁ, আচার্য। পেটে ছুরি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই মৃতদেহতেও জরায়ু নেই। খুবই বীভৎস!

- হুমম। আগের দুটো মৃতদেহ আমি দেখেছি। চলুন, আর্য। আমিও যাই। দেখে আসি মৃতদেহ।

উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। তাঁর দেখাদেখি অন্য দু-জনও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিথক বললেন,

- আপনি স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখতে চাইবেন অনুমান করেই আমি সঙ্গে আপনার জন্যে একটা ঘোড়া এনেছি।

- আপনি বিচক্ষণ সেনাপতি। ধন্যবাদ। একটু অপেক্ষা করুন।

চাণক্য কুটিরে ঢুকলেন এবং খানিক বাদেই কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

- চলুন। যাওয়া যাক।

২.

গলিপথের মুখে সাধারণ নাগরিকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীরা তাদের মূল ঘটনাস্থল থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করছে। তিনটে ঘোড়া এসে সেখানে থামল। তাদের দেখেই দু-জন সৈনিক ভিড় সরিয়ে জায়গা করে দিতে এগিয়ে গেল। সেনাপতি কিথক, সুসেন এবং চাণক্য ঘোড়া থেকে নামলেন। তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য লোকে জায়গা করে দিল। সৈনিকদের সঙ্গে তাঁরা দু-জন গলির দিকে এগিয়ে গেলেন।

অন্ধগলির শেষ মাথায় এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। চারিদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আড়াআড়িভাবে মেয়েটার পেট চেরা হয়েছে ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে। শরীরের অভ্যন্তরীণ কিছু অংশ বাইরে বেরিয়ে আছে। বোঝা যায় কেউ ক্ষতর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুঁজেছে। ভেতরের অন্ত্রবাইরে বেরিয়ে আছে। খুব নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটার দেহে সস্তা গয়না আর রঙিন পোশাক। উগ্র সাজ চোখে পড়ে মেয়েটার মুখে ও শরীরে। অনুমান করা যায় এই মেয়েটাও একজন রূপোপজীবিনী।

চাণক্য মৃতদেহর সামনে ঝুঁকে পড়লেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতদেহ। একবার মৃতদেহর একটা হাত নাড়িয়ে দেখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে চাণক্য বললেন,

- মৃতার মুখের ওপর চাপ দেয়ার দাগ স্পষ্ট। আততায়ী তার মুখ চেপে ধরেছিল, যাতে চিৎকার না করতে পারে।

একবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে আবার বললেন,

- এইখানে কারুর কিছু শুনতে বা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। হত্যা করার উপযুক্ত জায়গাই বটে। মৃতদেহ যতটা শক্ত হয়েছে আর রক্তপাতের পরিমাণ থেকে অনুমান করতে পারি রাত দ্বিতীয় প্রহর নাগাদ হত্যা করা হয়েছে। সাজপোশাক থেকে অনুমান করা যায়, আগের দুই অভাগিনীর মতোই এই মেয়েটিও গণিকা। কিন্তু সবকটা হত্যাকাণ্ডেই একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিথক প্রশ্ন করলেন,

- কী বিষয়, আচার্য?

- মৃতার শরীরে একনজরে কোনো বলপূর্বক আঘাতের চিহ্ন নেই এবং শরীরে পোশাক প্রায় নিখুঁত আছে। অর্থাৎ, অনুমান করা যায় এই রমণীনিটিকেও ধর্ষণ করা হয়নি। আগের দুটো ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। বৈদ্য নিশ্চিতভাবেই জানিয়েছে যে মৃত্যুর আগে, মৃতাদের সঙ্গে কোনোরকম শারীরিক সঙ্গম করা হয়নি। তাই নয় কি?

- হ্যাঁ। আগের হত্যাগুলোর ক্ষেত্রেও এই জিনিস লক্ষ করেছি আমি। এক্ষেত্রেও তাই মনে হচ্ছে।

- এইটা কিন্তু সত্যিই একটা জরুরি বিষয়।

- কেন আচার্য?

প্রশ্নটা সুসেন করল। চাণক্য মৃতদেহর থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিলেন,

- এটা থেকে হত্যাকারীর মনস্তত্ত্বর একটা দিক উঠে আসে। এর অর্থ, হত্যাকারী শুধুমাত্র হত্যা করতেই এই মেয়েদের নিয়ে আসে। সাধারণ অপরাধীর মনস্তত্ত্ব কিন্তু তা হয় না। সাধারণত এরকম অপরাধের ক্ষেত্রে এটাই লক্ষ করা যায় যে, কোনো নারীকে হত্যার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়ে থাকে। এখানে আমরা তার ব্যতিক্রম দেখেছি।

- এর কারণ কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়, আচার্য?

একটু চিন্তিতভাবে চাণক্য বললেন,

- হত্যাকারী পুরুষটি কোনো মানসিক কারণে এটা করে না। কী সে কারণ তা আমার জানা নেই। হয়তো সে অক্ষম। অথবা...

- অথবা?

- অথবা সে একজন নারী।

চমকে ওঠেন সুসেন ও কিথক। কিথক অবিশ্বাসের সুরে বলেন,

- এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড একজন নারীর পক্ষে ঘটানো সম্ভব, আচার্য? আমার কিন্তু মনে হয় না।

- নারীদের পক্ষে কী কী সম্ভব তা স্বয়ং বিষ্ণুও অনুমান করতে পারে না, আর্য। তদন্তর ক্ষেত্রে সব ধরনের সম্ভাবনার কথা ভেবে এগোনোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে এটাও সত্যি যে নারীদের অস্ত্র হল 'বিষ'। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নারীরা রক্তাক্ত পদ্ধতি সাধারণত বেছে নেয় না।

- এর থেকে আপনি কি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, আচার্য?

- না। কিছুই না। তবে সবচেয়ে কাছের গণিকাপল্লিতে খবর দিন। সম্ভবত মেয়েটা সেখানকারই বাসিন্দা। তাদের মধ্যে কেউ এসে শনাক্ত করতে পারবে আশা রাখি।

কিথক বললেন,

- আগেই খবর পাঠানো হয়েছে, আচার্য। আমিও অনুমান করেছিলাম যে

সম্ভবত কাছের গণিকালয়েরই গণিকা। তাই সৈনিক পাঠিয়েছি, সেখান থেকে কয়েকজনকে এখানে নিয়ে আসবে।

- হুম। বেশ।

- কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যান, আচার্য। সৈনিকরা চলেই আসবে এখুনি।

বাক্য শেষ করতে-না-করতেই কিথকের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। দু-জন সৈনিকের ভিড় সরিয়ে তিন জন নারী এগিয়ে আসার পথ করছে দেখা গেল। তিন জন দ্রুত এগিয়ে আসছিল, কিন্তু মৃতদেহর দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। তাদের মধ্যে একজন আতঙ্কে চোখ ঢাকল আর দ্বিতীজন সেই রক্তাক্ত, বীভৎস দৃশ্য সইতে না পেরে বমি করতে শুরু করল। তৃতীয়জন শুধু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল মৃতদেহর দিকে। তাদের কিছুক্ষণ সামলে নেয়ার সময় দিয়ে, সুসেন এগিয়ে গেল তাদের দিকে। মৃতদেহ থেকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল,

- মৃতা কি তোমাদের পরিচিত?

তৃতীয় মেয়েটি উত্তর দিল,

- হ্যাঁ।

- নাম?

- কৃতিকা।

- কাল শেষ কখন দেখেছিলে তাকে? মনে আছে?

- আমিই শেষ দেখেছিলাম। কাল রাতে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে। একজন ঘোড়সওয়ার আসে আর ওকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

- ঘোড়সওয়ার? তাকে দেখেছ?

- না, মহাশয়। তার মুখ ঢাকা ছিল। গায়েও কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।

- ঘোড়ার রং কী ছিল? দেখেছিলে নিশ্চয়ই?

এইবারের প্রশ্নটা চাণক্য করলেন। উত্তর এল,

- হ্যাঁ, ব্রাহ্মণদেব। কালো ঘোড়া ছিল।

- অশ্বারোহীর উচ্চতা বা দেহের গঠন কিছু দেখেছিলে?

- বলিষ্ঠ চেহারা। ঘোড়া থেকে সে নামেনি। তাই উচ্চতা ঠিক বলতে পারি না। গভীর কুয়াশার কারণে কোনো কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কাল রাতে।

- হুমম।

সুসেন এবং কিথক আরও কিছু প্রশ্ন করল তিন জনকেই। তবে বিশেষ কোনো নতুন তথ্য পাওয়া গেল না। তাদের বিদায় দিয়ে চাণক্যর দিকে ফিরলেন কিথক।

- আচার্য, আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?

খানিক ভেবে চাণক্য বললেন,

- তিনটে হত্যা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তিন ক্ষেত্রেই মৃতা একজন নারী এবং গণিকা। একইভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রেও সম্ভবত জরায়ু কেটে বের করে নেয়া হয়েছে। এর বিহিত হওয়া দরকার। পাহারা ব্যবস্থা দ্বিগুণ করুন। আপনি নিজে এই বিষয়টা দেখুন, সেনাপতি কিথক।

- যথা আজ্ঞা, আচার্য। আপনার কী অভিমত? এই তিনটে হত্যা একই ব্যক্তি করেছে?

- তাই তো অনুমান, সেনাপতি।

- আমারও তাই মনে হয়। সম্ভবত কোনো উন্মাদ হত্যাকারী।

- হুম। অথবা কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে চলা ব্যক্তি। সবই সম্ভব। এই তিন মৃতা গণিকার বিষয়ে সমস্ত খবর আমার চাই। আমি এই বিষয়টা দেখছি। ইতিমধ্যে আপনি এই মেয়েটার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করুন।

কিছুক্ষণ থেমে মৃতদেহর প্রতি করজোড়ে প্রার্থনা করলেন চাণক্য। বললেন,

- জীবদ্দশায় মানুষ যেভাবেই জীবন নির্বাহ করে থাকুক না কেন, মৃত্যুতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়। তাই সেনাপতি, আপনি খেয়াল রাখবেন যেন মৃতর প্রতি কোনোরকম অসম্মান দেখানো না হয়।

৩.

নিজের কুটিরে বসে লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিলেন চাণক্য। এমন সময় কুটিরের বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলেন। আর তারপরেই অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক ভেসে এল,

- আচার্য।

- এসো হে, জীবসিদ্ধি।

শিষ্যর গলা শুনে তিনি মনে মনে প্রসন্ন হলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন আজ জীবসিদ্ধি নির্ধারিত সময়ের আগেই আসবে। জীবসিদ্ধিকে তিনি সেই সময় থেকে চেনেন, যখন তিনি তক্ষশিলার আচার্য ছিলেন। ওঁর প্রিয় ছয় ছাত্রর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি অন্যতম। চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়ে চাণক্য কিছুকাল নিজে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। এরপর সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী ও অমাত্যদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নেন। রাজমহল ছেড়ে অদূরেই এক নিরিবিলি জায়গায় কুটির বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। বাকি শিষ্যরা বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা আলাদা দায়িত্বে বহাল হলেও, জীবসিদ্ধি চাণক্যর থেকে দূরে যেতে রাজি হল না। অবসর জীবনে এই শিষ্যই তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়েছে। তাতে সম্ভবত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তরও কিছুটা ইন্ধন ছিল। তাঁরা কেউই চাননি তাঁদের

গুরু একলা নীরবে জীবনযাপন করুন। জীবসিদ্ধি রোজই একবার অন্তত আসে কারণে-অকারণে। গুরুদেবের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসার দায়িত্ব সে-ই পালন করে স্ব-ইচ্ছায়।

ভেতরে ঢুকতেই চাণক্য বললেন,

- জানতাম আজ তুমি আসবেই। সন্ধ্যার আগেই আসবে। ধারণা করতে পারি যে সেনাপতি কিথক যে আমার কাছে সকালে এসেছিল সে-সংবাদ তোমার কানে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে? পুরোনো প্রবৃত্তি এখনও ছাড়তে পারলে না দেখছি।

চাণক্যর কৌতুকের ইঙ্গিত জীবসিদ্ধির অতীতের জীবন। নন্দ সাম্রাজ্যকালে জীবসিদ্ধি ছিল এই পাটলিপুত্রে চাণক্যর গুপ্তচর। শত্রুশিবিরের হৃদয় থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে গুরুর কাছে পাচার করত সে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর সে রাখত সেই থেকেই। তাই গুরুর মৃদু কৌতুকের উত্তরে জীবসিদ্ধি হেসে উত্তর দিল,

- সেনাপতি কিথকের সঙ্গে একটু আগেই আমার দেখা হয়েছে। তিনিই বলেছেন।

- হুমম।

আসন গ্রহণ করল জীবসিদ্ধি। কাঁধ থেকে কাপড়ের ঝোলা নামিয়ে সেটা থেকে নতুন দোয়াতের কালি বের করে চাণক্যর চারপায়ার ওপর নামিয়ে রাখল। প্রসন্ন মনে চাণক্য বললেন,

- বেশ, বেশ। ভুলে যাওনি তবে। আজ এটা না পেলে কাল সকালে আর লেখা হত না।

জীবসিদ্ধি ঝোলা থেকে তালপাতায় মোড়া একটা বড়ো জিনিস বের করল। সেটা খুলে এগিয়ে দিল চাণক্যর দিকে। গুড়। মিষ্টি খাবারদাবারের প্রতি তার গুরুদেবের আকর্ষণের কথা তার অজানা নয়।

দ্বিগুণ প্রসন্ন হয়ে এক টুকরো গুড় তুলে নিজের মুখে ফেলে, চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে দেখা হল?

চমকে উঠে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।

- কী খবর ওদিকে?

- সম্রাট ব্যস্ত ছিলেন। বেশি কথা হয়নি। কোনো এক গুপ্তচর, রাজ্যের গোপন তথ্য নাকি শত্রুদের পাঠাচ্ছে। তাকে ধরার নাকি কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। তাই নিয়েই মন্ত্রী-অমাত্যরা সম্রাটের সঙ্গে গভীর আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন।

- হুমম।

- আপনি বলুন। এই পর পর হত্যাকাণ্ডর বিষয়ে কী ভাবলেন?

- সবে তো ভাবনা শুরু করলাম হে। বরং এই বিষয়ে তোমার ধারণাগুলো একটু শুনি।

- আমি নিশ্চিত এগুলো একই লোকের কাজ। পাটলিপুত্রর রাতের রাস্তায় কোনো এক অজানা উন্মাদ হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা ভাবলেই অস্বস্তি হয়, আচার্য।

- হুমম। কাল রাতে আরও এক গণিকাকে হত্যা করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই শুনেছ?

- সারা পাটলিপুত্র জানে। তবে সাধারণ গণিকাদের হত্যা করা হচ্ছে বলে কেউই বিশেষ ভাবিত নয়।

- সেটাই সমস্যা। হত্যার পদ্ধতিটা এতটা নৃশংস না হলে সম্ভবত কেউ জানতেই পারত না। সৈনিকরাও মাথা ঘামাত না। কিন্তু হত্যা করে, পেট কেটে কারুর জরায়ু বের করে নেয়া হয়েছে বলে এটা চিন্তার বিষয়।

- ওহো। বলতে ভুলে গেছি। সেনাপতি কিথক জানালেন যে গতকালের হত্যার ক্ষেত্রেও একইভাবে জরায়ু বের করে নেয়া হয়েছে। মৃতদেহ পরীক্ষা করে বৈদ্য সেটা নিশ্চিত করেছে।

- হুমম।

- আচার্য? এরপর কি আরও হত্যা হবে? আপনার কী মনে হয়?

- হত্যাকারী ধরা না পড়া অবধি সে থামবে না, জীবসিদ্ধি। তাকে আটকাতেই হবে। হতে পারে হত্যাগুলো যতটা যথেচ্ছ ও লক্ষ্যহীন মনে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে, হয়তো বাস্তবে তা নয়। এই মৃতা তিন জনের মধ্যে কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র থাকতে পারে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

চুপ করে খানিক ভাবলেন চাণক্য। বললেন,

- এই তিন জন মৃতা গণিকাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আমায় এনে দাও, জীবসিদ্ধি। সেনাপতি কিথক বা নবীন ন্যায়রক্ষী অধ্যক্ষ সুসেনের সাহায্যে তা জোগাড় করো।

- কী ধরনের তথ্য আপনি চাইছেন, আচার্য?

- কোন কোন গণিকালয়ে তাদের আসা-যাওয়া ছিল। গত তিন মাসে তাদের গতিবিধি এবং সবচেয়ে জরুরি তথ্য, তাদের সাম্প্রতিক পুরুষ সঙ্গীদের নাম। এদের মধ্যে কোনো একজন বিশেষ পুরুষের নাম যদি থাকে, তবে সেটাই হবে এই রহস্যর প্রথম সূত্র।

- বেশ, আচার্য। আমি এই তথ্য এনে দেব আপনাকে। আমায় কয়েক দিন সময় দিন।

আর একটা গুড়ের টুকরো মুখে দিয়ে চাণক্য বললেন,

- হুমম।

৪.

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর রাজসভা। সিংহাসনে আসীন স্বয়ং সম্রাট। অমাত্য পরিষদের সঙ্গে ওঁর বিশেষ জরুরি বৈঠক চলছে। তখনই একজন প্রহরী ঢুকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল সম্রাটকে। চন্দ্রগুপ্তর নির্দেশ ছিল যেন জরুরি বৈঠকের মাঝে কেউ তাঁদের বিরক্ত না করে। তারপরেও এই প্রহরী প্রবেশ করায় সম্রাট খানিক অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর অসন্তোষ টের পেয়েই, সম্রাটের ক্ষোভ থেকে রক্ষা পেতে সৈনিক দ্রুত বলল,

- ক্ষমা করবেন, সম্রাট। আচার্য চাণক্য আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাই আসতেই হল। আমি দুঃখিত।

- আহ! তা ওঁকে বাইরে কেন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ? বলেছি না, আচার্য যখনই আসবেন তখনই যেন তাঁকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়? আমার আদেশের অপেক্ষা করবে না।

- ক্ষমা করবেন, সম্রাট।

প্রহরী সভা ত্যাগ করার কয়েক মুহূর্ত পরেই সব আওয়াজ ছাপিয়ে বাইরে থেকে খড়মের আওয়াজ শোনা গেল। সভায় প্রবেশ করলেন চাণক্য। তাঁর পেছনে একটু দূরত্বে জীবসিদ্ধি। আচার্যকে দেখেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং অন্যান্য সভাসদরা নিজের নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাণক্য এগিয়ে এসে সভাঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে অভিবাদন জানালেন এবং তারপর চন্দ্রগুপ্তর দিকে চেয়ে বললেন,

- সম্রাট। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সম্রাট হাত তুলে নির্দেশ দিলেন- 'একান্ত!'

সম্রাটের নির্দেশ পেতেই সভা ছেড়ে অমাত্যরা একে একে বেরিয়ে গেল। চাণক্য অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ না সভাকক্ষে তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রইল। চন্দ্রগুপ্ত, জীবসিদ্ধি এবং তিনি স্বয়ং। দরবার খালি হতে চন্দ্রগুপ্ত নিজের সিংহাসন বেদি ছেড়ে নেমে এলেন। প্রথমেই নিজের গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। চাণক্য আশীর্বাদী মুদ্রায় বললেন,

- উৎকৃষ্ট ভারতম্। সদা সুমতি ভবঃ।

গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্রগুপ্ত জীবসিদ্ধিকে আলিঙ্গন করল। জনসমক্ষে তারা রাজা এবং সাধারণ প্রজা হলেও, একান্তে তারা আজও গুরুভ্রাতা। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা দু-জনেই চাণক্যর আশ্রমের সহপাঠী ছিল একসময়। তারা পরম সুহৃদ এবং আজও চাণক্যর দেয়া বিশেষ বালা বাহুতে ধারণ করে আছে। এই বালা তাদের গুরুভ্রাতা হওয়ার চিহ্ন যা শুধুমাত্র চাণক্যর বিশেষ ছাত্রদের কাছে আছে। এটা তাদের গৌরবের চিহ্ন।

চন্দ্রগুপ্ত নিজের গুরুর দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন,

- গুরুদেব আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা করার সুযোগ হয়নি বলে আমি জানি আপনি মনঃক্ষুণ্ণ। কিন্তু গত এক মাস ধরে, রাজ্যপাটের এমন একটা সমস্যা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে আছি যে...

কথার মাঝেই বাধা দিয়ে চাণক্য বললেন,

- আমি মোটেই ক্ষুণ্ণ নই, চন্দ্রগুপ্ত। ধন্য সেই রাজ্য আর তার প্রজা, যাদের রাজা ব্যক্তিগত কাজ এবং বিশ্রামকে উপেক্ষা করে দেশের কাজকে প্রাধান্য দেয়। রাজ্যপাটই তোমার প্রথম এবং প্রধান ধর্ম, সম্রাট।

- ধন্যবাদ, আচার্য। তবে আপনি কোন বিষয় নিয়ে ক্ষুণ্ণ তা অনুমান করতে পারি। আমি জানি আজকে আপনার এখানে আসার কারণ কী। আপনি রাজধানীতে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়ে চিন্তিত।

- হুম। ঠিক অনুমান করেছ। আমি জানতে চাই যে তুমি এই বিষয়ে কী ভেবেছ? কেন সভায় এই নিয়ে কোনোরকম আলোচনা গত কয়েক মাস ধরে হয়নি?

- আচার্য, বিশ্বাস করুন, আমি নিজেও যথেষ্ট ভাবিত এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু গত কয়েক মাস একটা গভীর সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমার অমাত্যরাও সেদিকেই পুরো মনোযোগ দিয়েছে। আগের দিন ভাই জীবসিদ্ধিকে তো জানিয়েছিলাম। আপনাকে নিশ্চয় সেই কথা ভাই জানিয়েছে।

- হুমম। গুপ্তচরের বিষয়টা আমি জানি।

- হ্যাঁ, আচার্য। আমাদের সামরিক কিছু গূঢ় তথ্য শত্রু দেশের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু তা কীভাবে অথবা কার দ্বারা পাচার হচ্ছে তা আমরা এখনও নিশ্চিত নই। কিন্তু সন্দেহ করা যায় যে আমাদের উচ্চ পদের কোনো মন্ত্রী বা আধিকারিক গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত।

- হুমম। সমস্যা গম্ভীর। কিন্তু সম্রাট, তুমি কি সব প্রজার রাজা নও?? একজন আদর্শ সম্রাট অনেকটা তার প্রজাদের বাবার মতো। বাবা কখনো নিজের সন্তানদের মধ্যে প্রভেদ করে না, চন্দ্রগুপ্ত। গণিকাপল্লির সেই রমণীরাও কিন্তু তোমারই প্রজা। তাদের সুরক্ষার ভারও তোমারই।

- আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত, আচার্য। আমি সেই কারণেই রাতের পাহারা দ্বিগুণ করে দিয়েছি। পাটলিপুত্রর সমস্ত গণিকার বাড়িতে আমি সৈনিক পাঠিয়ে তাদের নির্দেশ দিয়েছি যে রাতের প্রথম প্রহরের পরে কেউ যেন নিজের বাড়ি ছেড়ে পথে না বের হয়। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। স্বয়ং সেনাপতি কিথককে আমি এই তদন্ত ভার দিয়েছি। নিজের কাজে সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে সে যেন নিজে রাতপাহারার এলাকাভিত্তিক প্রহরীদের তালিকা বানায়। পুরো

নগরীতে একইসঙ্গে সব জায়গায় প্রহরী দেয়া সম্ভব না হলেও, প্রহরবিশেষে, এলাকা ভাগ ভাগ করে পাহারার ব্যবস্থা করেছে সেনাপতি ইতিমধ্যেই। আমি নিজের তরফে চেষ্টার ত্রুটি করছি না, গুরুদেব।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তর চোখে চোখ রাখলেন চাণক্য। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সম্রাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,

- আপনি বিচক্ষণ, আচার্য। সাধারণ মানুষ আর অমাত্যদের মনোভাব আপনার অজানা নয়। অতএব আশা করি আমার সমস্যাটা আপনি অনুমান করতেই পারছেন। বেশ্যাদের প্রতি আমাদের সমাজের মনোভাব মোটেই সুখকর নয়। আমার মন্ত্রীরা বেশ্যা সম্পর্কিত কোনো কিছুতে থাকতে নারাজ। তারা মনে করে পতিতাদের জীবনের কোনো দামই নেই। তারা পাপী, পাপের সাজা পাচ্ছে। এদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করাটা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। আমি তাই নিজের মতো তদন্ত চালাতে বলেছি। কিন্তু আমি নিজেও এই তথ্য পাচারের সমস্যাটার কারণে, এইদিকে মনোযোগ দিতে পারছি না।

- হুমম। বুঝেছি। প্রদীপের তলাতেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে। তোমার যে চরিত্রবান অমাত্যরা রূপজীবী নারীদের পাপী বলে, রাতের অন্ধকারে তারাই কিন্তু এদের কেনে।

- সবই বুঝি, আচার্য। আমি এর বিহিত করবই। কিন্তু আমায় কিছুটা সময় দিন। এই গুপ্তচরের বিষয়ে একটা সূত্র হাতে এসেছে। আমি আশা করছি এই সূত্র ধরে দ্রুত সেই তথ্য পাচারকারী ধরা পড়বে। তারপরেই আমি এই হত্যাকাণ্ডর তদন্তে মনোযোগ দেব।

অসম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন চাণক্য। বললেন,

- ততদিন সময় নেই, সম্রাট। ততদিনে আরও হত্যা হবে। ইতিমধ্যেই তিন তিনটে হত্যা হয়ে গেছে। পাটলিপুত্রে আজকাল রাতে সাধারণ মানুষও বেরোতে ভয় পেতে শুরু করেছে। তাদের মনে আতঙ্ক ঢুকছে। রাজধানীতেই যদি মানুষ সুরক্ষিত বোধ না করে তবে যে তারা সাম্রাজ্যের ন্যায় রক্ষা ব্যবস্থার ওপর ক্রমে আস্থা হারাবে। তা আমি হতে দিতে পারি না।

জীবসিদ্ধি এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল। এইবার বলল:

- কিন্তু আচার্য, চন্দ্রগুপ্তর কথাও ঠিক। তার হাতের সমস্যাটার দ্রুত সমাধান হওয়াটাও জরুরি। রাজধানী থেকে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়াটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমার-আপনার চেয়ে ভালো কেই-বা জানবে।

- হুমম।

একটু চিন্তিত মনে হল চাণক্যকে। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,

- বেশ। তবে গোপন তথ্য ফাঁসের বিষয়টা তুমি তোমার মতো করে

সমাধান কোরো। আর এই হত্যাকাণ্ডর বিষয়টা আমি দেখছি। এই ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডর সমাধান করতেই হবে আমায়।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আচার্য চাণক্যকে প্রণাম করে বললেন,

- তাই হোক, আচার্য।

৫.

নির্দিষ্ট সময়ে, রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে আঙুরী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অন্ধকার চোখে সয়ে যাওয়ার জন্যে। হ্যাঁ, এইবার সব কিছু আবছা দেখা যাচ্ছে বটে। রাজপথে পা রাখে আঙুরী। আকাশের এক ফালি চাঁদ সামান্য আলো দিচ্ছে। রাতের কীটপতঙ্গ এক সুরে শব্দ করে চলেছে। মনের কোনায় ভয় জাগে আঙুরীর। গত কয়েক মাস ধরে রাতের পাটলিপুত্র নগর আর তার মতো রূপজীবীদের জন্যে সুরক্ষিত নেই। কোনো এক অচেনা উন্মাদ হত্যাকারী একের-পর-এক গণিকাদের হত্যা করছে। দিন পনেরো আগেই একজনকে হত্যা করেছে সেই শয়তান। এই হত্যাকারীকে নিয়ে অনেক কাহিনি রটেছে ইতিমধ্যে। আঙুরী শুনেছে যে সে নাকি আসলে মানুষ নয়। সে সাক্ষাৎ রাক্ষস! অসুর শক্তির উপাসনায় বলি দেয় পতিতাদের জরায়ু। তার নিশ্বাসের সঙ্গে নাকি আগুনের শিখা নির্গত হয়। ভাবতেই কেঁপে ওঠে আঙুরী।

দু-দিন আগেই তো দু-জন সৈনিক তাদের পল্লির প্রতিটা বাড়িতে এসে সাবধান করে দিয়ে গেছে। রাতে যেন বাড়ি ছেড়ে তারা পথে না বেরোয়। কোনো অচেনা পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে যেন তার সঙ্গে রাতে না যায়। তবু আজ তাকে বেরোতেই হবে। অর্থের লোভ, বড়ো লোভ। লোভের কাছে ভয় হার মানে বরাবরই। আঙুরী শিক্ষিত, সুন্দরী এবং নিঃসন্দেহে অতি দুঃসাহসী। সে যা করতে পারে বা করেছে, তা করার মতো সাহস সবার থাকে না। আজই তার শেষ কাজ হবে। মনে মনে ভেবেই রেখেছে আঙুরী। এইবার কাজের জন্য বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা জুটে যাবে তার। এরপর সে অন্য প্রদেশে চলে যাবে। যে স্বপ্ন সে সারাজীবন দেখে এসেছে তা পূরণ হবে। তার স্বপ্ন বড়ো কিছু নয়। অতি সাধারণ। সে চায় তার নিজের সংসার। এই অতি সাধারণ স্বপ্নও তার মতো গণিকাদের কাছে অলীক। মগধ ছেড়ে সে অন্য প্রদেশে চলে যেতে চায়। বিয়ে করে সংসার পাতবে সে ওখানে, যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। তার অতীত ঘেঁটে কেউ তাকে 'বেশ্যা' বলবে না। শুধু একজন ভালোবাসার মানুষ থাকবে তার সঙ্গে। ব্যস! এইটুকুই তার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন বাস্তব করতেই অর্থ উপার্জন করে চলেছে সে। যে নারীকে রোজ রাতে আলাদা আলাদা পুরুষের ভালোবাসা পেতে হয়, সে-ই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কাঙাল। কী অদ্ভুত নিয়ম এই সংসারের।



জনমানবশূন্য রাজপথ। শুধু মাঝে মাঝে পথের ধারে জ্বলতে থাকা মশাল কিছুটা করে জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। আঙুরীর মনে সামান্য ভয় থাকলেও একটা কথা ভেবে মনে সাহস জাগছিল তার। এখনও অবধি

এই রাজপথে অন্তত কোনো হত্যা হয়নি। যা ঘটেছে তা এই রাজপথ থেকে দূরের গলিপথে। আর তা ছাড়া তাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে তার প্রাণ সংশয় হবে না। সে শুনেছে রাতপ্রহরীদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তবে এখনও অবধি কোনো প্রহরী তার নজরে পড়েনি। ভালোই হয়েছে। তার গোপন অভিসারের পথে যত কম মানুষ তাকে দেখে ততই ভালো।

চিন্তায় ডুবে ছিল আঙুরী। হঠাৎই মনে হল যেন তার পেছনে মৃদু পদধ্বনি শুনল। চলা থামিয়ে একবার পেছন ঘুরে দেখল। কাউকে দেখতে পেল না। কুয়াশা জমেছে পথে। দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। নাহ্, নিশ্চয়ই তার মনের ভুল। এই ভেবে সে আবার সামনের পথ ধরে। কিন্তু এইবার স্পষ্ট এবং দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পায় আঙুরী। প্রহরী হতে পারে ভেবে চলার গতি সে বাড়িয়ে দিল আরও। সৈনিকদের মুখোমুখি না পড়লেই ভালো হয়। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, একটা দেয়ালের ধারে আঙুরী দম নিতে খানিক দাঁড়াল। নাহ্, আর কেউ আসছে না তার পিছু পিছু। আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তখনই আচমকা অন্ধকার আর কুয়াশার চাদর ভেদ করে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। আঙুরী সতর্ক হওয়ার আগেই, সেই ছায়ামূর্তি তার মুখ চেপে ধরে তার তলপেটে একটা ধারালো অস্ত্র বসিয়ে দিল।

৬.

চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি বসে আছেন চাণক্যর কুটিরে। দু-জনের সামনেই অনেকগুলো ভূর্জপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। গত কয়েক দিনে, তিন মৃতা রমণীর সম্বন্ধে একত্রিত করা সমস্ত তথ্য এগুলোতে আছে।

জীবসিদ্ধি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকায় উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বলল,

- নাহ্। কোনো যোগসূত্র নেই এই তিন জনের মধ্যে। আমি সব তথ্য আগেই দেখেছি। কিছুই পাইনি।

চাণক্য হাতে ধরা ভূর্জপত্র থেকে চোখ না তুলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন,

- হুম।

জীবসিদ্ধি ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করল। বলল:

- তিন জনের জন্মস্থান আলাদা। পারিবারিক বা কর্মসূত্রে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, এরা প্রত্যেকেই গণিকা। কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা গণিকাপল্লিতে তাদের বাসস্থান। তাদের প্রত্যেকেরই কোনো একজন বিশেষ পুরুষসঙ্গী আছে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। একবাক্যে বলা চলে, তাদের মধ্যে কোনো মিলই নেই। হত্যাকারীর শিকার চয়ন সম্পূর্ণ যথেচ্ছ এবং যোগসূত্রবিহীন।

- না।

হাঁটা থামিয়ে চাণক্যর দিকে চাইল জীবসিদ্ধি। প্রশ্ন করল,

- কী বললেন, আচার্য?

হাতের পত্রটা নামিয়ে রেখে মাথা তুললেন চাণক্য। বললেন,

- মৃতা গণিকারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মাঝে একটা মিল কিন্তু খুব স্পষ্ট। অন্তত আমি তাই অনুমান করছি।

- কী মিল? কোন যোগসূত্র?

উত্তর না দিয়ে রহস্যময় একপেশে হাসি হাসলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি বুঝল, গুরুদেব উত্তর দেবেন না এ প্রশ্নের।

- আচার্য!! আচার্য!!

কুটিরের দরজায় সুসেনের গলা শোনা গেল। গলা শুনলেই বোঝা যায় সে উত্তেজিত। জীবসিদ্ধি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই সুসেন ভেতরে ঢুকল।

- আচার্য! আবার একটা হত্যা হয়েছে!

- সেকী? এর মধ্যেই আবার?

- হ্যাঁ, আচার্য। এবং এইবার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে রাজপথের ওপর। রাজমহলের কাছেই। এভাবে তো নাগরিকদের মনে আমাদের প্রতি আস্থা তলানিতে এসে ঠেকবে, আচার্য। হত্যাকারীর দুঃসাহস বেড়ে গেছে। এবারও একইভাবে হত্যা করা হয়েছে। এবারও মৃতা একজন গণিকা। সেনাপতি কিথক ঘটনাস্থলে আছেন। আমায় পাঠালেন আপনাকে খবর দিতে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন চাণক্য। ওঁর কপালে ভ্রূকুটি। জীবসিদ্ধি জানে এটা চিন্তার লক্ষণ। আচার্য গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করলেন,

- হুমম। তুমি দেখেছ মৃতদেহ??

- আজ্ঞে হ্যাঁ, আচার্য।

- মৃতা মেয়েটার গায়ের রং তামাটে। কোঁচকানো কালো চুল। মাঝারি উচ্চতা।

জীবসিদ্ধি অবাক হয়ে তার আচার্যর দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ এই কথার মানে কী? তবে কি সত্যিই কোনো সূত্র পেয়েছেন গুরুদেব?

কিন্তু আশার আলোটা পরক্ষণেই নিভে গেল যখন সুসেন কিছুটা অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল,

- না। মৃতা মেয়েটা লম্বা। ফর্সা। চুল কালো বটে, তবে তা সোজা। কোঁচকানো নয় মোটেই।

উত্তর শুনে চাণক্য খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। আশাহত ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখে। জীবসিদ্ধি তার গুরুর এই অবস্থা দেখে মনে মনে কিছুটা

দুঃখিত এবং সেইসঙ্গে কিছুটা কৌতুক বোধ না করে পারল না। সে তার গুরুকে খুব ভালো চেনে। আচার্য মুখে যতই বলুন, যে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মণ মাত্র, সেটা শুধুমাত্র ওঁর বিনয়ের বাক্য। আচার্যর নিজের মনে ওঁর নিজের বুদ্ধির প্রতি একটা সুপ্ত গর্ববোধ আছে। আচার্য চাণক্য নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু ঠিক আর পাঁচজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতোই তিনিও নিজের সামনের ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে চমক দিতে ভালোবাসেন। এই যেমন এখন তিনি সেই চেষ্টাটাই করলেন এবং বিফল হলেন। যদি ওঁর এই অদ্ভুত অনুমান মিলে যেত, তবে এই মুহূর্তে আচার্য তার দিকে চেয়ে, মিটিমিটি রহস্যময় হাসি হাসতেন। তাঁর অনুমান না মেলায় সেই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। তাই আচার্য এখন একটু দুঃখিত হয়েছেন।

সুসেন বলল:

- আচার্য, জীবসিদ্ধি মহাশয়? আপনারা কি আমার সঙ্গে আসবেন?

- অবশ্যই। আচার্য?

জীবসিদ্ধি কথাটা বলে চাণক্যর দিকে চাইল। কিন্তু চাণক্য কথা শুনেছেন বলে মনে হল না। তিনি অন্যমনস্কভাবে মেঝের দিকে চেয়ে আছেন। কপালে গভীর ভ্রূকুটি। জীবসিদ্ধি আরও একবার একটু জোরে বলল,

- আচার্য?? ঘটনাস্থলে আসছেন তো?

চিন্তার জাল ভেঙে বেরিয়ে এলেন চাণক্য।

- হুমম? হ্যাঁ। যাব তো বটেই। চলো। আমার ঝোলাটা দেখো তো। কোথায় রেখেছি...।

৭.

ঘটনাস্থলে নতুন করে দেখার মতো কিছু নেই। ঠিক যেন আগের তিনটে ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চাণক্য খুব বেশি পরীক্ষা করলেন না মৃতদেহ। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে শুধু একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন মৃতদেহর দিকে। তাঁকে দেখে মনে হল না যে তিনি আদৌ কিছু দেখছেন। সম্ভবত অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেন। কুটিরে ফেরার পথেও বেশি কথা বললেন না। শুধু জীবসিদ্ধিকে বললেন,

- ওহে জীবসিদ্ধি। আজ দিনের শেষে একবার এসো। আমি ততক্ষণ একটু ভাবি আজকের দিনটা।

সন্ধ্যার দিকে জীবসিদ্ধি চাণক্যর কুটিরে এসে হাজির হল। চাণক্য প্রদীপ জ্বেলে লেখালেখি করছিলেন। ঘরে ধুনি আর কর্পূরের সুবাস। তাকে আসন গ্রহণ করতে বললেন চাণক্য। নিজের জায়গায় বসে প্রশ্ন করল জীবসিদ্ধি,

- আচার্য, আজ আপনাকে বড্ড অন্যমনস্ক লাগল। কী হয়েছে?

খানিক হতাশার সুরে চাণক্য বললেন,

- আমি কয়েকটা সূত্র ধরে এগিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কয়েক দিনের মধ্যেই অপরাধের কিনারা হবে। তা ছাড়া, তৃতীয় হত্যাকাণ্ডর পর সেনাপতি কিথক নিজে যেভাবে পাহারা সাজিয়েছেন, তাতে আমি ধারণা করেছিলাম হত্যাকারী এত সহজে আর হত্যা করতে পারবে না। বা, করতে গেলে নিঃসন্দেহে ধরা পড়বে। কিন্তু আজকের হত্যাটা আমায় নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

জীবসিদ্ধি কোনো কথা বলল না। খানিকক্ষণ দু-জনেই নিশ্চুপ থাকলেন। তারপর চাণক্য নিজেই আবার বললেন,

- এই ধারাবাহিক হত্যাকারীর সম্বন্ধে আমি নিজের মনে একটা ধারণা তৈরি করতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস। এই ধরনের অপরাধীকে ধরতে গেলে তার চিন্তাধারাটা বোঝার প্রয়োজন। নিজেকে তার জায়গায় রেখে বিচার করতে হবে। তবেই তার পরবর্তী পদক্ষেপ অনুমান করা সম্ভব হয়।

- আপনি তা করতে পেরেছেন?

- হুমম। কালকে তোমার দুটো কাজ। প্রথমত সুসেনকে সকালে আমার কুটিরে আসতে বলবে। আশা করি সে আজকের মৃতা মেয়েটার পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছে।

- বেশ। আমি তবে কাল সকালে, সুসেনকে সঙ্গে নিয়েই আপনার এখানে আসব। আর দ্বিতীয় কাজ?

- না। তুমি তাকে নিয়ে আসবে না। তুমি কাল সকালে অন্য একটা জরুরি কাজ করবে। কাল তুমি রাজভবন যাবে। সেখান থেকে পাটলিপুত্র নগরীর সম্পূর্ণ নকশা আমার জন্যে নিয়ে আসবে। ওটা বিশেষ প্রয়োজন।

- বেশ।

* * *

পরের দিন সকাল। চাণক্যের সঙ্গে সুসেন পথ চলেছে। সুসেন বলে উঠল,

- আচার্য, বলছিলাম কী, আর একবার বিবেচনা করে দেখুন। ওইখানে আপনার যাওয়াটা কি একান্তই জরুরি??

- হ্যাঁ, সুসেন। আমার মন বলছে, জরুরি।

- কিন্তু, কী খুঁজে পাওয়ার আশায় মৃতা গণিকার বাড়িতে যাচ্ছেন; আচার্য?? আমি বলতে চাইছি, আপনার মতো এক ব্রাহ্মণের কি ওই জায়গায় পা দেয়া উচিত?? হাজার হোক, সেটা পতিতাপল্লি।

কথাটা শুনে মাঝপথে চাণক্য হাঁটা থামালেন। পেছন ঘুরে সুসেনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। বললেন,

- কেন?? পতিতালয়ে পা দিলে আমি ধর্মভ্রষ্ট হব?

- না। মানে...

- ধর্ম কি এতটাই ঠুনকো? মানুষের ধর্ম তার কাজ দিয়ে নির্ধারিত হয়। একজন ব্রাহ্মণ, ধর্মভ্রষ্ট তখনই হয় যখন সে সজ্ঞানে উচিত কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মন্দিরে পুজো করলে সে পূজারি হয়, ব্রাহ্মণ নয়। যে গোটা মানুস জাতিকে ঠিক পথে চালনা করে, সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মনের এই সংকীর্ণতা দূর করো, সুসেন। না হলে এই সংকীর্ণতাই ভবিষ্যতে এই দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে।

লজ্জিত ভঙ্গিতে সুসেন বলল:

- ক্ষমা করবেন, গুরুদেব। আমি সেরকম বলতে চাইনি। বেশ। আমার মনের ভুল দূর হল। কিন্তু একটা কথা বলুন, আপনি ওই আঙুরী নামে রূপজীবী মেয়েটার কুটিরে কী খুঁজতে যাচ্ছেন??

- এইটা একটা যথার্থ প্রশ্ন করেছ। কিন্তু উত্তরটা এই মুহূর্তে আমার নিজেরও জানা নেই। কিন্তু আমার স্বজ্ঞা আমায় ওখানে যেতে বলছে। এটা আমার একটা অনুভূতিমাত্র।

- বুঝলাম না।

- আমিও বুঝিনি। সেখানে পৌঁছে বুঝব আশা করি।

কথা বলতে বলতে তারা পতিতাপল্লিতে ঢুকে পড়ল। সুসেনের কিছুটা অস্বস্তিকর লাগছিল। যদিও তার সামনে আচার্য চাণক্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এগিয়ে চলছিলেন। গতকালই সুসেন কুটিরের ঠিকানা জেনেছে। কালকে ন্যায়রক্ষী বাহিনীরা কুটির তালা দিয়ে আটকে দিয়ে গিয়েছিল। চাবি বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে সুসেনের কাছেই আছে। সেই অনুমান করেই চাণক্য তাকে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আসতে বলেন। বাড়ি খুঁজে পেয়ে চাণক্য সুসেনকে দরজাটা খুলতে ইশারা করলেন। ভেতরে ঢুকে চাণক্য প্রথমেই চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ভেতরে। এক এক করে এক একটা আসবাবপত্রর কাছে গিয়ে প্রতিটা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওঁর প্রতিটা পদক্ষেপ ধীর অথচ দৃঢ়। প্রতিটা সামান্য জিনিসও একবার অন্তত দেখলেন তিনি। কাগজপত্র, দোয়াত কলম, পোশাক-আশাক ইত্যাদি সমস্ত কিছু। গুছিয়ে রাখা পোশাক কয়েকটা বের করে এনে তিনি সুসেনের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

- ওহে সুসেন, মেয়েটার পোশাকগুলো এবং গয়না দেখো। কিছু অনুমান করতে পারছ? নারীদের কাপড় ও গয়নার দাম সম্বন্ধে আন্দাজ আছে?

- যা মনে হচ্ছে, সবই কমদামি। শুধু দু-তিনটে ছাড়া।

- হুম। এবং মূল্যবান যে ক-টা কাপড় ও গয়না দেখা যাচ্ছে, সেগুলো বেশ নতুন। এর থেকে কী অনুধাবন করা যায় ??

- কী??

- বুদ্ধি ব্যবহার করো হে, সুসেন। সহজেই অনুমেয় যে মেয়েটা হঠাৎ কয়েক মাস ধরে অর্থ হাতে পেয়েছিল। সম্ভবত কোনো নতুন পুরুষসঙ্গীর দেয়া উপহার এগুলো। অথবা হঠাৎ বেশি রোজগারের অর্থে এগুলো সে কিনেছে।

- কোনো বড়োলোক খদ্দের?

- হুমম।

দেরাজ খুলে তার ভেতর থেকে এক থলি রুপোর মুদ্রা বেরোল।

- এই দেখো। এই হল আমার অনুমানের সত্যতার প্রমাণ।

- সে বুঝলাম, আচার্য। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের হত্যাকাণ্ডের কী সম্পর্ক? তার এই নতুন পৃষ্ঠপোষকই যে হত্যাকারী এরকম আপনার কেন মনে হল? আর তা ছাড়া অন্যান্য গণিকাদের বাড়িতে কিন্তু এরকম কিছুই আমরা খুঁজে পাইনি। তাদের বাড়িতেও আমি নিজে উপস্থিত থেকে তল্লাশি চালিয়েছি।

- একথা আমি কখন বললাম যে এই পুরুষটিই হত্যাকারী?

- তবে?

উত্তর না দিয়ে আচার্য আবার আশেপাশে খুঁজতে শুরু করলেন। চারপায়ার ওপর রাখা একটা ছোটো বাক্সর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সেটার দিকে। সুসেন এগিয়ে গিয়ে দেখল তাতে অনেকগুলো মাদুলি রাখা। তবে সেগুলোর ভেতর ফাঁপা। অর্থাৎ তাতে আশীর্বাদি ফুল ভরে, মোম দিয়ে একদিকের মুখ আটকে, সেগুলো তাবিজ বানানো হয়নি এখনও। সবকটা ফাঁপা মাদুলির সঙ্গে ছোটো ছোটো সুতলি বাঁধা।

সুসেন লক্ষ করল আচার্যর ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি কিছু একটা ভাবছেন। ওঁর চিন্তার সাহায্যে এগিয়ে এসে সুসেন বলল:

- এগুলো তো হাতে পরার মাদুলি মনে হয়। সঙ্গে বাঁধার সুতো কিন্তু ছোটো। গলায় পরার জন্য এগুলো নয়। বোধ হয় নিয়মিত পরিবর্তন করতে হয় এরকম কোনো তাবিজ পরত এই মেয়েটা। মাস গেলে বদলাতে হয়। তাই একসঙ্গে অনেকগুলো কিনে রাখা।

- হুমম। অথচ মৃতদেহতে কিন্তু সেরকম কোনো তাবিজ চোখে পড়েনি আমার।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চাণক্য জানলার কাছে গেলেন। উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। কিছু একটা বিষয় নিয়ে গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন তিনি।

৮.

রাতের প্রথম প্রহর। সন্ধ্যার সময়। জীবসিদ্ধি এবং সুসেন বসে আছে আচার্য চাণক্যর কুটিরে। চাণক্য সন্ধ্যা আহ্নিক সারছেন। পুজো শেষ করে, ধুপ-ধুনো জ্বালিয়ে, আচার্য এক বাটি ফল নিয়ে এসে বসলেন তাদের সামনে।

- খাও, খাও।

- আপনিও নিন, আচার্য।

- হুমম। ওই সেনাপতি এলেন বোধ হয়।

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ কুটিরের সামনে এসে থামল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই দরজা খুলে সেনাপতি কিথক ঢুকলেন। চাণক্য আজ সন্ধ্যায় তাঁদের প্রত্যেককে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন।

চাণক্য কিথককে প্রশ্ন করলেন,

- কোনো নতুন খবর আছে, আর্য?

সেনাপতি হতাশা সূচক মাথা নেড়ে বললেন,

- না, আচার্য। রাতের পাহারারত সৈনিকরা কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেও, তাদের মধ্যে কেউই প্রকৃত হত্যাকারী বলে মনে হয় না। বেশিরভাগই মদ্যপ বা ছোটো অপরাধী।

সুসেন বলে উঠল,

- তবে আচার্য, সবচেয়ে শেষে যে গণিকার হত্যা হয়েছে তার জরায়ুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

- সে কী? কোথায়?

- শরীর থেকে জরায়ু কেটে, হত্যার জায়গা থেকে একটু দূরেই একটা পুরোনো জলাশয়ে ফেলে দিয়েছিল হত্যাকারী। একটা পুঁটুলিতে ভরে। জল কম থাকায় সেটা ভেসে কিনারে আসে। একটা শেয়াল সেটা মুখে করে টেনে আনে। জায়গাটাতে পাহারারত সৈনিকরা সেই শেয়ালটাকে একটা রক্তমাখা কাপড়ের পুঁটুলি মুখে নিয়ে টানাটানি করতে দেখে সন্দেহ করে। তার থেকেই এক মানবীর জরায়ু খুঁজে পাওয়া যায়।

- হুমম। তা সুসেন, ওই জলাশয়ে জাল ফেলে দেখো। বাকি মৃতদেহর থেকে চুরি যাওয়া জরায়ু পাওয়া যায় কি না।

সেনাপতি কিথক ততক্ষণে আসন গ্রহণ করেছেন জীবসিদ্ধির পাশে। উত্তরটা তিনিই দিলেন,

- সেটা ইতিমধ্যে করা হয়েছে, আচার্য। সুসেন আমায় এই জরায়ু খুঁজে পাওয়ার খবর দিতেই আমি তাকে জলাশয়ে জাল ফেলতে বলি। তবে কিছুই পাওয়া যায়নি।

সুসেন সেনাপতির সমর্থনে মাথা নাড়ে।

- হুমম। আপনি সত্যিই এক সুদক্ষ সেনাপতি, আর্য।

- ধন্যবাদ, আচার্য। আপনি আজ আমাদের সকলকে যখন একত্রিত করেছেন, তখন আমার ধারণা আপনি কোনো সূত্র পেয়েছেন। আমি কি ভুল অনুমান করলাম, আচার্য?

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

- হুমম। গভীর রহস্যের অন্ধকারে আমি কিছুটা আলো দেখতে পেয়েছি। পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে আজ আমি আপনাদের ডেকেছি।

এক পাত্র মধু ঢেলে তিনি বসলেন। অন্য অতিথিদের মধু বাড়িয়ে দিতে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন। এই প্রচণ্ড মিষ্টত্ব সম্ভবত চাণক্য ছাড়া কেউই জিভে ঠেকাতে পারে না। অথচ চাণক্যর এটা প্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বাকি দু-জন চাণক্যর এই মিষ্টত্ব প্রীতির সঙ্গে পরিচিত হলেও, সুসেন অবাক হয়ে দেখছিল তাঁকে। এক চুমুক মধু পান করে চাণক্য বললেন,

- প্রথম থেকে শুরু করা যাক। এই সবকটা হত্যাকাণ্ডর সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টা হল যে হত্যাকারী এতগুলো হত্যার পরেও কারুর নজরে পড়েনি। হত্যাগুলো অন্ধকার, জনমানবশূন্য জায়গায় হয়েছে। ঠিক কথা। কিন্তু হত্যার পদ্ধতি আর নৃশংসতা দেখেই বোঝা যায় যে হত্যাকারীর শরীরে ও পরনের জামাকাপড়ে নিঃসন্দেহে রক্তের দাগ লেগেছে। রক্তাক্ত বস্ত্রে, ঘোড়ায় চড়ে, সে নগরীর পথ ধরে পালাচ্ছে। অথচ সে রক্তস্নাত অবস্থায় কোনো প্রহরী বা সাধারণ নাগরিকের চোখে পড়েনি। এটা অবিশ্বাস্য। গভীর রাতে পথে-ঘাটে বেশি লোক না থাকলেও, প্রহরী বা কিছু মানুষ থাকেই। পাটলিপুত্র এক ব্যস্ত নগর। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার যদি-বা দৈবাৎ সে সকলের নজর এড়িয়ে যেতে সক্ষমও হয়, তবুও সেই কাজ চার বার করতে পারাটা অসম্ভব।

খানিক বিরতি নিয়ে চাণক্য আবার বলা শুরু করলেন,

- যুক্তিনির্ভর চিন্তা করলে এর একটাই উত্তর পাওয়া যায়। যুক্তি বলে, নিঃসন্দেহে তাকে এক বা একাধিক লোক দেখেছে। একটা রক্তাক্ত মানুষকে রাতে রাস্তায় দেখেও প্রহরী বা অন্যান্য ব্যক্তি কোনো এক বিশেষ কারণে সন্দেহ করেনি। অর্থাৎ হত্যাকারী এমন একজন ব্যক্তি, যাকে মাঝে মাঝেই রক্তাক্ত পোশাকে দেখা যায়। সঙ্গে একটা রক্তাক্ত বড়ো, ধারালো অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কারুর মনে তা সন্দেহর উদ্রেক করেনি। সম্ভবত পেশাগত কারণে তাকে সেই রূপে দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বলতে পারো কী সেই ব্যক্তির পেশা?

জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- সৈনিক!

- অসম্ভব।

সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন সেনাপতি। বললেন,

- কোনো সৈনিক রাতের রাস্তায় অকারণ রক্তাক্ত অবস্থায় টহল দিয়ে বেড়ালেও সেই দৃশ্য বড়োই অসম্ভব। যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো সৈনিক অকারণ রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না।

সেনাপতির কথার সমর্থনে চাণক্য বললেন,

- হুমম। একদম যথাযথ যুক্তি, সেনাপতি। না। হত্যাকারী কোনো সৈনিক নয়। সে এমন একটা পেশার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে তাকে নিত্যদিনই রক্তের দাগ লাগা পোশাকে মানুষ দেখে অভ্যস্ত। তাই আলাদা করে চোখে পড়ে না।

আচার্যর সামনে বসা তিন জনেই, উত্তেজিত ভঙ্গিতে সমস্বরে উত্তর দিল,

- সৌনিক *!

- ঠিক! যথার্থ আন্দাজ করেছ। আমি নিশ্চিত যে আমাদের এই হত্যাকারী পেশায় একজন মাংস বিক্রেতা!! আমাদের রাজধানীতে মাংস বিক্রেতারা, সময় বাঁচাতে, পশু জবাই করে রাতেই তৈরি রাখে যাতে পরদিন সকালে তা বিক্রি করে দেয়া যায়। তাই রাতে কোনো সৌনিককে রক্ত মাখা ছুরি আর পোশাকে দেখলেও, ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হবে। আমার ধারণা সৈনিকরা এই ব্যক্তিকে তার জীবিকার প্রমাণ পেয়ে রাতে ধরেও ছেড়ে দিয়েছে। অনেক কাটা মাংসর মাঝে এক মানবীর জরায়ু লুকিয়ে সহজেই সে চলাচল করে ঘোড়া চালিয়ে। প্রহরীরা আটকালে সে তার পরিচয়পত্র দেখায় আর নিজের সঙ্গে থাকা মাংসর ঝুলি দেখিয়ে প্রমাণ দেয় যে এগুলো সবই পশুর মাংস। অতএব, তার শরীরে লেগে থাকা রক্তও পশুর রক্ত। আমার আন্দাজ কি আপনাদের কাছে যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?

তিন জনই সম্মতিতে মাথা নাড়ে। চাণক্য আরও এক চুমুক মধু গলাধঃকরণ করলেন। তারপর বললেন,

- হুমম। এই যুক্তিনির্ভর আন্দাজ ব্যাপারটা ভারি চমৎকার। এর সাহায্যে, বহু ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘটনাস্থলে না গিয়েও, শুধু যুক্তির ওপর যুক্তি সাজিয়ে, নিজের জায়গায় বসেই রহস্যর সমাধান করা যায়। এইক্ষেত্রেও আমি তাই করেছি। আমি শুধু নিজেকে এই হত্যাকারীর জায়গায় রেখে তার মনস্তত্ত্বর গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী বিশ্লেষণ পুরোটাই অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে। প্রথমেই আসা যাক কয়েকটা প্রশ্নে। প্রথমত, হত্যাকারী শুধুমাত্র গণিকাদেরই নিজের শিকার বানাচ্ছে কেন? তার কি কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে তাদের ওপর! আমার ধারণা, নিশ্চয়ই তাই। এই হিংস্রতা এবং নৃশংসতা, কোনো সাধারণ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব। এটা কোনো এক উন্মাদ ব্যক্তির কাজ এবং পতিতাদের সে অতিমাত্রায় ঘৃণা করে। তার অতীতে, এমন কিছু ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে যা তার মনে এই বিকার সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ ঘটা কোনো ঘটনায় কিন্তু এতটা প্রভাব ফেলা সম্ভব নয়। সম্ভবত এই ঘৃণার সূত্রপাত অনেক আগে। বাল্যকালে প্রাপ্ত মানসিক আঘাতে শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে থাকে। তার থেকে এই গভীর ঘৃণা আর আক্রোশের জন্ম হওয়া সম্ভব।

একটু বিরতি নিয়ে পুনরায় নিজের বিশ্লেষণ শুরু করলেন চাণক্য,

- এইবার আসি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে। হত্যার পর কোন আক্রোশে হত্যাকারী মৃতার শরীর থেকে জরায়ু ছিন্ন করে সঙ্গে নিয়ে যায়? শুধুমাত্র জরায়ুই কেন? মানব শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ নয় কেন? এর উত্তরও একটু যুক্তি দিয়ে ভাবলে অনুমান করা সম্ভব। মানুষের চোখের সঙ্গে সৌন্দর্যর সম্পর্ক করি আমরা। উদাহরণ হিসেবে মনে করে দেখুন, কয়েক বছর আগে পাটলিপুত্রে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। পরস্ত্রীর দিকে তাকানোর অপরাধে সেই রমণীর স্বামী এক ব্যক্তির চোখ উপড়ে নিয়েছিল। ঘটনাটা নিশ্চয়ই মনে আছে আশা করি?

ঘটনাটা কয়েক বছর আগেই নগরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই সকলেরই মনে আছে। আচার্য বললেন,

- হুমম। ঠিক সেইরকমভাবেই, হৃদয়কে আমরা প্রেম বা ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে থাকি। যোনিদেশ হল যৌনতার প্রতীক এবং জরায়ু হল জন্ম বা মাতৃত্বর প্রতীক। অর্থাৎ, হত্যাকারীর সমস্ত আক্রোশের উৎস তার বা অন্য কারুর জন্ম অথবা মাতৃত্ব সম্পর্কিত কোনো ঘটনা থেকে হয়েছে। আরও একটা আশ্চর্য বিষয় ভাবো। হত্যাকারী যে ক-জন নারীকে হত্যা করেছে, তাদের কারুর সঙ্গে হত্যার আগে শারীরিকভাবে লিপ্ত হয়নি। কারণ আততায়ীর মনে প্রচণ্ড ঘৃণা আছে পতিতাদের প্রতি। সে তাদের সঙ্গে সেই কারণে শারীরিকভাবে মিলিত হতেও চরম বিতৃষ্ণা বোধ করে। অথবা আরও একটা সম্ভাবনা। সে গণিকাদের মধ্যে তার মায়ের ছায়া দেখে। তাই তাকে ধর্ষণ করা থেকে বিরত থাকে বরাবরই।

অতএব, সব তথ্য ও বিশ্লেষণ মিলিয়ে আমরা কী কী আন্দাজ করতে পারি? আমাদের উন্মাদ হত্যাকারী এই নগরীর একজন মাংস বিক্রেতা, যার নিজের মা সম্ভবত রূপজীবী ছিল। অতীতের কোনো ঘটনায় তার মনে পতিতাদের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে থেকেই। অর্থাৎ সেই সময়ের আশেপাশে এমন কিছু হত্যাকারীর জীবনে আবার ঘটেছে যার ফলে তার অতীতের আক্রোশ বর্তমানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাকে কোনো এক বা একাধিক নারী চরম আঘাত করেছে এবং সেই প্রতিহিংসা সে অন্য নারীদের ওপর নিচ্ছে।

সেনাপতি কিথক মনোযোগ দিয়ে চাণক্যর বিশ্লেষণ শুনছিলেন। এইবার আর উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন,

- সাধু! সাধু! অসাধারণ আপনার অনুধাবন ক্ষমতা, আচার্য। আমি স্তম্ভিত!

চাণক্য কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন। মনে হল তিনি সেনাপতির এই আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে বেশ কৌতুক বোধ করছেন। চাণক্যর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল। তাঁর চোখে চোখ পড়তে সেনাপতি কিছুটা লজ্জিত হলেন। বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন,

- ক্ষমা করবেন, আচার্য। আমি বোধ হয় একটু বেশিই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আপনার অনুধাবন ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত। আমি জানতাম যে আপনিই পারবেন। আমি সুসেনকে বলেছিলাম যে এই সমস্যার সমাধান একমাত্র মহামতি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যই করতে পারেন।

- ওহে, সেনাপতি। উত্তেজনা প্রশমিত করুন। অতি উত্তেজনা স্বাস্থ্য ও বিচারশক্তি, দুটোর ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। এইবার তবে আপনাকে আমি বলি যে আপনার পরবর্তী কর্তব্য কী।

- হ্যাঁ। অবশ্যই। বলুন, আচার্য।

- হুমম। সেনাপতি এবং সুসেন, আপনাদের পরবর্তী কাজে সাহায্য করবে স্বয়ং জীবসিদ্ধি। জীবসিদ্ধি, নগরে তোমার পুরোনো গুপ্তচর চক্রর গূঢ় পুরুষরা কি এখনও আছে? প্রয়োজনে কি তাদের আবার কাজে লাগানো যেতে পারে?

মৃদু হেসে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- কয়েকজন তো আছেই। আপনি বললেই আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

- অতি উত্তম। তাই করো। তারা চেষ্টা করলে এবং সঙ্গে সৈনিকরা সাহায্য করলে আমার ধারণা এই নগরের বুকে এরকম একজন মাংস বিক্রেতাকে খুব সহজেই খুঁজে পাবে। তার সঙ্গে বা পারিবারিক সূত্রে পতিতাদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, গূঢ় পুরুষরা সেই খোঁজ নিক। হাট-বাজারের উড়তে থাকা জনশ্রুতিতে তারা কান পাতুক। কয়েক মাস আগে কোনো এক নারী এই ব্যক্তিকে আঘাত দিয়েছে। সম্ভবত প্রেমে আঘাত এবং এই সৌনিক ব্যক্তির অবশ্যই একটা কালো ঘোড়া আছে। আসুন, আপনাদের জন্যে বিষয়টা আরও একটু সহজ করে দিই। জীবসিদ্ধি, তুমি কি একটু কষ্ট করে আমায় নকশাটা এনে দেবে? ওই যে, ওখানে রাখা।

উঠে গিয়ে জীবসিদ্ধি পাশের চারপায়ার ওপর রাখা একটা বড়ো আকারের ভূর্জপত্র নিয়ে এল। সেটার ভাঁজ খুলে সকলের সামনে মেঝেতে মেলে ধরলেন চাণক্য। এটা পাটলিপুত্র নগরের একটা অংশের হাতে-আঁকা নকশা। এতে প্রতিটা পথ-ঘাট, দফতর ইত্যাদি চিহ্নিত করা আছে। চাণক্য বললেন,

- আমি জীবসিদ্ধিকে রাজপ্রসাদ থেকে দিয়ে নগরের একটা বিশেষ অংশর এই নকশাটা আনিয়েছি। জীবসিদ্ধির সাহায্যে এতে আমি প্রতিটা হত্যার জায়গা কালি দিয়ে আগেই চিহ্নিত করে রেখেছি। প্রতিটা হত্যাই নগরের এই অংশে হয়েছে। এইবার একটা ঘোড়ার গতি হিসেব করে অনুমান করা যায় যে এক প্রহরে কতটা পথ অতিক্রম করা সম্ভব। সেই অনুযায়ী আপনারা নগরীর কয়েক যোজন জায়গা সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হল, নগরের এই অংশে ব্যাবসা চালায় এরকম প্রতিটা মাংস

বিক্রেতার ওপর নজরদারি চালানো। তাদের অতীত সম্বন্ধে তথ্য একত্রিত করুন। জানতে হবে এদের মধ্যে কারুর আগে, অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না। কারণ আমরা যাকে খুঁজছি, আমি নিশ্চিত সে এদের মধ্যেই একজন। আমার বিশ্বাস এই উপায়ে আমরা, সেই উন্মাদ হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে পারব। আর তার পর আমরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করব।

- ফাঁদ? কীরকম ফাঁদ, আচার্য?

জীবসিদ্ধির এই প্রশ্নে রহস্যময় হাসি হাসলেন চাণক্য। মধুর পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে উত্তর দিলেন,

- বিষকন্যা!

সৌনিক- মাংস বিক্রেতা /কসাই।

৯.

মৌর্য সাম্রাজ্যর নিজস্ব বহু আততায়ী দল আছে, যারা রাজনির্দেশে গুপ্তহত্যা করে থাকে। তাদের মধ্যে ভয়ংকরতম গুপ্ত-আততায়ী হল 'বিষকন্যা'রা। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যেসব মেয়েদের জন্ম শুক্লপক্ষর দ্বিতীয়া তিথিতে হয় এবং যদি চন্দ্র অশ্লেষ, শতভিষা অথবা কৃতিকা নক্ষত্রে অবস্থান করে, তবে সেই মেয়ের গ্রহদোষ দেখা দেয়। এর সঙ্গে যদি তার জন্মমুহূর্তে সূর্য পঞ্চমভাবে এবং মঙ্গল নবমভাবে অবস্থান করে থাকে, তবে তাদের বিষকন্যা আখ্যা দেয়া হয়। বলা হয়, এরকম দোষযুক্ত কোনো নারীর সঙ্গে যে পুরুষের বিয়ে হবে, তার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব বলা বাহুল্য যে এই মেয়েদের বিয়ে দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ এদের সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, তাদের মা-বাবা স্বয়ং তাদের অভিশাপ বলেই গণ্য করে।

আচার্য চাণক্য বহু বছর আগেই এইরকম বহু মেয়েকে সারা দেশ থেকে খুঁজে খুঁজে একত্র করেছিলেন। একটা গোপন জায়গায় তাদের রাখা হয় এবং প্রশিক্ষিত করা হয়। বালিকা বয়স থেকেই, নিয়মিত তাদের খাবারের সঙ্গে সীমিত পরিমাণ বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, খাবারে সেই বিষের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর ফলে এই মেয়েরা যুবতী হয়ে ওঠার আগেই তাদের শরীরে বিষের মাত্রা এতটাই হয়ে যায় যে তাদের একটা সামান্য চুম্বন বা কামড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের তক্ষুনি মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। এই বিষকন্যাদের দলটা চাণক্য গোপনে নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি করেন। এরা সম্ভবত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত হত্যাকারীদের দল। চাণক্য যে সময় চন্দ্রগুপ্তকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ভবিষ্যৎ সম্রাট হওয়ার, একই সময়ে, একটা গুপ্ত আশ্রমে সমাজের থেকে বহিষ্কৃত, অনাথ, দুস্থ, অথবা বহু ক্ষেত্রে ক্রীতদাসী

হিসেবে অত্যাচারিত মেয়েদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শুধুই যে নিয়মিত তাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয়া হত তা নয়। সঙ্গে এই মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধকৌশলের ও অস্ত্র চালানোরও প্রশিক্ষণ দেয়া হত। অখণ্ড আর্যাবর্ত গড়ে তোলা ছাড়া, আচার্য এই বিষকন্যাদের সাহায্যে বহু গুপ্তহত্যা করিয়েছেন। চাণক্যর নির্দেশে এই যুবতীরা বহু রাজপুরুষ ও সামরিক উচ্চপদাধিকারিকে নিজেদের রূপে মোহিত করেছে। তাদের জালে শত্রুরা সহজেই ধরা দিয়েছে। চুম্বন বা সংগমের ফলে সেই শিকারদের অনিবার্য মৃত্যু হয়েছে।

এইরকমই এক বিষকন্যা, উল্লুপি, এখন আচার্য চাণক্যর দরজায় অপেক্ষারত। গায়ের রং তামাটে, কোঁচকানো এলো চুল, গায়ে সোনার গয়না। কাজল টানা চোখে মায়াবী মোহময়ী দৃষ্টি। এই যুবতীকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না তার আসল পরিচয়। সে একজন প্রশিক্ষিত গুপ্ত আততায়ী। তার এক কামড়ে আছে নিশ্চিত মৃত্যু।

- গুরুদেব!

কুটিরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন চাণক্য। বাইরে অপেক্ষারত যুবতীকে দেখে হাসি খেলে গেল ওঁর মুখে। বললেন,

- উল্লুপি! এসো মা, এসো।

উল্লুপি মাটিতে বসে চাণক্যর পায়ে মাথা ঠেকাল। তাকে আশীর্বাদ করে চাণক্য বললেন,

- আয়ুষ্মান ভবঃ। উৎকৃষ্ট বীরাঙ্গনা।

কুটিরে ঢুকল যুবতী। তাকে আসন গ্রহণ করতে বলে নিজেও মুখোমুখি বসলেন চাণক্য। উল্লুপি প্রশ্ন করল,

- জীবসিদ্ধি ভাই বলল আপনি আমায় স্মরণ করেছেন।

- হ্যাঁ, মা। মগধের তোমায় আবার প্রয়োজন। আমার একটা বিশেষ কাজ তোমায় করতে হবে। আর এই কাজ একমাত্র তুমিই পারবে।

- আদেশ করুন, আচার্য। দেশের কোন সেবা আমি করতে পারি? আপনাকে আমরা বিষকন্যারা বাবার জায়গা দিয়েছি। মাত্র দশ বছর বয়সে যখন কুলক্ষণা হওয়ার দোষে আমার নিজের বাবা আমায় দাস ব্যবসায়ীর হাতে বিক্রি করে দিয়েছিল, তখন আপনি আমায় উদ্ধার করেন। নতুন জীবন দান করেন। যে 'বিষকন্যা' নামে আমার লজ্জা ছিল, আজ সেটাই আমার গর্বের উপাধি। আমি বিষকন্যা উল্লুপি আপনার আদেশে প্রাণ দিতে এবং প্রাণ নিতে সদা প্রস্তুত। আপনি আদেশ করুন, বাবা।

- না, না। প্রাণ দিতেও হবে না এবং আশা রাখি প্রাণ নিতেও হবে না।

রাজধানীতে ঘটে যাওয়া পর পর হত্যাগুলোর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেফতারে তোমার সাহায্য চাই। তুমি এ কাজের উপযুক্ত। এতে তোমার জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা আছে, উল্লুপি। তবে আমার বিশ্বাস এর চেয়ে অনেক বেশি বিপদেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম তুমি। মগধ তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে।

- আপনি নির্দ্বিধায় বলুন আপনার পরিকল্পনা। আমি প্রস্তুত।

১০.

ভীমার কথা:

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাবসা হল দেহব্যাবসা! আমার মা এক বেশ্যা ছিল, আর বাবার পরিচয় জানি না। সম্ভবত আমার মা-ও নিশ্চিত করে জানত না তার পরিচয়। আমার জন্ম হয় দক্ষিণ আর্যাবর্তের একটা রাজ্যের বেশ্যালয়ে। শিশুকালে কিছু বুঝতাম না এইসব। বুঝতাম না যে মা কেন আমায় রাতে অন্য শিশুদের মতো নিজের ঘরে থাকতে দিত না। কিন্তু বয়স একটু বাড়তেই সমাজ আমায় বাস্তবটা বুঝিয়ে দিল। জানতে পারলাম আমি পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তান। বেশ্যার ছেলে। সমাজের সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণির প্রাণী। পাঠশালায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বেশ্যাপুত্রকে কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর গুরুকুলে স্থান দেননি। তাই আমি সারাদিন একা একা খেলতাম। কারণ বেশ্যাপুত্রর সঙ্গে কেউ মেলামেশা করত না।

একদিন খুব তেষ্টা পাওয়ায় একটা কুয়োর থেকে জল পান করি। জানতাম না যে সেটা ব্রাহ্মণদের কুয়ো। একজন আমায় সেখান থেকে জল খেতে দেখে ফেলে আর গ্রামে খবর দেয়। ব্রাহ্মণরা এবং গ্রামের অন্য লোকেরা আমায় ধরে ফেলে। আমায় নগ্ন করে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবকানো হয় সেই অপরাধে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল সারা শরীরে। আর হচ্ছিল প্রচণ্ড রাগ। না না, গ্রামের লোকেদের ওপর নয়। রাগ হচ্ছিল মায়ের ওপর। সবাই ঠিকই বলে। আমার মায়েরই সব দোষ। সব জেনে-শুনে আমায় জন্ম কেন দিল? কার বাচ্চা আমি সেটা পর্যন্ত সে জানে না। নির্লজ্জ, বেহায়া মহিলা! আজ তার বেশ্যাবৃত্তির জন্যই আমার এই অবস্থা। কেন আমায় সে নিজের জরায়ুতেই শেষ করে দিল না? কেন তারই নোংরা জরায়ুতে আমার জন্ম হল? সব ওই বেশ্যার দোষ!

রক্তাক্ত অবস্থায় আমি এক প্রহর ধরে সেদিন রোদে পড়ে ছিলাম। কেউ জল পর্যন্ত দেয়নি। আমি সেদিনই প্রতিটা আঘাত থেকে নির্গত রক্তবিন্দুর নামে শপথ করি যে আমার মাকে সাজা দেব আমি।

কয়েকদিন লাগল সুস্থ হতে। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। কয়েক মাস পর সুযোগ এসেও গেল। সুরার নেশায় চুর হয়ে আমার মা এক পুরুষের সঙ্গে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। আমি একটা ছুরি সোজা বসিয়ে

দিলাম আমার ঘুমন্ত মায়ের বুকে। শব্দ করারও সুযোগ পেল না। তারপর সেই ছুরি ধরিয়ে দিলাম নেশার ঘোরে পাশে ঘুমিয়ে থাকা লোকটার হাতে। এরপর নিজেই চিৎকার জুড়ে দিলাম। লোক ডাকলাম। ওই অচেনা লোকটা ঘুম ভেঙে আগের রাতের কথা কিছুই মনে করতে পারল না। তাই সবাই ধরেই নিল যে এটা নিশ্চয়ই নেশার ঘোরে তারই কীর্তি। লোকটাকে প্রহরীরা ধরে নিয়ে গেল বটে, তবে আমি জানি কয়েক দিন বাদেই সে ছাড়াও পেয়ে যাবে। আমার মায়ের মতো একটা সস্তা বেশ্যার জীবনের বিশেষ মূল্য নেই। এই হল বারো বছর বয়সে আমার প্রথম হত্যার ঘটনা।

হত্যা করে হাত কাঁপেনি বলেই বোধ হয় কয়েক বছর পর মাংস বিক্রেতার পেশা নিলাম। চলে এলাম রাজধানী পাটলিপুত্রতে। একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম। অসম্ভব ভালোবেসে ফেলি মেয়েটাকে। কিন্তু হায়! বিয়ের পরই বুঝতে পারি, আমার স্ত্রীর চরিত্র ভালো না। আমায় দিয়ে তার শারীরিক খিদে তুষ্ট হয় না। এ ছাড়াও মূল্যবান জিনিস এবং গয়নার প্রতিও চরম লোভ। তবুও, আমি যতটা সম্ভব তাকে সুখী করার চেষ্টা করেছিলাম। তার প্রেমে অন্ধ ছিলাম।

কিন্তু আমার স্ত্রীর চরিত্র খুব তাড়াতাড়িই সবাই জানতে পেরে যায়। দুশ্চরিত্র লুকিয়ে রাখা বড়োই কঠিন। তবুও আমি লোকের কথায় কান দিতাম না। একদিন দোকানে একজন ব্যক্তি মাংসর ন্যায্য মূল্য দিতে অস্বীকার করায় আমার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। সে কথায় কথায় আমায় 'বেশ্যার স্বামী' বলে সম্বোধন করে। আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। মাংস কাটার ছুরি দিয়ে তাকে কোপ মারি। যদিও ব্যক্তিটি বেঁচে যায়, কিন্তু আমার কয়েক মাসের কারাবাস হয়। মাঝে আমার স্ত্রী দেখতে আসত কারাগারে। আমার দুর্দশায় তাকে একটুও দুঃখিত মনে হত না।

কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েই জানতে পারি যে আমার স্ত্রী, আমার অবর্তমানে, বহু পুরুষসঙ্গী নিয়ে তুলেছে আমারই বাড়িতে। উন্মাদের মতো বাড়ি ফিরি। স্ত্রীকে চেপে ধরি। গলা চেপে মেরে ফেলতাম, কিন্তু তখনই স্ত্রী বলে সে নাকি সন্তানসম্ভবা। আমি তাকে ছেড়ে দিই। না না। তাকে ক্ষমা করিনি। বরং তার ওপর আমার অসম্ভব রাগ হয়। কারণ আমি জানি এই সন্তান আমার নয়। এ অন্য কারুর পাপ। ঠিক যেমন আমি নিজে ছিলাম। আমার মায়ের পাপের ফল। আমি তখনই ঠিক করে ফেলি এই সন্তানকে জন্মাতে দেব না। মরতে হবে তাকে এবং তার বেশ্যা মাকে।

সেই মুহূর্তে, আমার স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই একটা জিনিস উপলব্ধি করি। কী আশ্চর্য! আমি এতদিন এটা খেয়াল করিনি? আমার স্ত্রীকে ঠিক আমার বেশ্যা মায়ের মতো দেখতে! সেই তামাটে রং, উচ্চতা এবং কোঁচকানো কালো চুল। তার মুখে আমি স্পষ্ট নিজের মায়ের মুখ দেখতে পাই।

সেই রাতেই আমার মাংস কাটার ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে আমি হত্যা করি! সে আমায় সত্য বলেছিল নাকি পেটে সন্তান থাকার কথাটাও মিথ্যে, সেটা নিশ্চিত করতে তার জরায়ু কেটে দেখি। এইবার বেশ্যাটা আমায় সত্যিই বলেছিল। এরপর দেহটা টুকরো টুকরো করে রাতেই বাড়ির পেছনের উঠোনে পুঁতে ফেলি। শুধু ওই জরায়ুটা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। সেটার ওপর আমার ঘৃণাই আলাদা! ওটাকে আরও অনেক টুকরো করে তবে শান্তি পাই।

পরদিন সকালে সকলকে জানাই, আমার স্ত্রী অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। সবাই বিশ্বাস করল। কারণ একজন বেশ্যা স্ত্রীলোকের চরিত্র সবাই জানে। উলটে সবাই আমায় সহানুভূতি জানাল।

কিন্তু এরপর থেকেই আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়। আমার মধ্যে ঘুমন্ত পিশাচ জেগে ওঠে। কয়েক সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই, মন অশান্ত হয়ে উঠল। প্রচণ্ড রাগ উঠল মাথায়, নিজের মায়ের ওপর, স্ত্রীর ওপর। মনে হল তাদের আরও একবার হত্যা করতে হবে। মাত্র একবার তাদের পাপের শাস্তি দেয়াই যথেষ্ট নয়। বার বার তাদের যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতে হবে। আমি বড়ো ছুরিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক রাতে। ঘোড়ায় করে পৌঁছে গেলাম এক বেশ্যাপল্লিতে। খুঁজে পেলাম এক বেশ্যাকে, যাকে ঠিক আমার মায়ের মতোই দেখতে। রুপোর মুদ্রার লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে এলাম নির্জন জায়গায়। তাকে হত্যা করলাম। ছুরি চালানোর সময়ে তার মুখটা হুবহু আমার মায়ের মতোই লাগছিল। তাতেও শান্তি পেলাম না। বের করে আনলাম তার জরায়ু। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম সেটাকে। তারপর সময় নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলাম। নাহ্, এর গর্ভে কোনো পাপ নেই। আহ্, কী যে শান্তি পেলাম! তারপর যথারীতি সেই টুকরোগুলোর জায়গা হল আমার বাড়ির পেছনে।

কিন্তু এরপর থেকে, মাঝে মাঝেই আমার মন অশান্ত হয়ে ওঠে। তখন আমি খুঁজতে বের হই আমার মাকে। আমার স্ত্রীকে। তাদের সাজা দিই আমি বার বার। বড়ো শান্তি পাই! খুব শান্তি!

* * *

হন্তদন্ত হয়ে চাণক্যর বাড়িতে ঢুকলেন সেনাপতি কিথক।

- আচার্য! সুখবর আছে।

- হুমম। শান্ত হোন, মহাবীর। রাগ আর অতি উৎফুল্লতা, দুটোই মানুষের বুদ্ধিনাশ ঘটায়।

- আচার্য, আমার ধারণা আমরা অপরাধীর সন্ধান পেয়েছি। জীবসিদ্ধি মহাশয়ের লোকেরাই সেই খবর এনেছে। আপনার কথামতোই এই ব্যক্তি পেশায় সৌনিক, মাংস বিক্রি করে। কয়েক মাস আগে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে

বচসা হওয়ায়, রেগে গিয়ে তাকে আঘাত করে এই লোকটা। কয়েক মাস কারাবাসও করেছে এই কারণে। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে। খোঁজ নিয়ে এও জেনেছি তার মা একজন গণিকা ছিল।

- হুমম। সাধু। আমার বিশ্বাস সাম্যর সন্দেহে ভুল হয়নি। বিনা প্রমাণে এই ব্যক্তিকে আটক করা যাবে না। আর তাই একে ধরতে হবে প্রমাণ সমেত। সেই কারণেই ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে হবে। যাতে শিকারি স্বয়ং এইবার শিকার হয়। এই নরপিশাচটা যোগ্য শাস্তি পেলে, তবেই ছায়া এবং পীতাম্বরীর আত্মা শান্তি লাভ করবে।

- কী? কাদের আত্মা?

- আহা। ওই মৃত স্ত্রীদের মধ্যে দু-জনের নাম। ছায়া এবং পীতাম্বরী। আপনার অবশ্য তাদের নাম জানার কথা না। স্বাভাবিক।

- ওহ, বেশ। তা আচার্য, এরপর আমাদের করণীয় কী?

- নজর রাখুন এই পুরুষটার ওপর। সে এখন একটা রক্তের স্বাদ পাওয়া শ্বাপদ। শিকার না করে বেশিদিন থাকতে পারবে না। প্রতিবার সে আলাদা আলাদা গণিকাপল্লি থেকে শিকার নিয়েছে। নগরের আর শুধুমাত্র একটাই গণিকালয় বাকি আছে। অনুমান করতে পারি সে তার পরবর্তী শিকারের সন্ধানে সেইখানেই আসবে। আমরা তৈরি থাকব তার জন্যে।

- বেশ। আর আপনার বিষকন্যা তৈরি তো?

- হ্যাঁ। আজ রাত থেকে সে রোজই তৈরি থাকবে। সুযোগ আসবেই। আচ্ছা, কতদিন আগে আঙুরীর হত্যা হয়েছে, সেনাপতি?

- তা প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল আঙুরীর হত্যার।

- হুমম।

চাণক্য আবার ভাবনায় ডুবে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন,

- আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, আমরা খুব তাড়াতাড়িই সুযোগ পাব। জীবসিদ্ধির গূঢ় পুরুষরা তার গতিবিধির ওপর নজর রাখবে আশা করি। কোনো রাতে তাকে অভিসারে বেরোতে দেখলেই যেন তক্ষুনি আমায় সেই খবর দেয়া হয়। আমিও উপস্থিত থাকতে চাই তাকে গ্রেফতার করার সময়ে। আপনি আসুন, আর্য। আপনার সাফল্য আর দোষীর সাজা কামনা করি।

১১.

গভীর রাত। আজ ভীমার চোখে ঘুম নেই। একটা প্রচণ্ড আক্রোশ... হতাশা... দুঃখ তার ভেতরে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই অদ্ভুত অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বোধ হয় একেই 'রক্ততৃষ্ণা' বলে। ভীমা জানে তাকে কী করতে হবে। চোখ খুলে দেখল তার বিছানার পাশেই তার মা আর স্ত্রী

দাঁড়িয়ে আছে। আগে মা একা আসত। আজকাল সঙ্গে আবার এই বেশ্যাটাকেও নিয়ে আসে। তাদের তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি দেখলেই ভীমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। আবার তাদের শাস্তি দেয়ার সময় এসেছে! তাদের আরও একবার মরতে হবে!

বিছানা ছেড়ে নেমে, চোখে-মুখে ঠান্ডা জল দিল ভীমা। বাড়ির সামনেই তার ছোট্ট দোকান। তালা খুলে সেখানে ঢুকল ভীমা এবং বেরিয়ে এল একটু পরেই। সঙ্গে একটা বস্তায় করে কাটা মাংস নিতে ভুলল না। কারণ ফেরার পথে সৈনিকরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখলে, এটা দেখিয়েই তাদের হাত থেকে রেহাই পায় সে। কালো ঘোড়াটা বের করে আনল। গায়ের কাপড় দিয়ে মুখের একাংশ সহ সারাশরীর ঢেকে নিল ভীমা। শুধু তার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে শ্বাপদ প্রাণীর মতো। ঘোড়ায় চড়ার সময়ে, গায়ের কাপড় সরে যেতে, চাঁদের আলোয় এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল কোমরবন্ধে বাঁধা, তীব্র-ধার, বড়ো, ভারী মাংস কাটার ছুরিটা। কুয়াশা ভেদ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল শিকারের সন্ধানে।

বেশ কিছুটা ঘোড়া ছুটিয়ে, ভীমা এসে পৌঁছোয় নির্দিষ্ট গণিকাপল্লিতে। বেশিরভাগ গণিকাই রাজ আদেশে আর রাতের বেলা পথে নামছে না। কিন্তু ভীমা লক্ষ করল, সংখ্যায় কম হলেও তিন-চারটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথের ধারে লাগানো মশালের আলোয় বিশেষ একজনের ওপর তার নজর পড়তেই ভীমার দৃষ্টি জ্বলজ্বল করে উঠল। এই তো সে! যাকে সে খুঁজছিল। তার মা! তার স্ত্রী! নির্লজ্জ বেশ্যা! একটা রুপোর মুদ্রা বের করে সেই যুবতীকে দেখাল। তাকে ঘোড়ায় উঠে আসতে ইশারা করল। যুবতীর মধ্যে সামান্য ভয় এবং সংশয়ের ভাব দেখা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল যুবতী। মনে মনে হাসল ভীমা। এই মুদ্রাটা দেখিয়ে প্রতিবার সে কাজ হাসিল করেছে। কিন্তু মুদ্রাটা তাকে খরচা করতে হয়নি একবারও।

ঘোড়ায় উঠতে মেয়েটাকে সাহায্য করল ভীমা। মেয়েটাকে নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা অন্ধকার নির্জন জায়গায় দাঁড়াল। মেয়েটাকে নামতে বলল। মেয়েটা ইতস্তত করছিল। ভীমা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে, মিষ্টি গলায় তাকে বলল:

- দেখ ছোড়ি। বাড়িতে স্ত্রী আছে। তাই তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। আর তোর এলাকায়, তোর ঘরে ঢুকতে কেউ দেখে নিক, সেটাও আমি চাই না। তাই এখানে আনলাম। চিন্তা করিস না। আমায় খুশ করতে পারলেই মুদ্রা তোর।

এই কথায় মেয়েটা নেমে পড়ল। ভীমা নেমে এসে মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারের একটু ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। আড়াল হতেই মেয়েটাকে দেয়ালে ঠেসে ধরল। কিছু করার আগেই, গায়ের জোরে মেয়েটার মুখ চেপে ধরল। তারপর দ্রুত নিজের কোমর থেকে টেনে বের করে আনল ছুরিটা। সেই মুহূর্তে ভীমা টের পেল, মেয়েটার মুখ চেপে ধরা হাতে মেয়েটা মৃদু



কামড় বসিয়েছে। অতি সামান্য কামড়, কিন্তু হঠাৎ জ্বলে উঠল জায়গাটা। ছুরি ধরা হাতটা যেন হঠাৎই ভারী হয়ে আসছে। ধরে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে। মাথার ভেতরটা পাক দিচ্ছে আর চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। যুবতীটাকে চেপে ধরে থাকা হাতের বাঁধন আলগা হয়ে এল। পরক্ষণেই মেয়েটা মল্লযুদ্ধের মোক্ষম একটা প্যাঁচে ভীমার ভারী শরীরটাকে মাটিতে চিত করে আছড়ে ফেলল। তরুণী চড়ে বসল ভীমার বুকের ওপর। হাত মুঠো করে একটা আঘাতে নাকটা থেঁতলে দিল ভীমার। ভীমার প্রায় অসাড় শরীরটার দিকে চেয়ে হেসে উঠল তরুণী। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের কাপড়ের ভাঁজ থেকে করে আনল ছোটো একটা বাঁশের টুকরো। সেটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে তিন বার 'ফুঁ' দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের করল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল পাঁচ-ছ-জন সৈনিক। হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘিরে ধরল ধরাশায়ী ভীমাকে। এদের মধ্যে একজন সেনাপতি কিথক। প্রহরীদের পেছন থেকে এতক্ষণে এগিয়ে এলেন আরও দু-জন। তাঁদের দেখে বাকি প্রত্যেকে করজোড়ে প্রণাম করল। জীবসিদ্ধির হাতে মশাল এবং তার সামনের জন স্বয়ং আচার্য চাণক্য। গণিকারূপী উল্লুপির সামনে এসে প্রশংসার সুরে আচার্য বললেন,

- সাধু মা! সাধু! এই অসম্ভব সাহসিকতার জন্যে মগধ তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে।

চাণক্য দৃষ্টি ঘোরালেন ধরাশায়ী ব্যক্তিটির দিকে। নিজের মনেই বললেন,

- এ-ই তবে আমাদের হত্যাকারী। হুমম। উল্লুপি, বেশি গভীরে কামড়াওনি তো? বেশি বিষে মৃত্যু হবে না আশা করি?

- না, গুরুদেব। ঠিক যেমন আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টা অবশ হয়ে থাকবে শরীর।

- হুমম। বেশ, বেশ।

১২.

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর রাজসভা। আজ সেখানে সব মন্ত্রী ও গণ্যমান্য রাজপুরুষ উপস্থিত। পাটলিপুত্রের দুঃস্বপ্নের ইতি হয়েছে। কয়েক মাস ধরে ঘটতে থাকা হত্যাকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত এই মুহূর্তে কারাগারে। বিষকন্যা উল্লুপি, সেনাপতি কিথক এবং সুসেন আজ সভার প্রধান অতিথি। আরও একজন আজ আমন্ত্রিত এই রাজসভায় সম্মানীয় অতিথি হিসেবে। মহামতি আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য, যাঁর বিচক্ষণতা আর অনুধাবন শক্তি ছাড়া কোনোভাবেই হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব ছিল না। তবে তিনি এখনও আসেননি। অন্য কেউ বিষয়টা বিশেষ প্রাধান্য না দিলেও, সম্রাট নিজে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। কারণ তিনি

গুরুদেবের স্বভাবের সঙ্গে বহু বছর ধরে পরিচিত। এই মানুষটা কোনোদিন, কোনো কাজে দেরি করেন না। চাণক্য নিজের শিষ্যদের বাল্যকাল থেকেই শিখিয়েছেন, 'যে সময়কে মাহাত্ম্য দেয়, ইতিহাস তাকেই মাহাত্ম্য দেয়।' জীবসিদ্ধিও এসে পৌঁছোয়নি। তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে সবাই।

সম্রাটের ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই সভাঘরে ঢুকলেন চাণক্য এবং সঙ্গে অবশ্যই ছায়াসঙ্গী জীবসিদ্ধি। যথারীতি তাঁকে দেখেই প্রত্যেক সভাসদ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্রাট নিজে সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে আচার্যকে প্রণাম জানালেন। সসম্মানে নিজের ডান পাশের খালি আসনে বসতে বললেন। জীবসিদ্ধিও নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসল। চাণক্যর অনুমতি নিয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে ইশারা করলেন। সভার সূচনা ঘোষণা করে বললেন,

- আপনারা সকলেই জানেন যে গত কয়েক মাস ধরে এই নগরের বেশ কিছু গণিকাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সুখবর এটাই যে, গতকাল রাতে সেই উন্মাদ হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই কাজ সম্ভব হয়েছে যেসব মানুষের সাহায্যে, সেই সম্মানীয় অতিথিরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। কোন উপায়ে এই উন্মাদ হত্যাকারীকে তাঁরা গ্রেফতার করলেন, আমি জানি সেই কাহিনি বিশদে শুনতে আমারই মতো আপনারা সকালেই ব্যগ্র। তাই আমরা তাঁদের মুখ থেকেই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছুক।

সভাসদরা সম্মতিক্রমে মাথা নাড়ালেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যর দিকে চাইলেন। চাণক্য সেনাপতি কিথকের দিকে ইশারা করে বললেন,

- এই হত্যাকাণ্ডর তদন্তে যিনি অগ্রপুরুষ, সেই সেনাপতি কিথক নিজেই ঘটনাক্রম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করুক।

কিথক মৃদু হেসে, আচার্যকে করজোড়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। জোর গলায় বলতে শুরু করলেন পুরো ঘটনা। প্রথম হত্যা থেকে শুরু করে, চাণক্যর তদন্ত কৌশল, উল্লুপির সাহসিকতা এবং সবশেষে হত্যাকারী ধরা পড়ার পুরো ঘটনা বিশদে ব্যাখ্যা করলেন। অতি মনোগ্রাহী ভঙ্গিতে তিনি সম্পূর্ণ কাহিনি উপস্থাপন করলেন। কথার শেষে সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে সাধুবাদ দিয়ে উঠলেন তাঁদের উদ্দেশে।

কিথক নিজের আসনে ফিরে আসতে, সম্রাট আবার উঠে দাঁড়িয়ে আজকের সভার ইতি এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করতেই যাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে চাণক্য নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন সভার সামনে। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চাণক্য মুখ খুললেন,

- আপনাদের সকলের থেকে আরও খানিকটা সময় আমি চেয়ে নেব। দয়া করে একটু ধৈর্য সহকারে শুনবেন। আপনাদের একটা কাহিনি বলব।

বাল্যকালে, আমাদের কুটিরের পাশে একটা বট গাছের তলায় এক উন্মাদ থাকত। সারাদিন নিজের মনেই কথা বলত এবং আমার মায়ের দানের অন্ন খেয়েই বেঁচে থাকত। সেই মানুষটা প্রতিদিন সকালে নদীর পাড় থেকে একটা করে জবা ফুল নিয়ে আসত। কিন্তু তা দিয়ে নিজে কিছুই করত না। ফেলে দিত জঙ্গলে। এটা তার নিত্যদিনের স্বভাব ছিল। আমার মনে আছে, একদিন রাত থেকেই মারাত্মক ঝড়-ঝঞ্ঝা চলছিল। ঝড়-বৃষ্টির দাপট থেকে বাঁচতে উন্মাদ নিজেও আমাদের আস্তাবলে আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে উঠে আমি এবং বাবা বুঝলাম আজ আর কোনোমতেই বাড়ির বাইরে পা দেয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির এইরকম রুদ্র রূপ সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু তখনই দেখতে পেলাম, সেই উন্মাদ মানুষটা নদীর পথে হাঁটা দিয়েছে। এই তীব্র দুর্যোগ উপেক্ষা করে সে চলেছে, তার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় একটা নিয়ম রক্ষা করতে। সেইদিন একটা কথা আমি বুঝেছিলাম। উন্মাদ ব্যক্তিরা তাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। তাদের স্বরচিত নিয়ম তাদের কাছে সর্বোচ্চ। প্রলয় এসে উপস্থিত হলেও তারা সেই কাজটা করবেই।

এইটুকু বলে থামলেন আচার্য। প্রত্যেকের মুখে হতভম্ব ভাব। এই কাহিনি এই মুহূর্তে সবাইকে শোনানোর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, সেটা কেউই আন্দাজ করতে পারছে না। শুধু সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর কপালে ভ্রূকুটি। তিনি জানেন যে আচার্য অর্বাচীন নন। ওঁর প্রতিটা কথার গুরুত্ব থাকে। চাণক্য আবার শুরু করলেন।

- এই গণিকাদের হত্যাকারী, ভীমা নামের ব্যক্তিটি, একজন উন্মাদ ব্যক্তি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তা সহজেই বোঝা যায়। নিজের বাল্যকালের আক্রোশ সে অন্যের ওপর চরিতার্থ করে। সম্পূর্ণভাবে বিকারগ্রস্ত সে। আর পাঁচটা উন্মাদের মতোই তারও শিকার নির্বাচনের এবং হত্যার ভঙ্গিতে কিছু বিশেষ নিয়ম ছিল। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে সে তার নিয়ম কেন ভাঙল?

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,

- আচার্য, কোন নিয়ম? দয়া করে বিশদে ব্যাখ্যা করুন।

- হুমম। সেনাপতি কিথকের মুখেই আপনারা শুনলেন যে হত্যাকারী ভীমা স্বীকার করেছে যে, সে সেই গণিকাদেরই হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে সে নিজের মা এবং স্ত্রীর ছায়া দেখত। তার মা এবং স্ত্রী, দু-জনেরই গায়ের রং ছিল তামাটে, কোঁচকানো কালো চুল এবং মাঝারি উচ্চতা। এই কারণে ভীমা বেছে বেছে অনেকটা সেইরকম দেখতে গণিকাদেরই হত্যা করত। প্রথম তিন জন গণিকার মৃতদেহ দেখেই প্রত্যেকের চেহারায় এই সাদৃশ্যগুলো আমার নজরে পড়েছিল। বিষকন্যাদের মধ্যে থেকে উল্লুপিকে নির্বাচন করার কারণও সেটাই। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, হত্যাকারীর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ

শিকার গণিকাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার। আঙুরী নামের সেই মৃতা মেয়েটা ছিল দীর্ঘাঙ্গী, চুল কোঁচকানো নয় এবং ফর্সা। অতএব আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে হঠাৎ এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী তার চিরাচরিত, স্বনির্মিত নিয়মের বিপরীতে গেল কেন? বিষয়টা কি রহস্যময় নয়?

১৩.

মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে শ্রোতাদের মধ্যে। কী বলতে চাইছেন মহামতি চাণক্য? সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হাত তুলে সবাইকে মৌন হওয়ার ইশারা করলেন। গুঞ্জন থামতে, চাণক্য আবার বললেন,

- হুমম। আমি প্রথম তিনটে মৃতদেহই দেখেছিলাম। তাই চতুর্থ হত্যার খবর যখন সুসেন আমায় দিল, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এবারেও একই চেহারাগত বৈশিষ্ট্য থাকবে মৃতার। আমার শিষ্য জীবসিদ্ধি এবং সুসেন অবশ্য আমার অত্যন্ত যুক্তিশীল প্রশ্নটাকে, আমার বার্ধক্যের চমক দেয়ার বৃথা চেষ্টা ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু যখন সুসেনের মুখে শুনলাম এবং স্বচক্ষে দেখলাম যে এইবার হত্যা হওয়া গণিকা সম্পূর্ণ আলাদা দেখতে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আরও একটা মারাত্মক ব্যতিক্রম হয়। আঙুরীর জরায়ু হত্যাকারী নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়নি। কাছের একটা জলাশয়ে ফেলে দেয় সেটা। এখানে তর্ক করা যেতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে হয়তো কোনো প্রহরী এসে পড়েছিল হত্যাকারীর কাছে। তাই সেটা ফেলে দিয়েছিল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু আমরা জেনেছি, যে ভীমা নিজে একজন মাংস বিক্রেতা হওয়ার কারণে সহজেই রক্তাক্ত পোশাক এবং জরায়ু সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারত। সে সঙ্গে একটা পশু-মাংস বোঝাই ঝোলা রাখত। তাতেই সেই জরায়ুটাও লুকিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। অতএব ভয় পেয়ে জরায়ু ফেলে দিয়েছে, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কথা থামাতেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সেই প্রশ্নটা করে ফেললেন যা এতক্ষণ সবার মনেই জেগেছে,

- আচার্য, আপনি বলতে চাইছেন চতুর্থ হত্যা অন্য কেউ করেছে?

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চাণক্য বললেন,

- একদম ঠিক ধরেছেন, সম্রাট। যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করলেই অনুমান করা যায় যে চতুর্থ গণিকার হত্যাকারী কোনো এক ভিন্ন ব্যক্তি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কে? কে সেই ব্যক্তি? এই প্রশ্নর উত্তরও যুক্তি দিয়ে ভাবলে সহজেই অনুমান করা সম্ভব। প্রথমত একটা প্রশ্ন থেকে যায়, যে আঙুরী কী কারণে সেই রাতে বের হল? সে জানত বিপদের কথা, তবুও কার আশ্বাসে সে নির্ভয় ছিল? নিঃসন্দেহে সে কোনো সামরিক পদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

আরও একটা ভাবনার বিষয় আছে। পর পর তিনটে হত্যা হওয়ার কারণে

পাহারা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রহর ও জায়গা ভাগাভাগি করে পাহারার ব্যবস্থা করা হয় স্বয়ং সম্রাটের নির্দেশে। অথচ তার মধ্যেও চতুর্থ হত্যা করতে হত্যাকারী সফল হয়। এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যদি না... যদি না প্রহর ভিত্তিক এবং এলাকাভিত্তিক পাহারা-সূচি আগেই হত্যাকারীর জানা থাকে। অর্থাৎ, হত্যাকারী আগে থেকেই জানত যে রাতের কোন সময়ে, কোন জায়গায় কোনো প্রহরী উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু সেটা তো অত্যন্ত গোপন খবর। প্রতি রাতের আলাদা পাহারা-সূচি তো সেনাপতি নিজে নির্ধারণ করেন প্রতি রাতে। সেটা সেনাপতি কিথক ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। আমার যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে, সেনাপতি কিথক?

সভাকক্ষে উপস্থিত প্রতিটা দৃষ্টি এই মুহূর্তে কিথকের ওপর নিবদ্ধ। কিথকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলেও, তিনি এখনও শান্ত বসে আছেন। ঠোঁটে জোর করে হাসি এনে তিনি বললেন,

- ক্ষমা করবেন, আচার্য। আপনি সম্রাটের পরমপূজ্য গুরু হতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে অতিরিক্ত ভেবে ফেলেছেন। নিজের কাল্পনিক কাহিনির ওপর নির্ভর করে আপনি কি আমায় হত্যাকারী প্রমাণ করতে চাইছেন? একটা বেশ্যাকে হত্যা করার, আমার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আর তা ছাড়া, আপনার হয়তো মনে নেই, যে, এই হত্যাকাণ্ডর তদন্তে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আপনার দরজায় স্বয়ং আমিই উপস্থিত হয়েছিলাম।

কঠিন স্বরে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- কোনো কিছুই আমার বিস্মরণ হয়নি, সেনাপতি। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আঙুরী নামের গণিকার হত্যার পেছনে কোনো গভীর রহস্য আছে। কিন্তু কী সেই রহস্য তা আন্দাজ করতে পারছিলাম না। সেই উত্তর খুঁজতেই আমি নিজে যাই আঙুরীর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তার কিছু নতুন পোশাক, গয়না এবং রুপোর মুদ্রা দেখে আন্দাজ করতে পারি যে, হঠাৎই কয়েক মাস ধরে তার অর্থলাভ হয়েছে। আর সেই অর্থর পরিমাণ অনেকটাই বেশি। পতিতাবৃত্তি করে সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন প্রায় অসম্ভব। আরও একটা বিষয় দেখে অবাক হই। এই মেয়েটার ঘরে দোয়াত-কলম রাখা। অর্থাৎ সে শিক্ষিত। সাধারণত রূপজীবীদের ক্ষেত্রে এটা অতি বিরল। সমস্ত রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় বিশেষ একটা জিনিসের দিকে আমার নজর পড়তেই। তার বাড়িতে আমি অনেকগুলো ফাঁপা মাদুলি পাই! সেইসময়ে আমার সঙ্গে উপস্থিত সুসেন সেগুলো দেখে একটা ঠিক মন্তব্য করেছিল যে, এই মাদুলিগুলোর সঙ্গে বাঁধা সুতোগুলো অত্যন্ত ছোটো। গলায় বাঁধার উপযুক্ত নয়। সম্ভবত হাতে বাঁধার। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সুসেন একটা ভুল করে। সেই সুতোগুলো অনেকটাই বেশি ছোটো ছিল। হাতের মাপেরও ছোটো। এই যে।

একটা আমি সঙ্গে এনেছি। অন্যরা এই জিনিস না জানলেও আমি নিশ্চিত যে সম্রাট এবং জীবসিদ্ধি, দু-জনেই এটা সহজেই চিনতে পারবে। গুপ্তচরবৃত্তিতে এই জিনিস বহু ব্যবহৃত। জীবসিদ্ধি, তুমি একবার সকলের জানার জন্যে বলে দাও দেখি এটা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- পায়রার গলায় বাঁধতে! মাদুলির মধ্যে গুপ্তসংবাদ ভরে, মোম গলিয়ে মুখ আটকে দেয়া হয়। তারপর প্রশিক্ষিত পাখির গলায় বেঁধে উড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা নিজেরাও এইভাবে গুপ্তচিঠি পাঠিয়ে থাকি।

- হুমম। ঠিক তাই। কয়েক সপ্তাহ আগেই সম্রাটের সভায় এসে জানতে পেরেছিলাম, যে, রাজ্যের গোপন সামরিক তথ্য কোনো এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দ্বারা পাচার হচ্ছে। এই মাদুলি দেখেই সত্যটা অনুমান করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। আমার অনুমানে ভুল হলে সেনাপতি কিথক শুধরে দেবেন আশা করি। আঙুরী কোনো সাধারণ গণিকা ছিল না। সে ছিল শত্রু দেশের গুপ্তচর। আমাদের সেনাপতি কিথককে আঙুরী ফাঁসায় নিজের রূপ ও যৌবনের জালে। তার বাড়িতে গোপনে সেনাপতি কিথকের যাতায়াত শুরু হয়। সুরা ও যৌনতার নেশায় সেনাপতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য এই মেয়েটাকে দিতে থাকে। মেয়েটা প্রশিক্ষিত পায়রা ব্যবহার করে সেই তথ্য শত্রুর কাছে পৌঁছে দিত। কিন্তু সাম্রাজ্যের গুপ্তচররা জানতে পারল যে খবর পাচার হচ্ছে। সম্রাটের কানে সেই খবর এসে পৌঁছোতেই সম্রাট আদেশ দিলেন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে। সেনাপতি কিথক বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সময় আসন্ন। আমাদের গুপ্তচররা আঙুরীর খোঁজ পাবেই। আর তারপরই, কান টানলেই মাথা আসবে। অতএব নিজেকে বাঁচাতে হলে, আঙুরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়াটা সেনাপতির জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এইটুকু বলে চাণক্য আবার সেনাপতির দিকে ফিরলেন। এইবার আর তিনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কাঠ হয়ে বসে আছেন তিনি নিজের আসনে। তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চাণক্য আবার কথা শুরু করলেন,

- কাকতালীয়ভাবে, ঠিক এই সময়েই, পাটলিপুত্রতে দেখা দিল আর এক সমস্যা। একজন উন্মাদ হত্যাকারী যে কিনা খুঁজে খুঁজে পতিতাদেরই হত্যা করে। কিথক হাতে চাঁদ পেল। এই তো সুযোগ। হত্যাকারীর পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি আঙুরিকেও হত্যা করে দেয়া যায়, তবে দোষ পড়বে উন্মাদ হত্যাকারীর ওপর। সেনাপতির ওপর সন্দেহ যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আর যদি সেই হত্যাকারী তারপর ধরা পড়ে যায়, তবে তো সব সমস্যার সমাধান। তাকে ফাঁসিতে চড়িয়ে সম্পূর্ন ঘটনার ইতি টেনে দেয়া হবে। সেনাপতির নাগাল কেউ কোনোদিন পাবে না। যে অপরাধের সমাধান হয়ে গেছে এবং

অপরাধী শাস্তি পেয়ে গেছে, সেই অপরাধ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না। তাই এই হত্যাকারীকে ধরতে কিথক নিজে আসে আমার কাছে। কারণ হত্যাকারী ধরা পড়লেই তাঁর সুবিধা। সে তিনটে করেছে না চারটে, সেটা একজন অপরাধীর কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। আর এই ক্ষেত্রে তো আরওই অনুকূল পরিস্থিতি, যেখানে অপরাধী নিজেই উন্মাদ। অতএব নিজের অপরাধটা অতি সহজে উন্মাদ হত্যাকারীর ওপর দিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু আমি তবু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে আমার সন্দেহ ঠিক। তাই ফাঁদ পাতলাম সেনাপতির জন্য। ভীমার খোঁজ পাওয়ার পরে সেনাপতি যখন আমার কুটিরে আসেন তাঁর সামনে অবহেলা ভরে, কথার ছলে, আমি 'ছায়া' এবং 'পীতাম্বরি' নাম দুটো উচ্চারণ করি। এগুলো প্রথম দু-জন মৃতা গণিকার নাম। যথারীতি সেনাপতি নাম দুটো চিনতে পারেন না। সেটাই স্বাভাবিক। মৃতা গণিকাদের নাম স্বয়ং সেনাপতির মনে না থাকারই কথা। কিন্তু তারপরেই নিতান্ত কথার ছলে আমি 'আঙুরী' নামটা উচ্চারণ করি। সেনাপতি অসাবধানতার বশে, আমার ফাঁদে পা দিলেন। এবং এই ক্ষেত্রে সেনাপতি কিন্তু নামটা চিনতে পারলেন। এটা প্রমাণ করে যে এই চতুর্থ গণিকা কিথকের পূর্বপরিচিতা ছিল। কি সেনাপতি? এখনও অস্বীকার করবেন?

কথা শেষ হতেই কিথক হিংস্র হয়ে উঠলেন। তাঁর মিথ্যা শীতলতার মুখোশ খসে পড়ল। অশ্রাব্য কটু শব্দ বলে, কোমর থেকে তলোয়ার বের করে চাণক্যকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তিনি খেয়ালই করেননি যে বহু পূর্বেই ওঁর দু-পাশে, দু-জন সৈনিক এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তলোয়ার পর্যন্ত হাত পৌঁছোনোর আগেই তাঁকে চেপে ধরল দু-জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও দু-জন সৈনিক তাঁকে কাবু করল।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন,

- রাজদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং হত্যার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করা হল, সেনাপতি। সৈনিকরা, নিয়ে যাও একে এবং বন্দি করো কারাগারে।

কিথককে নিয়ে চলে যাওয়ার পর চাণক্য সম্রাটের দিকে ফিরলেন। বললেন,

- সম্রাট, আমাদের দায়িত্ব কিন্তু শেষ হয়নি। যাতে ভবিষ্যতে আরও একটা ভীমার জন্ম না হয় তার দায়িত্ব আমাদের। রূপজীবীদের সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে সমাজের এই নারীরাও মাথা উঁচু করে সসম্মানে বাঁচতে পারে। সমাজের বুকে যেন আরও একটা বিকৃত, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীমার জন্ম না হয়, সম্রাট। ভীমা আমার ব্যর্থতা, আপনার ব্যর্থতা, এই সমাজ ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতীক।

করজোড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম জানালেন আচার্যকে। বললেন,

- আপনার দেখানো পথেই এই দেশের উন্নতি সাধন হবে, গুরুদেব।

উপসংহার:

জীবসিদ্ধি আর চাণক্য বসে আছেন নিজের কুটিরে। জীবসিদ্ধি অনেকক্ষণ থেকে কৌতূহল দমন করে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছেন আচার্য। শিষ্যর এনে দেয়া নতুন মধুর পাত্রর ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন তিনি,

- জীবসিদ্ধি, মনে যা প্রশ্ন আসছে, তা করে ফেলো।

খানিক চুপ থেকে জীবসিদ্ধি বলল,

- গুরুদেব, আজ রাজমহলে গিয়েছিলাম সম্রাটের কুশল জানতে। কথাপ্রসঙ্গে জানতে চাইলাম হত্যাকারী ভীমার কী হল। সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে সকলে এতটাই স্তম্ভিত যে ভীমার ব্যাপারটা সভাসদ ভুলে গেছে। প্রশ্ন করতেই চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'ভাই, অন্য কেউ হলে বলতাম তার মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তোমায় মিথ্যা বলব না। ভীমার বিষয়ে কোনো কথা বলার অনুমতি আমার নেই।'

- হুমম। তো?

- আচার্য, সমগ্র আর্যাবর্তর সম্রাটকে অনুমতি দেয়ার মতো একজনই ব্যক্তি এই মাটিতে আছে। এইটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আপনাকেই তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, ভীমার কী হল?

গম্ভীর মুখে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- একটা দেশ শাসন করতে দু-ধরনের নীতির প্রয়োজন হয়। সাধারণ নীতি, যা সবার সামনে বলা হয়। আর দ্বিতীয় হল গুপ্তনীতি। দ্বিতীয় নীতিগুলোর কথা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জানে। কারণ সবসময় সেই নীতি সুখকর হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনৈতিক হয়ে থাকে। আমার আদেশে ভীমাকে জীবিত রাখা হয়েছে। তাকে এক গোপন জায়গায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তার বিকার, তার ক্রোধকে ঠিক উপায়ে ব্যবহার করলে আমাদের রাজ্য এক অসাধারণ হিংস্র অস্ত্র পাবে। গুপ্তহত্যার কাজে সে হবে অপরিহার্য।

জীবসিদ্ধি অবাক দৃষ্টিতে তার আচার্যর দিকে চেয়ে রইল। আচার্য উত্তর দিলেন,

- অবাক হোয়ো না। মনে রেখো আমি শুধুই চাণক পুত্র চাণক্য নই। আমায় আরও একটা নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, 'কৌটিল্য'।

References:

1.Vishkanya : The Poisonous Celibate, prof (Dr) Veenus Jain, CASIRJ, Volume-8, Issue-4, 2017.

2. What is Vishkanya, himalayavedicworld.com

কনক-শাস্ত্র

উপক্রম:

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতে আছে। গভীর রাত। বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত। গাছের পাতা থেকে এখনও চুঁইয়ে পড়ছে জল। আকাশ আবার ধীরে ধীরে মেঘে ঢাকা পড়ছে, আবার বৃষ্টি আসবে, নাঃ এইবার একটা ঝড় আসবে হয়তো। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। একটা নয়, অন্তত দুটো ঘোড়া তাল মিলিয়ে পাশাপাশি ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। একটু বাদেই দেখা গেল ঘোড়ার গাড়িটা। সামনে দুটো কালো ঘোড়া দ্রুতগতিতে টেনে নিয়ে চলেছে গাড়িটাকে। সাধারণ মালবাহী ঘোড়ার গাড়ি। একজন সহিস বসে চাবুক চালাচ্ছে।

এই গাড়ির মাথায় একজন প্রহরী বসে আছে। চারিদিকে তার সতর্ক নজর। গাড়ির গায়ে কোনোরকম নিশান বা ধ্বজা না থাকায় এক পলকে মনে হবে এটা সাধারণ কোনো ব্যবসায়ীর পণ্যবাহী গাড়ি। কিন্তু এই গাড়ির গন্তব্য মগধ। মগধের রাজকোষাগার। এই গাড়ির ভেতর চার জন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে, একটা সিন্দুক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মগধে। এই সিন্দুকের ভেতর রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা। আর্যাবর্তর একটা বড়ো অংশের থেকে রাজকর হিসেবে নেয়া অর্থ, স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা হয় পরিবহণের সুবিধার্থে। গোপনীয়তার এবং সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গাড়িতে কোনোরকম রাজমোহর বা রাজধ্বজা লাগানো হয়নি। এই গাড়িগুলো প্রতিবার আসে আলাদা আলাদা পথ ধরে। এই নির্দিষ্ট পথ কেউ জানে না, এমনকী প্রহরীরাও আগে থেকে জানতে পারে না। পথের মাঝে মাঝে তারা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে, দূত মারফত তাদের পরবর্তী পথের নির্দেশ আসে। এই সবই করার কারণ সুরক্ষা, যাতে দস্যুরা নির্দিষ্ট পথ অনুমান করতে না পারে।

মগধের রাজপথে উঠতে এখনও এক প্রহর লাগবে। পুরো পথের মধ্যে এইটুকু অংশ বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এর কারণ, যে পথই

নেয়া হোক, এইটুকু অংশ সব ক্ষেত্রে অতিক্রম করতেই হয়। দক্ষিণ থেকে আসা প্রতিটা যানবাহনকে এইটুকু পথ অতিক্রম করতেই হবে। তার ভেতর এই বিশেষ অংশ আরও বেশি নিস্তব্ধ এবং সড়কের দু-দিকে গভীর জঙ্গল।

তীব্র গতিতে ছুটে আসছিল ঘোড়া দুটো। সহিস গতি বাড়াতে ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। অতএব গতি বড্ড বেশি ছিল। আর সেটাই কাল হল। হঠাৎ পায়ের কাছে আচমকা কোনো বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘোড়া দুটো। ছিটকে সামনের দিকে গিয়ে পড়ল সহিস আর ছাদে বসা প্রহরী। প্রচণ্ড আঘাতে তারা জ্ঞান হারাল। গাড়িটা ঘোড়া দুটোর থেকে আলাদা হয়ে একদিকে কাত হয়ে উলটে পড়েছে। ঘোড়াগুলো ভূপাতিত হয়ে যন্ত্রণা ভরা হ্রেষাধ্বনি করছে। তাদের সামনের দিকের পাগুলো কেটে বসে গেছে কয়েকটা শক্ত দড়ির দাগ। আড়াআড়ি ভাবে রাস্তার দু-দিকের দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল সেগুলো। তাতে কয়লার কালি ঘষে কালো করা হয়েছে যাতে রাতের আঁধারে নজর না পড়ে কোনোভাবেই। দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসা ঘোড়ার গাড়ির পক্ষে অবশ্য দেখতে পেলেও বিশেষ লাভ হত না।

ভেতরে সৈনিকদের সামলাতে কিছুটা সময় লাগল। কাত হয়ে থাকা গাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক এক করে চার জন। তারা এখনও এই ভ্রমে আছে যে এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। অসতর্কভাবেই তারা সামনে দিকে পড়ে থাকা সহিসের দিকে এগোতে গেল। আর ঠিক তখনই, জঙ্গলের থেকে ছুটে এসে একটা তির বিদ্ধ করল একজনের গলা। লুটিয়ে পড়ল প্রহরীটি। পরমুহূর্তে আরও একটা তির এসে লাগল আরও একজনের উন্মুক্ত হাতে। আরও একটা তির এসে বিদ্ধ করল তৃতীয়জনের একটা চোখ। সম্ভবত এই তিরগুলোর ফলায় কোনো তীব্র মারণ বিষ ছিল, যে কারণে তিনটে লোক ঢলে পড়ল বৃষ্টিভেজা মাটিতে। শেষজন কোমর থেকে তলোয়ার বের করতে পারল বটে, তবে লাভ হল না। আরও একটা তির এসে তাকেও মুহূর্তে ধরাশায়ী করল।

এইবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল তিনজন লোক। কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা। শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের চোখ জোড়া, যা শ্বাপদের মতো অন্ধকারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। দু-জনের হাতে তলোয়ার আর একজনের হাতে একটা ধনু। একজন তলোয়ারধারী এগিয়ে গেল সামনে পড়ে থাকা রক্তাক্ত সহিসের দিকে। মাঝপথে একবার তলোয়ার চালিয়ে প্রায় অদৃশ্য দড়িগুলো কেটে ফেলল। লোকগুলো দ্রুত একে একে পাঁচ জন প্রহরী ও সহিসের সামনে গেল এবং তলোয়ার বসিয়ে দিল প্রত্যেকের বুকে। মৃত বা জীবিত নির্বিশেষে প্রত্যেকের বুকে অস্ত্র ঢুকিয়ে আবার বের করে আনা হল। ফিরে গেল সেগুলো কোমরবন্ধে বাঁধা খাপে।

অতি দ্রুত তারা বের করে আনল গাড়ির ভেতরের সিন্দুকটা। একজন



এগিয়ে হাঁটা দিল জঙ্গলের দিকে। আর তার পিছু পিছু দু-জনে মিলে ভারী সিন্দুক টেনে নিয়ে চলল। কয়েক মুহূর্ত পরেই লোকগুলো মিলিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরের অন্ধকারে।

১.

তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়। সুনাভ উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে। জানলার বাইরে বার বার চেয়ে আকাশের তারার স্থিতি দেখে সময়ের আভাস পাচ্ছে। রাত তৃতীয় প্রহর শুরু হতে আর দেরি নেই। এতক্ষণে তো ছিত্রবানের এসে যাওয়া উচিত। কই সে? অধৈর্য হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে সে।

তখনই ঘরের দরজায় তিন বার মৃদু টোকার আওয়াজ শোনা যায়। দ্রুত গিয়ে দরজা খোলে সুনাভ। একটা কালো কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছিত্রবান। তাকে দেখে একটু বিরক্ত হয়েই সুনাভ বলে,

- ওহে, তুমি বড়োই দেরি করো কাজে। তুমি কি জানো না যে ঠিক তৃতীয় প্রহরের শুরুতে আমাদের কাজ করতে না পারলে লাভ নেই!

- বন্ধু, বৃথাই তুমি অস্থির হও। এখনও ঢের সময় আছে হাতে। তা, তোমায় যা যা জিনিস আনতে বলেছিল তা জোগাড় করেছ?

- হ্যাঁ, করেছি। আর তুমি?

- আমিও আমার ভাগের সব এনেছি সঙ্গেই। চলো, চলো। কুমার আমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে।

নিজের আশ্রমের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুনাভ। তার সঙ্গে ছিত্রবান। আজ অমাবস্যা, তাই গভীর অন্ধকার আজকের রাত। মশালের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলে দু-জনে। খোলা দালানে বেরিয়ে এসে দু-জনেই আশেপাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। নাহ্, কেউ নেই আশেপাশে। থাকার কথাও নয় কারুর এই অসময়ে। শুধু নিস্তব্ধ রাতের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে 'জ্ঞান স্তূপ'। পাথরের এই বিরাট স্তূপটা জ্ঞানের প্রতীক। তার বিশাল উচ্চতা বার বার মনে করায় যে জ্ঞান-ই হল এই সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু। জ্ঞানী কোনোদিন মাথা নত করে না। ঠিক এই স্তূপের মতোই সেও সবসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেইদিকে তাকিয়ে সুনাভর হৃদয়ে সামান্য ভয় লাগে। তারা যা করেছে সেটা তো অপরাধ। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তার মনে হয় বিশাল স্তূপ যেন তাদের দিকে চেয়ে অসন্তোষের দৃষ্টি হেনে আছে। সুপ্ত অনুশোচনা হয় তার। পুষ্পলের কথায় রাজি না হলেই মনে হয় ভালো হত। আচার্য মহিষাশ্ব বরাবরই বলেন যে, 'যা তোমার বুদ্ধি তথা বিচারের বাইরে, সেই জিনিসকে বিরক্ত না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।' কিন্তু আজ তারা ঠিক সেটাই করতে চলেছে।

দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে তারা লাল পাথরের মেঝে পার হতে থাকে। পায়ের তলার পাথর ঠান্ডা। অথচ সূর্যের তাপে দিনের বেশিরভাগ সময়েই তা তেতে থাকে। চলাই মুশকিল হয়ে যায় এর ওপর দিয়ে। আকাশ এতক্ষণ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু এখন ঈশান কোণে একটা কালো মেঘ দেখা দিচ্ছে। ঠিক যেন কোনো মহাদানব জেগে উঠছে ওদিক থেকে। যেন আসন্ন সর্বনাশের অশুভ ইঙ্গিতবাহী হয়ে জমাট বাঁধছে এই কালো মেঘ।

দু-মাস আগের কথা মনে পড়ছে সুনাভর। পুষ্পল তাদের কাছে প্রথম কথাটা বলেছিল। সুনাভ, ছিত্রবান, পুষ্পল এবং রাজকুমার সুভাষ, এই চার জন পরম বন্ধু। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বর্ষের ছাত্র হলেও, নিজেদের

সামাজিক এবং আর্থিক বিভেদ উপেক্ষা করেও এই কিশোরদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। চার জনই আচার্য মহিষাম্বর আশ্রমে 'ইন্দ্রজাল বিদ্যা'-র ছাত্র। গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক এবং তন্ত্রমন্ত্রে এই চার জনেরই প্রবল বিশ্বাস। কিন্তু তক্ষশিলা এসে তারা কিছুটা হতাশ হয়েছে। কারণ এখানে এসে তারা জেনেছে ইন্দ্রজাল আসলে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষের মনে মায়া বা ভ্রম সৃষ্টি করাই ইন্দ্রজাল।

কিন্তু তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে এর বাইরেও কিছু আছে। সবটাই আয়না আর ধোঁয়া নয়। তাই পুষ্পল যেদিন তাদের কাছে এসে সেই নামহীন পুথির কথা বলে, তারা প্রত্যেকেই যারপরনাই রোমাঞ্চিত হয়। পুষ্পল এসে তাদের জানায় যে আজ গ্রন্থাগারে তার কাজের দায়িত্ব ছিল আর সেইসময়েই সে গ্রন্থাগারের একটা গোপন অংশে একটা নামহীন পুথি পেয়েছে। পুথিটা বেশ প্রাচীন, প্রথমদিকে কয়েকটা পাতা না থাকায় সেটার নাম বা লেখকের নাম আর জানা সম্ভব নয়। কিন্তু যেটুকু সে পড়েছে তাতে বোঝা যায় যে এই পুথিতে প্রেতদের নিজের বশে আনার উপায় লেখা রয়েছে! ব্যাপারটা শুনে কেউই প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তারা ভেবেছিল তাদের বন্ধু তাদের সঙ্গে কৌতুক করছে। কিন্তু চার জনেই যখন গ্রন্থাগারে গিয়ে সেই পুথিটা দেখল তখন তাদের মনে আর সংশয় রইল না। সত্যিই এই বইয়ের পাতায় তন্ত্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে যার দ্বারা প্রেতলোকের দরজা খুলে যায় এবং সেই প্রেতদের বশ করে যেকোনো মানুষ হয়ে উঠতে পারে অপার শক্তির মালিক।

এরপর তারা লুকিয়ে এই বইটা নিয়ে আসে নিজেদের সঙ্গে। সেটা কোনো সমস্যার বিষয় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে কোনোদিন পাহারা থাকে না। এখানে একটা প্রচলিত কথা আছে - 'যারা চুরি করে, তারা কখনো বই পড়ে না। আর যারা বই পড়ে, তারা কখনোই চুরি করে না।' বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা তার ছাত্রদের জন্যে সবসময় খোলা রাখাই এখানকার নিয়ম।

তারা গত দু-মাস এই পুথি পড়েছে। কিন্তু তার আচার ছিল বড়োই ভয়ংকর। তারা বহুবার ভেবেছে যে এই কাজ তারা করবে না। কিন্তু এই বিষয়ে কাজটা করে দেখতে সবচেয়ে উৎসাহী ছিল কুমার সুভাষ নিজেই। বয়সে চার জনের মধ্যে সে-ই কনিষ্ঠ। তাই তার মধ্যে বালকের মতো উৎসাহও বেশি। তার উৎসাহেই সমস্ত পূর্ব আচার তারা তিথি এবং সময় মেনে সম্পন্ন করেছে। আর আজ সেই দিন। আজ প্রধান কাজ সম্পন্ন করার উৎকৃষ্ট সময়। সব ব্যবস্থা করেছে তারা। কুমার নিজেই বেশিরভাগ জিনিস জোগাড় করেছে বেশ কিছু রুপোর মুদ্রা খরচ করে। বাকি সাধারণ জিনিসপত্র তারা নিজেরাই এনেছে। সেই বই অনুযায়ী এই ক্রিয়া করতে যে নক্ষত্রের অবস্থান প্রয়োজন, আজ রাত তৃতীয় প্রহরের শুরুতে অনেকটা সে রকমই

থাকবে। তাই তারা সবাই ঠিক করেছে আজ রাতেই তারা গোপনে এই তন্ত্রক্রিয়া করে দেখবে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখল কুমার আর পুষ্পল তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আয়োজন প্রায় করে ফেলেছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এইদিকে এমনিতেই লোক চলাচল কম, তার ওপর এই অসময়ে কারুর আসার প্রশ্নই ওঠে না। তাই অনেক ভেবে তারা এই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছে তাদের আজকের কাজের জন্যে। কুমার তাদের দেখেই তাড়া দিল,

- তোমরা সবেতেই বড্ড দেরি কর। দেখো, আমি আর পুষ্পল কিন্তু সব সাজিয়ে ফেলেছি। শুধু তোমাদের আনা জিনিসগুলো বাকি।

পুষ্পল বলে,

- সময় প্রায় আসন্ন। দেখি, দেখি। কী কী আনলে দেখি। কিছু বাকি থেকে যায়নি তো?

দু-জনেই মাটিতে বসে পড়ে তাদের কাঁধের কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা একটা করে জিনিস সাজিয়ে রাখতে থাকে।

চারটে প্রদীপ, সলতে, তেল, কুমকুম, কর্পূর, ধুনি, ভোরের জমা করা শিশির, মাথার চুল, কাকের মৃতদেহ, কয়েকটা মাটির সরা, তামার পাত্র, মোরগের পা, ধানের কুশ ইত্যাদি। এ ছাড়াও যেসব অদ্ভুত জিনিসের কথা লেখা ছিল সেগুলো মুদ্রা খরচা করে বাইরে থেকে আনতে হয়েছে। কুমিরের দাঁত থেকে শেয়ালের রক্ত পর্যন্ত বহু অদ্ভুত জিনিসের কথা এই পুথিতে লেখা আছে। সবই কুমার সুভাষ তার প্রতিপত্তি খাটিয়ে জোগাড় করেছে। এইবার শুধু শুরু করার অপেক্ষা। একটা বড়ো পাত্রে আগুন জ্বালতে জ্বালতে ছিত্রবান বলে উঠল,

- তোমার আজ একটু অসুবিধা হবে বটে কুমার। এই কারণেই তোমায় বলেছিলাম যে তুমি এর ভেতর থেকো না।

- বলো কী হে, ছিত্রবান? এই সামান্য কারণে এমন সুযোগ আমি হেলায় হারাব? কখনো নয়। এত বড়ো আচার সম্পন্ন করে শেষে এসে পিছিয়ে যাব? তা হয় না।

এই কথাটা কুমারকে বলার কারণ হল তার ধোঁয়া এবং ধুলো সহ্য হয় না। ধুলো আর ধোঁয়া তার নাকে ঢুকলেই তার কাশি শুরু হয় আর চোখ নাক দিয়ে জল বেরোতে থাকে। তবু আজ তার উৎসাহে ভাটা নেই। সে আজ একটু কষ্ট সয়ে নেবে না-হয়। তবে এই কাজে ঝুঁকি তো বাকি তিন জনেরও আছে। আজ যদি তারা ধরা পড়ে, তবে কুমারের কথা বলা যায় না, হয়তো সে তার বাবার সুনামে বহিষ্কৃত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু বাকি তিন জন মোটেই রাজবংশের সন্তান নয়। অতএব, তাদের কপালে নিশ্চিত বহিষ্কার লেখা আছে। এত কিছুর পরেও তারা কাজ শুরু করল ঠিক

যখন মেঘলা আকাশে নক্ষত্রর অধিষ্ঠান জানান দিল তৃতীয় প্রহর শুরু হওয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে কাছেই কোথাও প্রবল জোরে বজ্রপাত হল। কালো মেঘ ধীরে ধীরে সারা আকাশকে নিজের গ্রাসে এনেছে।

একটা বড়ো পাত্রে চন্দন কাঠের আগুন জ্বালিয়ে চার জন বসেছে চারদিকে। ধুনুচিতে ধুনি আর কর্পূর জ্বালা হয়েছে। প্রদীপের হালকা আলোয় আর মিষ্টি ধোঁয়ায় এক অদ্ভুত আধিভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চার জন নিয়মমতো মন্ত্রপাঠ করছে আর মাঝে মাঝেই কিছু কিছু জিনিস বড়ো চন্দন কাঠের আগুনে আহুতি দিচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়নি কিন্তু ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে। তন্ত্রক্রিয়া যতই এগোতে থাকে ততই, কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে সুনাভর। তার মনে হতে থাকে যে আশেপাশে কিছু একটা অশুভ বলয় যেন তাদের ঘিরে ধরছে। প্রতিটা উচ্চারিত মন্ত্র এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা প্রতিটা আহুতির সঙ্গেসঙ্গেই তার মনে হল সেই অশুভ বলয়টা ছোটো হয়ে আসছে। মাঝে বন্দি হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে তারা চার জন।

একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল সুনাভ। আগুনের আলোয় তার মনে হল যে ছিত্রবান আর পুষ্পলের মুখেও ভয়ের কালো ছায়া দেখছে। তারাও ঠিক সুনাভর মতোই ভীত। তবে কুমার সুভাষের চোখে ভয় নেই। তাতে এখনও কৌতূহল। তবে ধোঁয়াতে মাঝে মাঝেই তার কাশি উঠছে আর চোখ মুছছে। সুনাভ হঠাৎই একটা 'ধুক-পুক' শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল যে এটা তার নিজের হৃদয়ের শব্দ, যা এখন প্রবল জোরে চলছে। অস্থির, অস্বস্তি হচ্ছে তার। তবে এইসবের ওপর যেটা হচ্ছে, সেটা হল ভয়! এরকম ভয় কোনোদিন আগে পায়নি সুনাভ। বুকের ভেতর চেপে বসছে কোনো একটা অজানা ভয়। এইবার কিন্তু সকলেরই কম-বেশি অস্বস্তি হতে শুরু করেছে। ভয় করছে সকলের!

হঠাৎই সুনাভ টের পেল তার ঘাড়ে কেউ নিশ্বাস ফেলছে। কেউ একজন তার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না সুনাভ। সে বুঝতে পারছে না ঘুরে কাকে দেখবে। ভয়ংকর বিকৃত মুখটা। কিন্তু এরপরই তার চোখ গেল বাকিদের দিকে। স্পষ্ট দেখতে পেল তাদের প্রত্যেকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কালো, দীর্ঘ কয়েকটা ছায়ামূর্তি। তাদের চোখ গরম কয়লার মতো লাল হয়ে জ্বলছে ধিকিধিকি। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো প্রেতমূর্তি, এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। শুধু সে একা নয়, বাকিরাও দেখতে পেয়েছে এই প্রেতদের! তাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। সুনাভর হৃদয় প্রায় ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আতঙ্ক! প্রচণ্ড আতঙ্ক তাদের সকলকে চেপে ধরছে। চিৎকার করতে যায় সুনাভ, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারে



না। কেউ যেন তার গলা চেপে ধরছে। বাকিরাও মুখ খুলে রয়েছে কিন্তু আওয়াজ বের হচ্ছে না। শুধু চিৎকার করতে পারে কুমার! তার গলা থেকে তীব্র আতঙ্ক মাখা আর্তনাদ খানখান করে দেয় রাতের পরিবেশ। আর তখনই একদম কাছেই কোথাও আরও একবার বজ্রপাত হয়।

২.

মগধ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর রাজসভা। বিশাল বড়ো এই ঘরে একসঙ্গে প্রায় এক-শো মানুষ একত্র হতে পারে। যদিও এই মুহূর্তে জনা বিশ পঁচিশ মানুষ উপস্থিত। লাল গালিচা এবং বেশ কিছু শ্বেতপাথরের অপূর্ব মূর্তি সভাঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। ছাদের মাঝে আছে একটা সুবিশাল ঝাড়বাতি। যদিও এখন দিনের আলো থাকায় তা জ্বলছে না। সভার একদম শেষ মাথায় উঁচু একটা বেদির ওপর, রত্নখচিত একটা সোনার সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এই মুহূর্তে তিনি তাকিয়ে আছেন সভার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা দু-জন ব্যক্তির দিকে। একজন দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় অল্প চুল, ছোটো ছোটো চোখ মেলে চেয়ে আছে সম্রাটের দিকে। আর দ্বিতীয়জন মোটা, উচ্চতায় মাঝারি, মাথা ভরতি সাদা-কালো চুল। এই মুহূর্তে দু-জনের বিচার চলছে। বিচার চলছে বললে ভুল হবে, বিচার আগেই হয়ে গেছে। একটা দোকানে এই দু-জনই কর্মচারী হিসেবে কাজ করত। কিন্তু একটা মূল্যবান জিনিস সেখান থেকে চুরি যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ন্যায়রক্ষী অধ্যক্ষ আগেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এই ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সম্রাটের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। অতএব এখন তারা রাজসভায়।

অমাত্য কৃষ্ণনাথ এই সামান্য বিষয় নিয়ে রাজকার্যে বাধা পড়াটা পছন্দ করছেন না। তাই ব্যাপারটা সহজেই শেষ করতে তৎপর। তিনি বলে চলেছেন,

- দোকানের মালিক এই দুই কর্মচারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করেছে। রুপোর একটা মূল্যবান মূর্তি সেখানে ওপরের তাকে রাখা ছিল। সকালে তিনি দোকানে এসে দেখেন যে সেটা নেই। সৈনিকদের খবর দিলে তারা তদন্ত শুরু করে। মূর্তিটা ছিল একটা উঁচু দেরাজে। তদন্তকারী প্রধান সৈনিক সেখানে গিয়ে দেখে ঠিক সেই দেরাজের নীচে এই কাঠের চারপায়া রাখা। এর থেকেই তারা অনুমান করে যে চোরের উচ্চতা নিশ্চয়ই বেশি নয়। ওই চারপায়ায় চড়ে তবে মূর্তির নাগাল পেয়েছিল। আর সেই হিসেবেই তারা এই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে। তার বাড়িতে তল্লাশি চালালে মূর্তিটা তার ঝোলায় পাওয়া যায়। সেই ঝোলাটা নিয়েই যে সে রোজ কাজের জায়গায় যায়, সেটা সে নিজেই স্বীকার করেছে।

কাঠের পুরোনো একটা ছোটো চারপায়া সভায় আনা হয়েছে প্রমাণ হিসেবে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত একবার সেটার দিকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অমাত্য বলে চলেছেন,

- অতএব, আমি সম্রাটের কাছে আর্জি করছি দোষীর সাজা বহাল রেখে আমরা সভা শেষ করি।

- আমি চুরি করিনি, সম্রাট! আমি সত্যি জানি না ওই মূর্তি কীভাবে...

- অনুমতি না পেলে কথা বলবে না!

ভয়ে চুপ করে যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি। চন্দ্রগুপ্ত এইবার অমাত্যর দিকে ফিরে বলেন,

- আপনি তাহলে বলছেন এই ব্যক্তিই চোর?

- অবশ্যই, সম্রাট।

- আমি দ্বিমত পোষণ করি।

থতোমতো খেয়ে গেছেন অমাত্য কৃষ্ণনাথ। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন সেইসময়েই একজন সৈনিক এসে সম্রাটের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলল:

- সম্রাটের জয় হোক। আচার্য চাণক্য সভায় আসছেন।

চন্দ্রগুপ্ত সামান্য ঘাড় নেড়ে তাকে বিদায় দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সভায় কাঠের খড়মের শব্দ ভেসে এল। গেরুয়া বেশধারী এক ব্রাহ্মণ প্রবেশ করলেন। কপালে ত্রিবলী টিকা, ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি, কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা। মুখে শান্ত সৌম্য ভাব, তবে চোখের তারা দুটো দ্যুতিময়, তাতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁকে দেখে সভার প্রত্যেকে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং সম্রাট। কারণ এই ব্যক্তি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর আচার্য, বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। অনেকের মতে তিনিই আর্যাবর্তের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ। সম্ভবত স্বয়ং সম্রাটের চেয়েও তাঁর প্রভাব বেশি এই দেশে।

সম্রাট করজোড়ে বললেন,

- প্রণাম, গুরুদেব। স্বাগত।

- হুম। আয়ুষ্মান ভবঃ, সম্রাট।

সম্রাটের পাশের আসনটা তাঁর জন্যে বরাদ্দ থাকে। যদিও তিনি রাজমহলে খুবই কম আসেন। অন্যমনস্কভাবে একবার সভাসদদের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। চন্দ্রগুপ্ত একবার নিজের আচার্যর দিকে চেয়ে তারপর অমাত্য কৃষ্ণনাথকে বললেন,

- কে চোর সেটা স্বয়ং আচার্য বিচার করুন।

অমাত্য কিছুটা হতবাক আর সম্রাটের চোখে কৌতুকের আভাস। বললেন,

- আচার্য, এরা দু-জন একই জায়গায় কাজ করে। চুরির অভিযোগ করেছে এদের মালিক। তদন্তে জানা যায় কেউ একজন, ওই যে দেখুন, ওই চারপায়ায় উঠে, ওপরের দেরাজে রাখা একটা রুপোর মূর্তি চুরি করেছে। আমার ধারণা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন এই দু-জনের মধ্যে কে আসল অপরাধী। আচার্য?

চাণক্য প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বলে উঠলেন,

- যদি চোর এই দু-জনের মধ্যেই কোনো একজন হয়ে থাকে, তবে আমি বলব এই ব্যক্তি অপরাধী।

চাণক্য আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেছেন প্রথম ব্যক্তির দিকে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৃদু হেসে বললেন,

- আমারও তাই অভিমত। আচার্য কি দয়া করে অমাত্য মহাশয়কে বুঝিয়ে দেবেন কারণটা? আমার ধারণা এখনও অনেকেই ধোঁয়াশায় রয়েছেন।

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

- ওহে। এই যে... তুমি।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উদ্দেশে কথাটা বললেন চাণক্য।

- তুমি ওই চারপায়ায় একবার উঠে দাঁড়াও দেখি।

আদেশ পেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল চারপায়াটাতে। পুরোনো, জীর্ণ কাঠের সেই জিনিসটা তার ওজন নিতে না পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। চাণক্য বললেন,

- দ্বিতীয় ব্যক্তি স্থূলকায় এবং তার ওজন বেশি। ওই চারপায়াটার জীর্ণ দশা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে তার পক্ষে ওতে চড়ে দেরাজ খোলা অসম্ভব। আমার অনুমান প্রথম ব্যক্তি চুরি করে, ইচ্ছে করে চারপায়া ওখানে রেখে দিয়েছিল, যাতে সন্দেহ অন্যজনের ওপর পড়ে। উচ্চতা বেশি হওয়ায় কেউই তাকে সন্দেহ করবে না এর ফলে।

চাণক্যর কথা শেষ করলেন সম্রাট,

- এবং তারপর চুরি করা মূর্তিটা সুযোগ বুঝে অন্যজনের ঝোলাতে রেখে দেয়। সম্ভবত কাজ নিয়ে রেষারেষি ছিল দু-জনের।

দ্বিতীয় লোকটি মেঝেতে বসে বার বার প্রণাম করতে শুরু করল। সৈনিক তাকে ছেড়ে প্রথম ব্যক্তিকে ধরল। হাতের ইশারায় সম্রাট তাদের বিদায় দিলেন। অমাত্য উঠে দাঁড়িয়ে সেদিনের মতো সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

৩.

সবাই সভাঘর ত্যাগ করলে চন্দ্রগুপ্ত এক ভৃত্যকে দিয়ে একটা চিঠি আনালেন। চিঠিটা চাণক্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

- আজ সকালেই তক্ষশিলা থেকে আপনার নামে চিঠিটা এসেছে।

চাণক্য খানিকটা ভুরু কুঁচকে চিঠিটা হাতে নিলেন এবং সিলমোহর খুলে পড়তে শুরু করলেন,

প্রিয় বিষ্ণুগুপ্ত,

আশা করি তুমি আর মগধের সকলে কুশলে আছ। তোমার এবং চন্দ্রগুপ্তর তত্ত্বাবধানে যে গোটা আর্যাবর্ত সুরক্ষিত সে-খবর আমি রাখি। আমি আশা রাখি রাজধর্মর পাশাপাশি তোমার বিদ্যাচর্চাও সমানভাবে চলছে। তোমার স্বপ্ন-সৃষ্টি 'অর্থশাস্ত্র' লেখা কতটা অগ্রসর হয়েছে জানতে মন চায়। বহু বছর তোমার এবং তোমার ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তবে আশা রাখি তোমরা কুশল মঙ্গল আছ।

কিন্তু এখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তির মুখোমুখি হয়েছে যার ফলে অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে। এর কোনো সমাধান না হলে আমার আশঙ্কা, মানবসভ্যতার এই আদি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হবে। হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। এখানে ছাত্র এবং শিক্ষকরা দিনরাত এক অজানা ভয়ে কাটাচ্ছেন। গত কয়েকমাস ধরে যেন মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে। তিন জনের মৃত্যু হয়েছে খুবই কম সময়ের ব্যবধানে। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে গেছে, আর পরিস্থিতি এরকম থাকলে আমার নিজের পক্ষেও তাদের আটকে রাখা সম্ভব হবে না। তক্ষশিলা বন্ধ হলে, জেনো তা আমাদের সকলের লজ্জার, সারা দেশের লজ্জার।

আমি জানি, প্রশাসনিক দায়িত্বে তুমি অতি ব্যস্ত। তুমি অবসর নিয়েছ বহু বছর আগেই, অতএব এই অনুরোধ করার কোনো অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তোমার আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধা আমার অজ্ঞাত নয়। তক্ষশিলাকে যতটা আমি ভালোবাসি, সে রকমই এই মহাবিদ্যালয়কে তুমিও হৃদয় থেকে ভালোবাসো। সেই অধিকারেই আমি আজ তোমার কাছে অনুরোধ নিয়ে এই চিঠি লিখছি। তুমি ফিরে এসো। সমাধান করো এই রহস্যর। এই বিপদের মুহূর্তে তোমার কথাই মনে এল, বিষ্ণুগুপ্ত। আমার নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হচ্ছে। তোমায় এই মুহূর্তে পাশে পেলে এই বৃদ্ধ বুকে বল পাবে। তোমার বুদ্ধি এবং পরামর্শ আমার বড়ো প্রয়োজন এই দুঃসময়ে। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে তক্ষশিলাকে এই মহা বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই উদ্ধার করতে পারবে।

আশা করি এই বৃদ্ধর অনুরোধ তুমি রাখবে। তুমিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ আশার জ্যোতি।

আশীর্বাদান্তে।
ইতি,
ভদ্রভট্ট।

প্রধানাচার্য।
তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

চিঠিটা পুরোটা পড়া শেষ করে আরও একবার প্রথম থেকে পড়লেন চাণক্য। তারপর আরও একবার। এটা যে প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টর লেখা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব কী লিখেছেন তিনি? কীসের বিপদ? অতিপ্রাকৃত? বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হতে চলেছে এরকম মহা বিপদ? এ যে অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে প্রধানাচার্যর মতো একজন মানুষের থেকে এইরকম

কথা যে কল্পনাতীত। চাণক্যর মনে এখন ভদ্রভট্টর মুখ ভেসে উঠছে। শান্ত, বুদ্ধিমান, ধী, ধৈর্যশালী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ এই বৃদ্ধ। সারাজীবন এই মানুষটাকে চাণক্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছেন। যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক একজন মানুষ। যদিও বহুদিন আগে তাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে, তবু, এইরকম কথা যে এই মানুষটি লিখতে পারে তা বিশ্বাসই হচ্ছে না চাণক্যর। চিঠিটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন পাশের আসনে বসে থাকা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর দিকে। চন্দ্রগুপ্তও যতই চিঠিটা পড়তে থাকলেন তাঁরও চোখে একইরকম বিস্ময় ফুটে উঠতে থাকল। পড়া শেষ করে বললেন:

- বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে? অতিপ্রাকৃতর প্রকোপ? কার মৃত্যু? এইসব কী লিখেছেন প্রধানাচার্য? কী এমন বিপদ হতে পারে সেখানে? আমি গান্ধারকে সব ধরনের অনুপ্রবেশ এবং আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করেছি অনেক আগেই। তবে কীসের কথা বলছেন তিনি?

চাণক্যর কপালেও ভ্রূকুটি। বললেন,

- হুম। তুমি কি চিঠিটায় কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ করতে পারছ?

- পুরোটাই তো অস্বাভাবিক, আচার্য! এই লেখা যে প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টর মতো একজন মানুষ লিখতে পারেন সেটাই বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ এই লেখা যে তাঁরই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আছে কি?

- নাহ্। হাতের লেখা তাঁরই। তা ছাড়া তক্ষশিলার নিজস্ব সিলমোহরটাও আছে।

- তবে?

- হাতের লেখা দেখো। এই চিঠি লেখার সময় লেখকের হাত কাঁপছিল। কয়েকটা জায়গা ভুল লেখাও হয়েছে। এর কোনোটাই প্রধানাচার্যর হওয়ার কথা নয়।

- আপনি বলতে চাইছেন তিনি অসুস্থ?

- স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ থাকলে মানুষের হাতের লেখা এরকম হয়। তাঁর চিঠির বক্তব্য এবং হাতের লেখা থেকেই স্পষ্ট যে তিনি ভয় পেয়েছেন।

চিঠিটার দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন চন্দ্রগুপ্ত। তারপর সেটা রেখে দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন,

- আপনি কী করবেন তবে, আচার্য? যাবেন তক্ষশিলা?

- এর উত্তর তুমি দিতে পারো, চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাটের অনুমতি না পেলে আমি কখনোই মগধ ছেড়ে যাব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

- সত্যি বলতে আমার বিষয়টা ভালো লাগছে না। আমার কেন জানি না মনে আশঙ্কা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলব আপনার যাওয়া উচিত। প্রধানাচার্য মহাশয়

অহেতুক উদ্‌বেগ করার মতো মানুষ নন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলোতে তাঁকে আমি যতদূর চিনেছি, তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত এবং বাস্তববাদী মানুষ।

- হুম।

- অতএব, তিনি যখন আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন, তখন আমার ধারণা, সমস্যা অত্যন্ত গভীর। চরম কোনো বিপদ ছাড়া তিনি আপনাকে এত দূর ডাকতেন না। অতএব, আমার মনে হয় আপনার যাওয়াই শ্রেয়। আর তা ছাড়া, আমার মত না থাকলেও, আপনি যেতে চাইলে আমি কখনোই আপনাকে বাধা দিতাম না, আচার্য। এবার বাকিটা আপনার সিদ্ধান্ত।

- মগধ ছেড়ে যেতে আমার মন সায় দেয় না। কিন্তু বৃদ্ধর এই আর্তি উপেক্ষা করিই-বা কী করে?

- আচার্য, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি। কয়েক মাস অন্তত মগধের দায়িত্ব আমি এবং আমার অমাত্যরা সামলে নেব। অমাত্যপ্রমুখ কৃষ্ণনাথ আপনার মতো বুদ্ধিমান না হতে পারে। তবে সে পরিশ্রমী এবং রাজকার্য সঞ্চালনায় যথেষ্ট পারদর্শী। আপনার শিষ্য হিসেবে এইটুকু শিক্ষা আমায় আপনি দিয়েছেন যাতে আপনার অনুপস্থিতেও আমি কয়েক মাস সামলে নেব।

- আহা! তুমি ভুল বুঝছ, সম্রাট। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। বিষয়টা তা নয়। এটা আসলে আমারই সমস্যা। মগধ ছেড়ে যেতে আমার মন সায় দেয় না।

- আমি বুঝি। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। আমি নিয়মিত আপনাকে চিঠি মারফত এদিককার খবর দিতে থাকব। আপনিও দূত মারফত আমায় পরামর্শ দিতে থাকবেন। আপনি যান, আচার্য। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে মগধের থেকে তক্ষশিলায় আপনার প্রয়োজন বেশি। সেখানে কিছু ঘটেছে বা ঘটছে যার ফলে প্রধানাচার্যর মতো মানুষও ভীত এবং উদ্‌বিগ্ন।

একটু চুপ করে থেকে চাণক্য কিছুক্ষণ ভাবলেন। সবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

- বেশ। তবে তাই হোক। আমি দেরি করতে চাই না। পরশুই যাত্রা শুরু করব উত্তর-পশ্চিমের দিকে। কিন্তু...

- বলুন?

- রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠনের ব্যাপারটা?

- আচার্য, আমি দেশ জুড়ে প্রতিটা সড়কে সড়কে তল্লাশি চালাচ্ছি। ওই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কেউ পালাতে পারবে না। আমার ধারণা কোনো বণিকের গাড়ি ভেবে দস্যুরা লুঠ করেছে। রাজকীয় সিলমোহর দেখলে তারা বুঝবে যে তারা কী অপরাধ করেছে। তারা রাজসৈনিকদের হত্যা করেছে। ওই মুদ্রায় হাত দেয়ার সাহস তারা পাবে না। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ওই চোরদের ধরে ফেলব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করুন।

- তাই যেন হয়, সম্রাট। আমারও তাই ধারণা। বেশ। তবে আমি যাত্রার প্রস্তুতি নিই।

- হ্যাঁ। আমি সুরক্ষার জন্যে আপনার সঙ্গে পঞ্চাশ জন সৈনিকের একটা ঘোড়সওয়ার দল দেব।

- না না। তার প্রয়োজন হবে না।

- অবশ্যই প্রয়োজন হবে। আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত না করলে আমার মনে শান্তি থাকবে না।

- বেশ। তাই হোক। সম্রাট... আর একটা কথা। আমার সঙ্গে কিন্তু...

- হ্যাঁ, জানি আচার্য। জীবসিদ্ধি ভাইও যাবে। জানি। তাকে বাদ দিয়ে আপনাকে পাঠানোর মতো দুঃসাহস আমারও নেই।

হেসে উঠলেন দু-জনেই।

৪.

বেশ কয়েক দিন যাত্রার পরে এখন ছোটো দলটা গান্ধারের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। দূরে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় নজরে আসছে। আগামীকালই তারা পৌঁছে যাবে সেখানে। সন্ধে হয়ে আসায় তারা আজ এই ছোটো টিলাটার ওপরেই তাঁবু পেতেছে। যদিও এখন ঠান্ডার মরসুম নয়, তবু বৃষ্টির কারণে হালকা ঠান্ডার রেশ রয়ে গেছে। তাই ছোটো দলটা আলাদা আলাদা কয়েকটা জায়গায় আগুন জ্বেলে বসেছে। দু-জন প্রহরী অবশ্য সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। একটু আগুন ঘেঁষে মুখোমুখি বসে আছেন দুই ব্রাহ্মণ। চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি চাণক্যরই প্রাক্তন শিষ্য। তাঁদের দু-জনেরই জীবনের কয়েকটা বছর কেটেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই তক্ষশিলার ভেতরেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা দু-জন। আচার্য চাণক্য, সেই সময়ে ছাত্রদের কাছে 'বিদ্রোহী আচার্য' বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিচার-ভাবনা, শিক্ষা সব কিছুই ছিল গতানুগতিকের বাইরে। জীবসিদ্ধির মনে আছে, নেহাতই কৌতূহল বশে সে আচার্য চাণক্যর আশ্রমে একদিন গেছিল। সে জানতে ইচ্ছুক ছিল যে কী কারণে তার বন্ধু শশাঙ্ক এই আচার্যর এরকম ভক্ত হয়ে গেছে। জীবসিদ্ধি আশ্রমে এসে দেখতে পায় একদল ছাত্রর মাঝখানে বসে আছেন আচার্য চাণক্য। প্রতিটা ছাত্র তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তাদের মধ্যে তার বন্ধু শশাঙ্কও আছে। ছাত্রদের মোটেই তিনি অর্থনীতির জ্ঞান দিচ্ছেন না। বরং তিনি তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রর কথা বলছেন।

- রাজনীতিতে কেউ কারুর স্থায়ী শত্রু বা স্থায়ী মিত্র হয় না। একটা দেশ ততক্ষণই তোমার মিত্র থাকবে, যতক্ষণ সেই দেশের স্বার্থ তোমার দেশের সঙ্গে জড়িয়ে।

জীবসিদ্ধি ভেবেছিল তাকে কেউ খেয়াল করেনি। কিন্তু আচার্য তাকে

দেখে নিয়েছেন। কথা থামিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন,

- তোমার নাম?

- জী... জীবসিদ্ধি।

শশাঙ্ক তখনই বলে উঠল,

- গুরুদেব, এ আমার সুহৃদ।

- হুম। তা, তুমি এখানে?

- এমনিই। কোনো বিশেষ কারণ নেই, আচার্য।

মৃদু হেসে চাণক্য তাকে একটা কথা বলেছিলেন, যা জীবসিদ্ধি সারাজীবন মনে রেখেছে।

- মনে রাখবে, কোনোদিন অকারণে কোনো কাজ করবে না। প্রতিটা কাজ শুরু করার আগে নিজেকে তিনটে প্রশ্ন করবে, এই কাজ আমি কেন করছি? এই কাজের উদ্দেশ্য কী? এবং এই কাজ করার পর আমার কি কোনো লাভ হবে? যদি এই প্রশ্নর উত্তর না জানা থাকে, তবে সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকো।

এই কথায় জীবসিদ্ধি প্রচণ্ড চমকে গিয়েছিল। সেইদিন সে চলে যায়নি, বসে শুনেছিল চাণক্যর কথা। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের আশ্রম ছেড়ে চাণক্যর আশ্রমে নাম লিখিয়েছিল। এখানেই সে পরিচিত হয়েছিল পুরুষদত্ত, অক্ষয়, আদিত্য এবং চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে। ধীরে ধীরে সে আর শশাঙ্ক জানতে পেরেছিল যে এই কয়েকজন ছাত্র চাণক্যর বিশেষ কাছের বৃত্তর ছাত্র। জীবসিদ্ধি আর শশাঙ্কও সময়ের সঙ্গে সেই বৃত্তর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। জানতে পারে চাণক্যর গোপন উদ্দেশ্যর কথা।

আচার্য এই ভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যর পতন করে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চান। তাই সম্রাট হিসেবেই চন্দ্রগুপ্তকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অন্য কেউ এরকম অসম্ভব পরিকল্পনা করছে শুনলে জীবসিদ্ধি তাকে উন্মাদ বলত। কিন্তু সে বুঝেছিল, এই ব্রাহ্মণ কোনো সাধারণ শিক্ষক নয়। তার দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মানুষটি। এঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

এরপর চাণক্য তাদেরকেও যুদ্ধকলা, রাজনীতি এবং গুপ্তচর বৃত্তির প্রশিক্ষণ দেন । তবে আর কেউ চাণক্যর উদ্দেশ্য অনুমান করতে না পারলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-জন কিন্তু ঠিকই আন্দাজ পেরেছিল। প্রথমজন প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট, যিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন আচার্যকে এবং দ্বিতীয়জন হলেন আচার্য শঙ্কুমনী, যাঁকে ছাত্ররা বলত আচার্য 'শকুনি'। এই লোকটি প্রথম থেকেই চাণক্যর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন। তিনি বহুবার চেষ্টা করেছিলেন এই ছয় ছাত্রর থেকে সত্য কথা বের করতে। কিন্তু তিনি পারেননি। এই আচার্য পরবর্তীকালেও চাণক্যর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সফল হননি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর পর জীবসিদ্ধি বেশ কয়েক বছর নন্দ

শাসিত মগধে থেকে গুপ্তচরের কাজ করেছিল। সে ছিল শত্রু শিবিরে আচার্যর বিশ্বস্ত চোখ-কান। চন্দ্রগুপ্ত আজ সম্রাট হলেও, সবার চোখের আড়ালে আজও এই ছয় জন ছাত্র গুরুভাই। প্রত্যেকে আজ বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত। কিন্তু জীবসিদ্ধি চাণক্যর সবচেয়ে বিশ্বস্ত হওয়ায় সে আজকাল তাঁর ছায়াসঙ্গী। এই মানুষটার সান্নিধ্যে রোজই কিছু-না-কিছু নতুন শিখতে পারা যায়।

আজ এত বছর পরে আবার গান্ধার রাজ্যে এসে এইসব ফেলে আসা কৈশোরের স্মৃতিই মনে আসছিল জীবসিদ্ধির। তাকিয়ে দেখল চাণক্য মধুর পাত্র থেকে চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং মিটিমিটি হাসছেন।

- আপনি হাসছেন কেন, আচার্য?

- ছাত্রজীবন আর গুপ্তচরবৃত্তির দিনগুলো নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে তুমি। সেই দেখেই হাসছি।

- তা ঠিক। কিন্তু আপনি কীভাবে বুঝলেন আমি কী ভাবছি?

- ভাবনার মাঝে তুমি নিজের অজান্তেই একবার হাতের লোহার বালাটা ছুঁলে। ওটা আমি আমার ছ-জন ছাত্রকে উপহার দিয়েছিলাম তোমাদের ছাত্র অবস্থায়। এর থেকে অনুমান করলাম তুমি নিজের কৈশোরের দিনগুলোর কথা ভাবছ।

- বেশ। তারপর?

- এরপর তুমি ভাবনার মধ্যেই নিজের ঘাড়ের কাছের পুরোনো ক্ষতটায় হাত দিলে। যেদিন গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল সেদিন তোমার এই ক্ষতটা হয়। এক সৈনিকের ছোড়া বল্লমের আঘাতে তোমার ঘাড়ে জখম হয়েছিল, তা আমি জানি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে তুমি নিজের গুপ্তচরবৃত্তির সময়কার কথা ভাবছ। ওই ক্ষত তোমার শরীরে সেই সময়কার নিশান হিসেবে রয়েছে।

- আগে আপনার এই যুক্তিনির্ভর অনুমানগুলো শুনে চমৎকৃত হতাম।

- আজকাল হও না?

হেসে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- তা আজও হই বটে।

হেসে উঠল গুরু শিষ্য। জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আপনার মনে কি পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসছে না, আচার্য?

- আসছে। তবে অতীতে ডুবে থাকা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়া, দুটোই মূর্খদের লক্ষণ। বুদ্ধিমান মানুষের কাছে শুধুই বর্তমানের গুরুত্ব আছে। এবং সত্যি বলতে আমি এই মুহূর্তে বর্তমান সমস্যা নিয়ে চিন্তিত।

- ঠিকই বলেছেন। আমিও অনুমান করতে পারছি না যে কী বিপদের কথা বলতে চেয়েছেন আচার্যপ্রমুখ। তবে কালই তো সেকথা জানতে পারব। আজ রাত হল, বিশ্রাম নিন, আচার্য।

- হ্যাঁ। আমি নিজের তাঁবুতে চললাম। তুমিও বিশ্রাম নাও।
- শুভরাত্রি, আচার্য।

৫.

বিশাল প্রবেশদ্বার দাঁড়িয়ে আছে বহু যুগের ঐতিহ্য আগলে। পাথরের ফলকে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম:

তক্ষশিলা। এর আক্ষরিক অর্থ 'পাথরের ওপর নির্মিত'। তক্ষশিলা শহরের গোড়াপত্তন কয়েক হাজার বছর আগে করা হয়েছিল। বলা হয়, স্বয়ং সম্রাট ভরতের পুত্র, 'তক্ষ'র নামে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল। বিদ্যালয়ের স্থাপনাও বহু যুগ আগে। স্বয়ং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

প্রতি বছর কয়েক হাজার ছাত্র এখানে আসে উচ্চশিক্ষা নিতে। বিনা বেতনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোটাই চলে বিভিন্ন রাজপরিবারের দানের অর্থে। শিক্ষা সকলের অধিকার, সেই মন্ত্রেই এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্য রাখা হয়েছে একদম আদিকাল হতেই। আট বছর সময় থাকে এক একটা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করতে। তবে ছাত্রর মেধা অনুযায়ী তার এর চেয়ে বেশি বা কম সময়ও লাগতে পারে। এখানকার অধ্যয়ন শেষে কোনো পরীক্ষা নেয়া হয় না বা উপাধি ভূষিত করা হয় না। কারণ 'জ্ঞান'-ই হল জগতের সবথেকে বড়ো উপহার। এর চেয়ে বড়ো উপাধি আর কিছুই দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা শেষে গুরুকে গুরুদক্ষিণা দেয়ার রীতি আছে। তবে তা কখনোই অর্থ নয়। আচার্যরা তাঁদের ছাত্রদের বলেন,

- এখান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যদি তুমি আরও ছড়িয়ে দিতে পারো মানুষের মাঝে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড়ো গুরুদক্ষিণা। তোমার মাধ্যমেই আমার অমরত্ব লাভ হবে।

দিনের দ্বিতীয় প্রহরে, বহু বছর পর নিজের আদি কর্মস্থলে পা রাখলেন আচার্য চাণক্য। এই সেই জায়গা, যেখান থেকে অখণ্ড আর্যাবর্তর স্বপ্নের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সেই জায়গা যেখানে প্রথম তিনি, বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য, অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। আজ, এত বছর বাদে, তক্ষশিলার 'বিদ্রোহী আচার্য' ফিরে এসেছেন।

পরিচয়পত্র দেখিয়ে, ঘোড়া এবং সৈনিকদের ব্যবস্থা করে চাণক্য ও জীবসিদ্ধি চললেন প্রধানাচার্যর বাড়ির দিকে। তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করাটা জরুরি। চলার পথে বেশ কিছু ছাত্রর দেখা পেলেন দু-জনে। একটা ভীতি যেন প্রত্যেকের চোখে-মুখে স্পষ্ট। চাণক্য জীবসিদ্ধিকে বললেন,

- একটা জিনিস লক্ষ করলে? এই দিনের বেলাতেও কোনো ছাত্র একা বের হয়নি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সম্ভবত আচার্যপ্রমুখর নির্দেশ। আরও গুরুতর বিষয় হল, তারা সেটা মেনে চলছে।

আচার্যপ্রমুখর ঘরের দরজায় পৌঁছে চাণক্য ডাকলেন,

- প্রধানাচার্য!

- এসো। ভেতরে এসো।

ভেতর থেকে সাড়া পেয়ে ঢুকলেন চাণক্য ও জীবসিদ্ধি। একটা চারপায়ার সামনে মেঝেতে বসে আছেন বৃদ্ধ। পরনে বরাবরের মতোই লাল কাপড়ের সন্ন্যাসীর বেশ। সামনে একটা বই খোলা আর একটা ভূর্জপত্রতে কিছু লিখছিলেন বৃদ্ধ। চন্দন ও কর্পূরে সুবাসিত ঘর। সম্ভবত একটু আগেই দৈনিক পূজা প্রার্থনা সেরেছেন। তাঁদের দেখে মুখে হাসি ফুটেছে বৃদ্ধর। কিন্তু তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন দু-জনে। এ কী চেহারা হয়েছে মানুষটার? বয়স এমনিতেই কিছুটা বেড়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্য এতটা ভেঙে পড়ার কথাও নয়। গত কয়েক মাসে বোধ হয় কয়েক সের ওজন কমেছে বৃদ্ধর। চোখের নীচে কালি, দুশ্চিন্তা আর অনিদ্রার প্রমাণ দিচ্ছে। তবে তাঁর চোখের তারায় এখনও জ্ঞানের দ্যুতি ঝিলিক দেয়।

- তোমরা এসেছ? আমি জানতাম! আমি জানতাম তুমি আসবেই, বিষ্ণুগুপ্ত!

উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দু-জনেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন বৃদ্ধকে। আচার্যপ্রমুখ তাঁদের তুলে একে একে আলিঙ্গন করলেন। আশীর্বাদ করে বললেন,

- সদৈব জয়তি ভবঃ।

প্রধানাচার্যর মুখোমুখি বসলেন দু-জনে।

- কিন্তু এ আপনার কী অবস্থা, আচার্যপ্রমুখ? আপনার কি শরীরে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?

- না, জীবসিদ্ধি। সমস্যা মানসিক। শুধু আমি না, এই গুরুকুলের প্রতিটা শিক্ষক এবং ছাত্রর একই অবস্থা। তবে সেকথায় পরে আসছি। তোমরা দু-জন খাওয়া-দাওয়া করেছ? তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সৈনিক দল আর ঘোড়া আছে? তাদের খাবার আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

এইবার উত্তর দিলেন চাণক্য,

- কৃপা করে আপনি ব্যস্ত হবেন না, আচার্য। সৈনিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘোড়া আস্তাবলে পাঠিয়েছি। আমরা কেউই এখন ক্ষুধার্ত নই।

- আচ্ছা, বেশ। কেমন চলছে তোমাদের কাজ? চন্দ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক আর বাকি ছাত্ররা কেমন আছে?

- প্রত্যেকে কুশল আছে, আচার্য। প্রত্যেকে যে-যার নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে লিপ্ত।

- আর তুমি?

- আমি পাটলিপুত্রতেই একটা তুলনামূলক নিরুপদ্রব জায়গায় নিজস্ব কুটিরে বসবাস করি। সেখানে আমি 'অর্থশাস্ত্র' লেখায় মনোনিবেশ করেছি। রাজ-বৈভব আমার জন্যে নয়। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজন পড়লে সম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাই। এই জীবসিদ্ধি আমার ভালো-মন্দর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

- উত্তম। তোমাদের দেখে আমি যে মনে কতটা বল পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না। এই বৃদ্ধর কথা রাখার জন্যে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।

- কিন্তু আচার্যপ্রমুখ, কী এমন সমস্যা যা নিয়ে আপনি এত চিন্তিত? সারা গুরুকুল চিন্তিত?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন প্রধানাচার্য। মনে হল তিনি কীভাবে কথাটা বলবেন তা মনস্থির করতে পারছেন না। চাণক্য তাঁকে সময় দিলেন। বৃদ্ধ বললেন,

- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিশাপ লেগেছে। অপদেবতা জেগে উঠেছে।

আবারও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাঁর দিকে চাইল জীবসিদ্ধি। এই মানুষের মুখ থেকে এই কথা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। চাণক্যর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাঁর মুখে কোনো ভাব ফুটে ওঠেনি। ভাবলেশহীন মুখেই তিনি প্রধানাচার্যর কথা শুনছেন।

- কয়েক মাস আগে কয়েকজন ছাত্র ভুলবশত এমন এক তন্ত্রক্রিয়া করে ফেলে যার ফলে এই তক্ষশিলায় নেমে এসেছে অপদেবতারা। ছাত্র আর শিক্ষকরা মানসিক সুস্থতা হারাচ্ছে। গত ত্রিশ দিনে দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। ভয়ংকর প্রেতশক্তিরা ধীরে ধীরে তাদের করাল মৃত্যু ছায়ায় গ্রাস করছে সকলকে।

চাণক্য এইবার প্রশ্ন করলেন,

- ক্ষমা করবেন, আচার্য। আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে যে এইসবের মূলে অপশক্তি বা প্রেতের হাত আছে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট। এই প্রশ্নর উত্তর দিতে গিয়ে যেন তিনি নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব করছেন। মুখ তুলে তিনি আচার্য চাণক্যর চোখে চোখ রাখলেন। বললেন,

- কারণ আমি নিজে তাদের অশুভ উপস্থিতি টের পেয়েছি। আমি সজ্ঞানে, নিজের চোখে সেই প্রেতকে দেখেছি!

৬.

এইবার জীবসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাণক্যও অবাক হলেন। যদিও মুখের অভিব্যক্তিতে তা প্রকাশ হতে দিলেন না। প্রধানাচার্য বলতে থাকলেন,

- হ্যাঁ, বিষ্ণুগুপ্ত। আমি নিজে দেখেছি। সেই নরক থেকে উঠে আসা প্রেতদের। নিজের চোখে না দেখলে, নিজে তাদের অস্তিত্ব অনুভব না করলে

আমিও কখনোই এই বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য মনে করতাম না। কিন্তু এটাই সত্য।

চাণক্য একটু চিন্তিতভাবে বললেন,

- আপনাকে অবিশ্বাস করার স্পর্ধা আমার নেই, আচার্য জ্যেষ্ঠম। প্রার্থনা করি, আপনি ঘটনা শুরু থেকে বলুন। কবে এবং কী কারণে আপদ শুরু হয়েছে, আমায় বলুন।

- ঘটনার সূত্রপাত তিন মাস আগে। বিদ্যালয়ের চার ছাত্র গ্রন্থাগার থেকে একটা পুথির অংশ খুঁজে পায়। এই পুথিতে নরকের দরজা খুলে প্রেতদের এই জগতে এনে তাদের বশে আনার উপায় লেখা আছে বলে দাবি করা হয়েছে। তারা নিজেরাও 'ইন্দ্রজাল বিদ্যা'র ছাত্র হওয়ায় তারা সেই লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই ক্রিয়া করবে বলে ঠিক করে। সবার নজর এড়িয়ে এক রাতে তারা প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম দিকের একটা জায়গায় তন্ত্রক্রিয়া শুরু করে। কী ঘটেছিল জানা নেই, তবে রাত তৃতীয় প্রহরের শেষের দিকে তাদের মধ্যে একজনের আর্তনাদ শুনতে পায় নিকটবর্তী নিবাসের ছাত্ররা এবং প্রহরীরা। রাতটা ছিল দুর্যোগের। তারা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় চার ছাত্র অচেতন হয়ে ভূপতিত হয়ে আছে। হবন কুণ্ডর আগুন আর প্রদীপ আগেই ঝড়-বর্ষার দাপটে নিভে গেছে। কিন্তু এখানে যে কোনো তন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ দৃশ্যমান।

সেই ছাত্রদের রাতেই আয়ুরালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সবাই ভেবেছিল যে জ্ঞান ফিরলে সব জানা যাবে যে তারা কী করছিল আর কেন তারা জ্ঞান হারাল। খুব একটা চিন্তিত কেউই ছিল না। কিন্তু সমস্যা শুরু হল এরপর।

পরের দিন তাদের সংজ্ঞা ফিরে আসে, কিন্তু তাদের মনে রাতে যে ভয়টা বসে ছিল সেটা কাটে না। তাদের মধ্যে একজন অন্যদের তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। সে বিশালগরের রাজকুমার সুভাষ। তার থেকেই পুরো ঘটনাটা জানতে পারা যায়। সেইদিন রাতে তাদের ঘিরে ধরেছিল প্রেতমূর্তিরা। তারা বুঝতে পারে যে তাদের তন্ত্র এই অপশক্তিদের বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়নি। এরপরেই আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে তারা।

ব্যাপারটাকে প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি কেউ। কিন্তু বাকি তিন জনের অবস্থা দেখে বৈদ্যরা চিন্তায় পড়ে। তারা অস্বাভাবিক আচরণ করছিল এবং প্রতি মুহূর্তে কিছু দেখে ভয় পাচ্ছিল। তারা গুছিয়ে কথাই বলতে পারেনি।

ঘটনাটা বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। এরপরেই অন্যান্য ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীও অদ্ভুত ভয়ংকর সব মূর্তি দেখতে পেতে শুরু করে। অনেকেই অভিযোগ করতে থাকে যে তারা নিজেদের বাড়িতে থাকতেও ভয় পাচ্ছে। সেই ভয় যে শুধু রাতের বেলায় পাচ্ছে তাই নয়, দিনের বেলাতেও তাদের মনে ভয় চেপে থাকছে। যতই দিন যেতে থাকে, এই সমস্যা বাড়তে থাকে।

শিক্ষক এবং কর্মীরাও বলতে থাকে যে তারা অশুভ উপস্থিতি টের পাচ্ছে। রাতে মানুষজন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছে। তারা ভয়ংকর সব দৃশ্য দেখছে খোলা চোখে।

তুমি তো আচার্য ভীমরজকে চিনতে। ওঁর বয়স হয়েছিল, তার ওপর হৃদয়ের সমস্যায় বেশ কয়েক বছর ধরে ভুগছিলেন। এক রাতে ঘুমের মধ্যেই তিনি কিছু শব্দ পেয়ে ওঠেন। যদিও ওঁর স্ত্রী কিছু শুনতে পাননি। কিন্তু আচার্য খোলা জানলার দিকে চেয়ে কাঁপতে থাকেন। জানলার বাইরে তাকিয়ে তিনি এতটাই আতঙ্কিত হন যে সেখানেই তাঁর হৃদয় জবাব দেয়। ওঁর স্ত্রী জানলার বাইরে কিছুই দেখতে পেলেন না। মৃত্যুর আগে তিনি শুধু বলতে পেরেছিলেন 'শাপ!'। এই হল প্রথম মৃত্যু। কিন্তু এই ঘটনার পরেই অভিশাপের কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। নিবাসী ছাত্র, কর্মী, এমনকী আচার্যদেরও মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে সেইদিন ওই অজানা পুথির তন্ত্র ক্রিয়া দ্বারা অভিশাপ লেগেছে তক্ষশিলার।

আচার্যপ্রমুখ বিরতি নিতে থামলেন। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে মনে হল। চাণক্য ওঁকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বললেন,

- আজকের মতো থাক তবে, আচার্যপ্রমুখ। আবার পরে এসে শুনব।

- না, না। তোমাকে বলে আমার মনের বোঝা হালকা হবে, বিষ্ণুগুপ্ত।

- হুম। তবে আপনি সময় নিয়ে বলুন, আচার্য। আমাদের তাড়া নেই। আপনি একটু জিরিয়ে নিয়ে কথা বলুন। একটু জল পান করুন। ওহে জীবসিদ্ধি...।

জীবসিদ্ধি উঠে ততক্ষণে এক পাত্র জল কুঁজো থেকে ভরে এগিয়ে দিয়েছে বৃদ্ধর দিকে। তিনি কয়েক ঢোঁকে জলটা শেষ করে আবার শুরু করলেন,

- যা বলছিলাম। এইভাবেই আতঙ্ক গ্রাস করতে থাকে পুরো বিদ্যালয়কে। সত্যি বলতে, আমিও বেশ কয়েকদিন ধরেই নিজের আশেপাশে একধরনের অদ্ভুত বিষণ্ণতা অনুভব করছিলাম। আমার মনে হয়েছে যেন এই পরিবেশ ভারী হয়ে আসছে। শ্বাসরুদ্ধকর মনে হত নিজেরই চেনা পরিচিত এই জায়গাকে। কিন্তু আমার যুক্তিবাদী মন বার বার বলে দিত যে এই সবই মনের দুর্বলতা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতিভ্রম হচ্ছে। অবসর নেয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু... কিন্তু...

- কিন্তু? বলুন, আচার্যজ্যেষ্ঠ।

কিছু একটা মনে পড়তে বৃদ্ধর চোখে যেন ভয় ঝিলিক দিয়ে গেল। বললেন,

- আমার সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা আমার যুক্তিবাদী আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। সেই রাতের কথা ভাবলে আমার এখনও বুক শুকিয়ে আসে, বিষ্ণুগুপ্ত।

জীবসিদ্ধি লক্ষ করল যে বৃদ্ধর কপালে ঘাম দেখা যাচ্ছে। তিনি সত্যি ভয় পাচ্ছেন।

- এক রাতের কথা। ঘুমের অসুবিধে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছিলই। সেই রাতেও প্রথমে ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ চোখ লাগে, তারপর হঠাৎ



অকারণেই ঘুম ভেঙে গেল। জাগতেই বুঝতে পারলাম যে পরিবেশে কিছু পরিবর্তন এসেছে। আমার আশেপাশে কেউ বা কারা যেন আছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আছে। কায়াহীনের উপস্থিতি টের পেলাম। উঠে বসলাম। হৃদয়ের টিপটিপ শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল আমার ঘরের কোনায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের কোনা অন্ধকার থাকায় দেখতে পেলাম

না। পাশেই একটি ছোটো প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে জ্বলছিল। সেটাতে তেল দিয়ে উসকে দিলাম। আলো এগিয়ে ধরলাম ঘরের কোণে।

ঢোঁক গিললেন বৃদ্ধ। তাঁর হাত কাঁপছে। চোখের মণিতে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। কিছুটা যেন বিষাদও।

- আমি দেখলাম তাদের! স্পষ্ট দেখলাম। আমার স্ত্রী এবং মেয়ে, যারা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে গ্রামের বাড়িতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গেছে। হ্যাঁ। কোনো ভুল নেই। তারাই দাঁড়িয়ে ছিল আমার ঘরে। আমার মেয়ের মৃত্যুর সময়ে একটা কাঠের পুতুল হাতে ছিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটার হাতে সেই পুতুলটা পর্যন্ত আছে। তারা আমার দিকে চেয়ে আছে। কী... কী ভয়ানক তাদের সেই দৃষ্টি! আর তারপরেই... তারপরেই আমার হাতের প্রদীপ থেকে একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটে গেল তাদের দিকে। আমি কিছু বোঝার আগেই, চোখের সামনে তাদের শরীর গ্রাস করল লেলিহান অগ্নিশিখা। যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে চলেছে তারা। পুড়ে যাচ্ছে তাদের শরীর। পোড়া গন্ধ আমার নাকে আসছে... উফফ!!

আর বলতে পারলেন না। দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন। কাঁপছে তাঁর শরীর। প্রচণ্ড অসহায় আর ভগ্নপ্রায় লাগছে এই কঠিন মানুষটাকে। চাণক্য উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

- আচার্যপ্রমুখ, দুর্বল হবেন না। আমি সত্যি দুঃখিত। আপনি এইবার বিশ্রাম নিন। আজকে আর বলতে হবে না।

মুখ থেকে হাত সরালেন বৃদ্ধ। নিজের দু-হাতে চেপে ধরলেন চাণক্যর হাত। কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থেকেই কাতর আবেদন স্পষ্ট।

চাণক্য তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে জীবসিদ্ধিও দাঁড়াল। প্রধানাচার্যর এই একটাই ঘর, এখানেই তাঁর বাস এবং এটাই কার্যালয়। অতএব এই ঘরেই তিনি তাঁর মৃত পরিবারের প্রেত দেখেছেন। জীবসিদ্ধি চোখ বুলিয়ে খুঁজল কোথাও কোনো আগুনের ঝলসে যাওয়ার দাগ সত্যিই আছে কি না। চাণক্য ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন সে-চেষ্টা বৃথা।

প্রধানাচার্যর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- কী মনে হচ্ছে, আচার্য?

নিজের টিকিতে একবার হাত চালিয়ে উত্তর দিলেন,

- সমস্যা বড়োই জটিল হতে চলেছে।

৭.

অতিথিশালার দুটো পাশাপাশি ঘর বেছে নিয়েছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে তক্ষশিলায়। জীবসিদ্ধি সবে একটা চিঠি লেখা শেষ করেছে। সম্রাটকে নিজেদের পৌঁছোনোর খবর এবং এখানকার অবস্থার

বিবরণ দিয়ে চিঠি। আগামীকালই এটা পাঠিয়ে দেবে। সান্ধ্যভ্রমণে বেরোবে কি না ভাবছে। আচার্যকে একবার বলে দেখলে হয়। তিনিও যাবেন আশা করি।

তখনই দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। দরজা খুলতে একজন মানুষকে দেখা গেল। মুখটা ঢাকা। সচকিত হয়ে পিছিয়ে এল জীবসিদ্ধি। কোমরের কাছে লুকোনো কৃপাণটা ছুঁলো তার ডান হাত। হামলা? তার ওপর? তাও আবার তক্ষশিলায়?

কিন্তু পরক্ষণেই লোকটা হাতজোড় করে বলল,

- ক্ষমা করবেন, ব্রাহ্মণদেব। আমি শত্রু না। আমি এখানকার কর্মী। আপনাদের এই প্রদীপের তেল, ধুনি আর কর্পূর দিতে এসেছি।

- কিন্তু তোমার মুখ ঢাকা কেন?

- কয়েক বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় আমার শরীরের অনেকটা অংশ ঝলসে যায়। আমার মুখও ঝলসে যায় তাতে। তাই...।

- ওহ। কোনো ব্যাপার না। তুমি মুখের কাপড় সরাতে পারো।

লোকটা মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলতে তার আগুনে পুড়ে যাওয়া মুখ বেরিয়ে পড়ল। দাগ পুরোনো হলেও, চামড়া কুঁচকে তার মুখ ভয়ানক হয়ে আছে। একটা চোখও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। এইবার তাকে দেখে জীবসিদ্ধির বড়োই দুঃখ হল। বয়স কতই-বা হবে এর? তারই সমান। অথচ তাকে বাকি জীবনটা মুখ লুকিয়ে চলতে হবে। কোমরের কাছে কৃপাণ ধরা হাতটা শিথিল হল জীবসিদ্ধির। লোকটা একটু দ্বিধা ভরে প্রশ্ন করল,

- আপনিই কি মহামান্য আচার্য চাণক্য?

মৃদু হেসে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- না। আমি আচার্য চাণক্যর শিষ্য। আমার নাম জীবসিদ্ধি।

লোকটার চোখে কৌতূহল দেখা গেল,

- ওহ। আপনিও নিশ্চয়ই এই মহাবিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন?

- হ্যাঁ। তা ছিলাম বটে। তবে সে অনেক আগের কথা।

লোকটা প্রদীপের তেল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। একটু লজ্জিত হয়ে লোকটি বলল:

- আমার বেশি কৌতূহল ক্ষমা করবেন, ব্রাহ্মণদেব। আসলে আমি বেশ কয়েকদিন থেকেই শুনছিলাম যে স্বয়ং মহামতি চাণক্য ফিরছেন এখানে। তাঁকে স্বচক্ষে দেখার বাসনা বহুদিনের।

- পাশের ঘরেই তিনি আছেন। পরিচয় করে নাও।

একটু ইতস্তত করে লোকটা বলল,

- আমায় একটু সাহায্য করতে পারবেন? দয়া করে আপনি যদি তাঁকে দরজা খুলতে বলেন তবে ভালো হয়। মানে আমার মুখ দেখে উনি হয়তো চমকে যাবেন।

- সে অসুবিধে নেই। এসো আমার সঙ্গে। ওহ... তোমার নামটাই তো জানা হল না।

- আজ্ঞে, আমার নাম বাসবজিৎ। সবাই বাসব বলে ডাকে।

- বেশ।

চাণক্যর ঘরের দরজায় করাঘাত করতে আচার্য বেরিয়ে এলেন। জীবসিদ্ধি বলল:

- শুভসন্ধ্যা, আচার্য। এ বাসবজিৎ। প্রদীপের তেল, কর্পূরাদি দিতে এসেছে।

বাসব মাটিতে লুটিয়ে চাণক্যর পা ছুঁলো।

- আমি ভাবতেই পারছি না যে স্বয়ং মহামতি চাণক্যর সামনে আমি দাঁড়িয়ে। এই অধমের জীবন সার্থক হল।

- আশীর্বাদ করি। তা, তুমি এখানে কতদিন?

- তা, প্রায় দু-বছর হতে চলল, আচার্য। আমি আপনার জীবনের কাহিনি সব শুনেছি, আচার্য। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ।

- হুম। কিন্তু আমি তো ওই তেল, কর্পূরাদি নেব না। আমি নিজের ব্যবহারের মতো জিনিস নিয়েই এসেছি।

লোকটা একটু অবাক হল। কী বলবে ভেবে পেল না। কারণটা জীবসিদ্ধি বলল:

- আসলে, আচার্য নিজের ব্যবহারের জন্যে বিনামূল্যে কোনো জিনিস গ্রহণ করেন না। তিনি নিজের বাড়িতেও সরকারি তহবিল থেকে কোনো জিনিস ব্যবহার করেন না। প্রদীপের তেলটুকুও নিজের সামান্য মাসোহারা থেকে কেনেন।

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাসবের। বলল:

- লোকমুখে একটা কাহিনি শুনেছিলাম যে আচার্য চাণক্য নিজের ঘরে দুটো প্রদীপ রাখেন। একটা সরকারি তেলে, একটা নিজের কেনা তেলে। অতিথিদের তিনি প্রশ্ন করেন তাদের প্রয়োজন সরকারি না নিজস্ব। তার উত্তরের ওপর নির্ভর করে কোন প্রদীপ প্রজ্বলন করা হবে। আমি ভাবতাম এটা শুধুমাত্র অতিরঞ্জিত কাহিনি মাত্র। মানুষ এত অত্যধিক সৎ হতে পারে না। আজ আমার সেই সংশয় দূর হল।

চাণক্য উত্তর দিলেন,

- এটাকে অত্যধিক সততা বলে না। এটা অতি সাধারণ একটা নিয়ম মাত্র, যা সকলের মেনে চলা উচিত। দুঃখের বিষয় যে সাধারণ মানুষ তা ভুলে যেতে বসেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো 'সততা' জিনিসটাই মানুষের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হবে।

বাসবের দৃষ্টিতে প্রশংসা আর সমীহ ফুটে উঠল। বলল:

- আপনার কোনো প্রয়োজন হলে আমায় বলবেন, আচার্য। প্রধানাচার্য আপনাদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমায় দিয়েছেন। তা ছাড়া আমায়

আপনাদের আরও একটা সাহায্য করতে বলেছেন তিনি।

- হুম। কী সাহায্য?

- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে থাকা সমস্ত ভয়াবহ ঘটনার খবর আমি রাখি। আপনারা যেখানে যা তদন্ত করতে যেতে চান আমায় বলবেন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব।

- হুম। বেশ, বেশ। তুমি ওই চার ছাত্রদের চেনো? মানে ওই যারা সেই রাত্রে তন্ত্র-ক্রিয়া করেছিল?

- হ্যাঁ। আমি সবাইকেই চিনতাম।

- চিনতাম কেন? তারা কি এখানে নেই নাকি?

বাসব একটু বিস্মিত হয়ে বলল,

- আচার্যপ্রমুখ আপনাদের বলেননি? তাদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছে।

- সে কী? কবে?

- দিন কুড়ি আগেই। এদের মধ্যে তিন জনের মানসিক বিকার হয়েছিল সেই রাতের পর। প্রতি মুহূর্তে তারা ভয় পেত। আয়ুরালয় থেকে মাত্র কুমার সুভাষকে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। বাকি দু-জন এখনও সেখানেই আছে। এদের মধ্যে একজন, তার নাম ছিত্রবান, আয়ুরালয়ের জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

- বড়োই দুঃখের পরিণতি। বাকি তিন জন ছাত্রর সঙ্গে আমার দেখা করা প্রয়োজন।

- আমি ব্যবস্থা করে রাখব। কাল তাহলে সকালে দ্বিতীয় প্রহরে আমি আসব। আপনাদের নিয়ে যাব তাদের কাছে।

- হুম। সেই ভালো।

- বেশ। শুভরাত্রি, আচার্য। শুভরাত্রি, জীবসিদ্ধি মহাশয়।

- শুভরাত্রি।

বাসব বিদায় নিতে, চাণক্য বললেন,

- বীভৎসভাবে ঝলসে যাওয়া মুখ। কীভাবে হয়েছে কে জানে।

- বলল অনেক বছর আগের দুর্ঘটনায়।

- হুমম। তবে আমাদের কাজের জন্যে লোকটা বেশ উপযুক্ত।

- তা তো অবশ্যই। তা আচার্য, একটু সান্ধ্যভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক নাকি আপনি?

আকাশের চাঁদ রুপোলি হালকা জোছনা মাখিয়ে দিয়েছে লাল পাথরের এই প্রাঙ্গণে। বড়োই মনোরম পরিবেশ। আকাশে আজ মেঘ নেই। চাণক্য বললেন,

- চলো। একটু পায়চারি করে আসি। বেশ চিত্তাকর্ষক পরিবেশ।

দু-জন চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটছেন ফাঁকা প্রাঙ্গণে। এই নিস্তব্ধতার মাঝে কেউ অনুমানও করতে পারবে না যে এই মুহূর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ আছে। এই প্রাঙ্গণ তারা বরাবরই ছাত্রে ভরা দেখতে অভ্যস্ত। এখানকার নিয়ম দিনের বেলা সাধারণ ছাত্রদের পড়ানো হয় এবং সন্ধে থেকে রাজকুমারদের। তার কারণ রাজকুমারদের অনেক সময়েই দিনের বেলা অন্যান্য কাজ থাকে। কিন্তু এখন সূর্যাস্তর পর কেউ নিজের ঘরের বাইরে বের হয় না।

জীবসিদ্ধি ভাবছিল, আচার্য কি পারবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ত্রাসের ছায়া থেকে বের করে আনতে? পারবেন তিনি তক্ষশিলাকে আবার আগের মতো করে দিতে? হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পারবেন! চাণক্যই পারেন এই রহস্যর সমাধান করতে। এই অদ্ভুত মানুষটার পক্ষে সব সম্ভব।

চাণক্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ফিরে যেতে শুরু করলেন অতিথি নিবাসের দিকে। জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আর ভ্রমণ করবেন না?

- নাহ্। তুমি যুবক, আমি নই। আমি বিশ্রাম করতে গেলাম। এই এতদিনের একটানা যাত্রার ক্লান্তি দূর হয়নি আমার। আর তা ছাড়া...

- তা ছাড়া?

- এই রাতে বেশি ঘোরাঘুরি না করাই সমীচীন। কে বলতে পারে, হয়তো কোনো প্রেত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন।

হেসে উঠলেন দু-জনেই। ফাঁকা প্রাঙ্গণে তাঁদের হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

৮.

কথামতো দিনের দ্বিতীয় প্রহরে বাসব এসে হাজির হল অতিথি নিবাসে। আগে থেকেই তৈরি ছিলেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। সঙ্গেসঙ্গেই তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। দক্ষিণ প্রাঙ্গণে আয়ুরালয় অবস্থিত। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রর অনুসন্ধান কেন্দ্র বলা চলে। আয়ুর্বেদের জনক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রর প্রথম বই *চরক-সংহিতা*-র লেখক, মহামতি চরক স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। এই চিকিৎসাকেন্দ্র তাঁর নিজের স্থাপনা করা।

আয়ুরালয়ে দেখা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা আর অনুমতি আগেই জোগাড় করে রেখেছিল বাসব। চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি দু-জনকেই সম্মত হতে হল যে বাসব বেশ কাজের মানুষ।

একতলার একটা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে সুনাভকে। তার ঘরে তিন জনকে ঢুকতে দেখে সুনাভ ভীত চোখে তাদের দিকে চাইল। চাণক্য তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। বছর

আঠারো-উনিশের এক কিশোর। চোখের মণি অস্বাভাবিক বড়ো এবং তাতে ঘোলাটে দৃষ্টি। চোখের কোলে গভীর কালি। চাণক্য এই ছাত্রর নামটা আগেই জেনেছেন বাসবের থেকে, তাই প্রশ্ন করলেন,

- সুনাভ, কেমন আছ?

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে বলল,

- ভালো। শুধু...

- শুধু? কী?

- ওই... ওই ছায়াগুলো। ওরা আবার চলে আসবে।

- কোন ছায়াগুলো, সুনাভ?

- ওই যে, ওই কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো। মাঝে মাঝেই আসে। ওদের চোখ...

- ওদের চোখ?

- ল... লাল! কয়লার মতো আগুন জ্বলে।

- ওরা এখন আসবে না।

- তুমি ঠিক বলছ?

- হ্যাঁ। এখন কেউ আসবে না। তুমি কি শুধু তাদেরকেই দেখতে পাও? নাকি আরও কেউ এসে তোমাকে ভয় দেখায়?

- না। শুধু ওরা। আর সঙ্গে ওই মণি...

- তাদের লাল চোখের মণি?

- না না। মণি। কিন্তু তার চোখ লাল।

কথার স্বাভাবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে বুঝে চাণক্য প্রসঙ্গ বদল করলেন,

- হুমম। সেদিন রাতে কী হয়েছিল মনে পড়ে?

সুনাভ কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বার বার শুধু সামনের দেয়ালের দিকে চাইছে ভয়ে ভয়ে। চাণক্য ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। প্রশ্ন করলেন,

- তারা কি ওই দেয়াল থেকে বের হয়ে আসে?

- হ... হ্যাঁ। রাত হলেই বেরিয়ে আসে। কালো কালো, লাল চোখ। মণি।

- সেইদিন রাতেও কি এরাই এসেছিল?

- হ্যাঁ। ওরা... ওরা নরক থেকে এসেছে। ফিরে এসেছে। ও নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওদের।

চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে সুনাভর। চাণক্য বললেন,

- ভয় নেই। ওরা এখন আসবে না। বাইরে চেয়ে দেখো, দিনের আলো।

জানলার বাইরে চেয়ে কিছুটা যেন আশ্বস্ত হল সুনাভ। চাণক্য আবার বললেন,

- ওই রাতে কী হয়েছিল একটু মনে করে বলতে পারো?

- আমরা... আমরা নরকের দরজা খুলে প্রেতদের ডেকে এনেছি। ওরা... ওরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল। আমার পেছনেই সে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি... আমরা তাকে...

আচমকা ভেঙে পড়ল সুনাভ। প্রচণ্ড কাঁদতে থাকল। একে প্রশ্ন করে আর লাভ নেই। চাণক্য ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ওঁর সঙ্গের দু-জনও ওঁর দেখাদেখি বেরিয়ে এল।

বাসব বলল:

- এবার দ্বিতীয় ছাত্র পুষ্পলের ঘরে যাব আমরা। পুষ্পলকে প্রথমে ওপরতলায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু ছিত্রবানের মৃত্যুর পরেই, শঙ্কিত হয়ে প্রধান বৈদ্য তাকে নীচের একটা ঘরে রাখার নির্দেশ দেন। আসুন আমার সঙ্গে, এই চারটে ঘর ছেড়েই তার ঘর।

বাসবের দেখানো পথে এগিয়ে চললেন আচার্য ও জীবসিদ্ধি। একটা প্রায় একইরকম ঘরে এসে ঢুকলেন তাঁরা। সেখানে আধশোয়া অবস্থায় এক কিশোর বসে। পুষ্পলেরও বয়স ওই সুনাভর মতোই ষোলো-সতেরো হবে। তারও চোখে একইরকম দৃষ্টি। ভীত, বিষণ্ণ, অনিদ্রায় ক্লান্ত। কিন্তু পুষ্পল শান্ত নয়, সে প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে আশেপাশে। কিছুক্ষণ পর পর জানলার দিকে চাইছে ভীত দৃষ্টিতে। যেন কিছু একটা ভয়ংকর জিনিস এক্ষুনি ঢুকে আসবে ওখান থেকে। তাদের তিন জনকে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল,

- এসো না! একদম এদিকে এসো না। ওই পাখিটা তোমাদেরও ধরে নেবে! তুলে নিয়ে যাবে তোমাদেরও। ভেতরে এসো না!

চাণক্য শান্ত স্বরে বললেন,

- চিন্তা নেই। আমাদের ওই শয়তানটা ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি তাকে আগে কখনো চাক্ষুষ করিনি। কেমন দেখতে তাকে? বর্ণনা দিতে পারবে?

- মানুষের মতো শরীর। কিন্তু অনেক বড়ো। বিশাল বড়ো দানব পাখি। মাথাটা বড়ো কাকের মতো। না না... বাজপাখির মতো। বড়ো বড়ো দুটো ডানা আছে। পায়ে ধারালো নখ। ওটা দিয়েই তো মানুষকে ধরে নিয়ে যায়।

- হুমম। সেইদিন রাতে কি এই পাখিগুলোই এসেছিল?

- না, না। একটাই পাখি আছে। ওটাই।

- ওহ। সেই রাতের কথা মনে আছে? ওই যে রাতে প্রথম দেখেছিলে এই দানব পাখিকে?

- হ্যাঁ। এটাই তো এসেছিল। প্রথমে কুমারকে ধরে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকায়!

সারা শরীর কাঁপছে পুষ্পলের। আবার জানলা দিয়ে বাইরে চাইতে থাকে,

- ওই ওই! ওই যে দেখো। বাইরে আকাশে উড়ছে। খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়বে! এতবার বলেছি বন্ধ করো ওটা। কেউ শুনছে না!

জানলা দিয়ে চেয়ে খোলা আকাশে এক ঝাঁক পাখি ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। চাণক্য বললেন,

- বেশ। আমি বলে দেব যেন জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

- হ্যাঁ। করো, করো।

আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন চাণক্য। হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

- এদের থেকে বেশি কিছুই জানা যাবে না। বরং কুমার সুভাষের থেকে কিছু জরুরি তথ্য পাওয়ার আশা আছে। সে তো শুনছি এদের চেয়ে সুস্থ?

- হ্যাঁ, আচার্য। এখন তার কাছেই যাব। তার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাক?

- কিন্তু আমি ও জীবসিদ্ধি তো স্বপাক খাব আজ থেকে হে, বাসব।

কথাটা শুনে জীবসিদ্ধি একটু অবাক হল। কারণ স্বপাক খাওয়ার কথা আগে বলেননি চাণক্য। বাসব বলল:

- ওহো। তা বেশ। কিন্তু আচার্য... আমি তো সেরকম কোনো ব্যবস্থা করিনি।

- আজকের আনাজ-চাল আমি আমাদের সৈনিকদের দিয়ে আনিয়ে রেখেছি। কালকের থেকে তুমি যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারো রোজকার জিনিসপত্রর, তবে ভালো হয়। তবে তারজন্যে ন্যায্য মূল্য আমরা দিয়ে দেব তোমায়।

- কোনো অসুবিধা নেই, আচার্য। হয়ে যাবে।

- বেশ। তবে তুমি খাওয়া সেরে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসো।

- আজ্ঞে, আচার্য।

বাসব বিদায় নিতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আচার্য, এই স্বপাকে খাওয়ার বিষয়টা বুঝলাম না।

চাণক্য পথ চলতে শুরু করলেন। জীবসিদ্ধি তাঁর সঙ্গেই চলেছে। ফাঁকা জায়গায় এসে বললেন,

- খাবারে কেউ কিছু মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিচ্ছে কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাই নিশ্চিত না হওয়া অবধি এখানকার খাবার না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

- তা আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু আচার্য, এই বিষয়ে নিশ্চিত কীভাবে হওয়া যায়?

- একটা উপায় আছে। তারজন্যে তোমায় কয়েক দিন কষ্ট করতে হবে।

এর বেশি কিছু বললেন না চাণক্য। অতিথি নিবাসের দিকে পা বাড়ালেন।

৯.

দুপুরের সূর্য মুখ ঢেকেছে মেঘে। বোধ হয় বৃষ্টি হবে সন্ধ্যার দিকে। চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি চলেছে বাসবের সঙ্গে। গন্তব্য, কুমার সুভাষের ছাত্রনিবাস। পথ চলতে চলতে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- ওহে বাসব, তুমি এখানে ঠিক কী কাজ কর?

- আচার্য, আমি এখানকার গ্রন্থাগারের কিছু সামান্য কাজকর্ম সামলাই। আসলে আমি শিক্ষিত। উচ্চশিক্ষা না থাকলেও, সাধারণ শিক্ষা আমার আছে। তাই গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে আমার কাজ পড়ে। আর বাকি সময়ে অন্যান্য আচার্যদের কাজকর্ম করি।

- বেশ, বেশ। তা, তোমায় প্রথম কে এখানে কাজ দেয়?

একটু থেমে বাসব উত্তর দেয়,

- আচার্য, বিন্দাচল। উনি এখানকার 'উদ্ভিদবিদ্যা'-র আচার্য ছিলেন। আমায় স্নেহ করতেন। একটু খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন, কিন্তু খুব ভালো মনের মানুষ।

- হ্যাঁ, জানি। 'ছিলেন' কেন? তিনি কি অবসর নিয়েছেন?

- হ্যাঁ। উনি একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে তক্ষশিলা থেকে বেরিয়ে চলে যান এক বছর আগে।

- সে কী? কেন?

- বলতে পারি না, আচার্য। খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন। অত্যধিক জ্ঞানী। দিনরাত নিজের গবেষণাগারে কাজ করতেন।

- হুমম।

মুখে কিছু না বললেও, চাণক্যর মনে পড়ে গেল আচার্য বিন্দাচলের কথা। মানুষটা জ্ঞানী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তিনি ছিলেন আচার্য শকুনির অন্ধভক্ত। এইরকম কয়েকজন আচার্য বরাবরই আচার্য শকুনির পক্ষে থাকতেন সেই সময়ে। এবং সেই কারণে চাণক্যর সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব ছিল না। তবে প্রত্যেকে একে অন্যকে যোগ্য সম্মান দিয়ে চলতেন। এইসব প্রসঙ্গ এখন আর তুলে লাভ নেই। অতীতের তিক্ততা থাকুক অতীতেই। প্রসঙ্গ বদলাতে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- ওহে, বাসব। একটা কথা বলো, তুমি নিজে কি কখনো এই তক্ষশিলায় অপদেবতার দেখা পেয়েছ?

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বাসব বলে,

- হ্যাঁ, আচার্য। আমি দেখেছি। আমিও কালো ছায়ামূর্তিদের দেখেছি। ওই লাল চোখ, জ্বলন্ত।

- কোথায় দেখেছ?

- নিজের বাড়িতে ফেরার পথে দেখেছি। উত্তরের জলাশয়ের পাড়ে। কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা, আমার কাজ সেরে ফিরতে দেরি হয়েছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। জলাশয়ের পাশ দিয়ে পার হচ্ছিলাম। তখনই একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেলাম। সেটা জলাশয়ের দিক থেকেই আসছে।

তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল, আচার্য। আজও সে-দৃশ্যর কথা ভাবলে আমার আতঙ্ক লাগে।

- কী দেখলে?

- আমি দেখলাম, জল থেকে উঠে আসছে অনেক আকৃতি। তাদের প্রত্যেকের চোখ জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল। হাতে পাখির মতো ধারালো নখ। দলে দলে তারা উঠে আসছে জলের গভীর থেকে। আমি বুঝতে পারি যে এরা কেউ মানব নয়। এরা দানব! প্রেত! আমি ঈশ্বরের নাম জপ করতে থাকি আর সেখান থেকে পালাই। নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল না দেয়া অবধি পেছন ঘুরে চাইনি আর মন্ত্রজপও থামাইনি। সে বড়োই ভয়ংকর!

- হুমম। ভয়ংকর বটে। আর কোনোদিন কিছু দেখেছ?

- না, আচার্য। সেই রাতের পর আমি পণ করেছি যে যাই ঘটুক, আমি রাতের বেলা আর প্রাঙ্গণে বের হব না।

- হুমম।

কুমার সুভাষ আগে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে একই ছাত্রনিবাসে থাকত। কিন্তু সেই রাতের ঘটনার পর তাকে আলাদা ছাত্রাবাসে আনা হয়েছে। এখানে তার নিজস্ব কিছু দাসদাসী তার দেখাশোনা করছে। সে কিছুটা আরোগ্য লাভ করেছে।

বাসব এখানেও আগেই কথা বলে রেখেছিল। তাই তাঁদের কেউ বাধা দিল না। তাঁরা গিয়ে পৌঁছোলেন কুমারের ঘরে। কুমারের বয়স অন্য দুই ছাত্রর তুলনায় কম। প্রথম বর্ষের ছাত্র সে। নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাঁদের দেখে কুমার উঠে বসে হাত জোড় করে প্রণাম করল।

- প্রণাম, আচার্য চাণক্য। আপনাকে এতদূর চলে আসতে হয়েছে বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমায় যদি বৈদ্যরা বারণ না করত তবে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, আচার্য।

- আয়ুষ্মান ভবঃ, কুমার। তোমার রাজোচিত সৌজন্য তোমার কুল ও শিক্ষার পরিচয় দেয়। তুমি অসুস্থ। তাই এখন বৈদ্যদের নির্দেশ পালন করাটাই তোমার উচিত।

- মাননীয় অতিথিরা, আপনারা আসন গ্রহণ করুন। ওহে বাসব, ওঁদের আসন দাও। নিজেও বোসো।

সবাই আসন গ্রহণ করলে চাণক্য বললেন,

- পরিচয় করিয়ে দিই। এ আমার শিষ্য, জীবসিদ্ধি।

দু-জনেই একে অন্যের প্রতি নমস্কার জানাল। কুমার বলল:

- বলুন, মহামতি। আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি?

- কুমার। আমরা সব ঘটনা শুরু থেকে জানতে চাই। কোনো সামান্য তথ্যও যেন বাদ না যায়।

- বেশ। তবে গোড়া থেকেই শুরু করি। আমি এবং আমার তিন বন্ধু সবাই 'ইন্দ্রজাল বিদ্যা'-র ছাত্র। আমরা অনেকদিন থেকেই এমন কোনো রহস্যময় প্রাচীন পুথি বা লিপি খুঁজে চলেছিলাম যা থেকে অলৌকিককে উপলব্ধি করতে পারব। বেশ কয়েকবার আমরা গ্রন্থাগারে গিয়ে খুঁজেছিলাম সেইরকম কিছু। কিন্তু পাইনি কিছুই।

আপনি তো জানেনই, এখানে অধ্যয়ন ছাড়াও আমাদের প্রত্যেক ছাত্রর সাপ্তাহিক আলাদা আলাদা কাজের ভার পড়ে। এরকমই একদিন পুষ্পলের কাজের ভার ছিল গ্রন্থাগারে। দৈবাৎ সে একটা প্রাচীন পুথি খুঁজে পায়। আমাদের এসে সেই কথা বলে। এরপর আমরাও গিয়ে সেই পুথি পড়ে বুঝি যে এটা সত্যি অলৌকিক কিছুর চাবিকাঠি হতে পারে। যদিও এই বইয়ের প্রথমদিকের পাতা নেই। তাই নিশ্চিত হওয়া যায় না কীসের বই বা কার লেখা। কিন্তু ওটা তন্ত্র মন্ত্রের বই, এইটুকু বোঝা যায় সহজেই। আমরা সেই বই নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসি এবং তার থেকে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা করে লেখাগুলো লিপিবদ্ধ করি। এরপর আমরা তিথি-নক্ষত্র বিচার করে এক রাতে সেই তন্ত্রক্রিয়া করে দেখতে যাই। আর তাতেই কাল হল আমাদের।

কুমারের দৃষ্টিতে পরিচিত ভয় আর বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগল,

- সেই রাতটা ছিল দুর্যোগের। ঈশান কোণের কালো মেঘ দেখেই আমাদের অশুভ সংকেত আঁচ করা উচিত ছিল। জানেন আচার্য, আমার ধুলো, ধোঁয়া সহ্য হয় না। তাই আমার বন্ধুরা বলেছিল যেন এইসব থেকে আমি বিরত থাকি। কারণ সেখানে হবন অগ্নি জ্বালতে হয়েছিল। আমি নিজের শারীরিক সমস্যা উপেক্ষা করে এই অনিষ্টর কাজে লিপ্ত হলাম। অত্যধিক কৌতূহল আমাদের অন্ধ করে দিয়েছিল। দুর্যোগ শুরুর আগেই আমরা আমাদের তন্ত্রক্রিয়া আরম্ভ করি।

- হুমম। তারপর?

- প্রথমে কিছু হয়নি। নিজের গতিতে চলছিল সব। কিন্তু শেষের দিকে আমার প্রচণ্ড ভয় করতে থাকল। টের পেলাম আমার পেছনেই কিছু একটা এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন ঘুরলাম, আর তখনই দেখলাম ওটাকে। একটা বিশাল মাকড়সা! আমার দিকে তাকিয়ে আছে... পরক্ষণেই আমার দিকে জাল ছুড়ে দিল সেটা। আমি চিৎকার করে উঠলাম! তারপর আর কিছু মনে নেই। পরের দিন আমার সংজ্ঞা ফেরে আয়ুরালয়তে।

- তার মানে তুমিই চিৎকার করেছিলে? তোমার বন্ধুরা তোমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল। তারা আগে চিৎকার করেনি?

- না। তারা আমি আর্তনাদ করার কয়েক মুহূর্ত আগেই একে একে সংজ্ঞা হারায়।



- হুমম। তোমাদের লেখা ওই মন্ত্র বা আসল বইটা দেখা যায়?

- আচার্য, আমাদের লেখাগুলো তো পাবেন না। সেইদিন রাতে লোকজন শুধু আমাদের তুলে এনেছিল। আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র ওখানেই থেকে গিয়েছিল। শেষরাতে শুনেছি প্রবল বৃষ্টি আর তুফান হয়েছিল। সব ধুয়ে গেছে। ওই বই নষ্ট হয়ে গেছে।

জীবসিদ্ধি লক্ষ করল, বাসব কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। চাণক্য বললেন,

- ধন্যবাদ, কুমার। তুমি বিশ্রাম নাও।

কুমারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাসব বলল:

- আচার্য, ভেতরে তখন বলিনি, কিন্তু আমি আপনাদের একটা সাহায্য করতে পারি।

- কী সাহায্য, বাসব?

- ওই পুথি। ওটা নষ্ট হয়নি। আমি জানি ওটা কোথায় রাখা আছে।

- তাই নাকি? এ তো দারুণ সুসংবাদ। তুমি কীভাবে জানলে এই কথা?

- কুমার সুভাষের এ তথ্য জানা নেই। সেই রাতে লোকজন আর কিছু উদ্ধার না করলেও পুথিটাতে গ্রন্থাগারের মোহর দেখে তুলে এনেছিল। পরের দিন যখন কয়েকজন ওটা গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে যায়, সেইদিন সেই সময়ে আমি সেখানেই ছিলাম। সেখানেই আমার কাজের ভার ছিল। অন্তত আমি এটা জানি যে গ্রন্থাগারের কোন অংশে সেই বইটা রাখা আছে।

- বেশ, বেশ। তাতেই যথেষ্ট উপকার হবে। ওহে জীবসিদ্ধি, তুমি কি একটু কষ্ট করে সেই পুথিটা আমায় খুঁজে এনে দিতে পারবে? তবে আজ বা কালকের মাঝে একবার বাসবের সঙ্গে গ্রন্থাগারে যেয়ো।

- বেশ। নিশ্চয়ই যাব।

১০.

সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সেই বইটা খুঁজে পেয়েছে জীবসিদ্ধি ও বাসব। গ্রন্থাগারের কোন অংশে সেটা রাখা আছে, তা না জানা থাকলে এটা খুঁজে বের করাটা 'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা'র মতোই কঠিন হত। সেটা নিয়ে চাণক্যর ঘরে এসে জীবসিদ্ধি আচার্যকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পেল। পদ্মাসনে, চোখ বুজে গভীরভাবে ধ্যানে বসে আছেন তিনি। জীবসিদ্ধি জানে এই সময়ে ওঁকে বিরক্ত করা যাবে না। তাই সে অপেক্ষা করে বসে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চাণক্য চোখ খুললেন এবং জীবসিদ্ধিকে দেখে মৃদু হাসলেন। জীবসিদ্ধি তার সামনে রাখা পুথিটার দিকে নির্দেশ করে বলল:

- এই সেই বই, আচার্য।

- আহা। বেশ, বেশ। এটা আমি আজকেই একবার পড়ে দেখব। কাল সৈনিকদের দিয়ে ভালো খেজুরের রস আনিয়েছি। খুব সুন্দর। একবার স্বাদ নিয়ে দেখো হে, জীবসিদ্ধি।

উত্তর না দিয়ে জীবসিদ্ধি চুপচাপ বসে আছে দেখে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- কী প্রশ্ন করতে চাও সেটা করে ফেলো।

- আচার্য, পুরো বিষয়টা নিয়ে আপনি কি কোনো ধারণা করতে পেরেছেন?

নিজের টিকির চুলে হাত বোলালেন চাণক্য। বললেন,

- সত্যি বলতে আমার মনে হয় এখনও পুরো রহস্যটাই আমাদের সামনে আসেনি। বিষয়টা অনেক বেশি গভীর। তবে গত তিনদিনে ছাত্রদের, বাসব

এবং প্রধানাচার্যর বক্তব্য থেকে কয়েকটা বিষয় উঠে এসেছে।

- যেমন?

- যেমন, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা দৃশ্য দেখেছে। চার ছাত্রর মধ্যে তিন ছাত্র সম্পূর্ণ আলাদা বর্ণনা দিয়েছে। আমার মনে হয় চতুর্থজনও আলাদা কিছুই বলত। এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসি একটা মূল প্রশ্নে যার উত্তর আমার অজানা।

- কোন বিষয়?

- চার ছাত্রর মধ্যে কুমার কেন সবচেয়ে কম প্রভাবিত হল? সেইদিন চার জন একসঙ্গে সব কাজ করল। অথচ শুধু কুমার সুস্থ রইল। সে-ই একমাত্র ওই রাতে আর্তনাদ করতে পেরেছিল। বাকিরা তা করতে পারেনি। কেন?

- আপনি কি কুমারকে সন্দেহ করছেন?

- আমি সবাইকেই সন্দেহ করছি। কুমার যে সত্যি কথা বলছে তার কোনো প্রমাণ নেই। এদিকে, এই দু-জন ছাত্র যে অভিনয় করছে না তারই-বা প্রমাণ কই? যদিও এত নিখুঁত অভিনয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

- আপনি কি সন্দেহ করছেন এরা মাদক সেবন করেছিল?

- লক্ষণ তো তাই বলছে। মাত্রাতিরিক্ত সেবনের ফলে তাদের এই অবস্থা হয়ে থাকতে পারে।

- কিন্তু সেক্ষেত্রে বাকি প্রত্যেকের এই ভয়ের আর অদ্ভুত দৃশ্য দেখার কারণ কী?

- সেটাই সবচেয়ে বড়ো রহস্য। যদি না সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই পুরোপুরি মানুষের রটনা হয়ে থাকে। আদিকাল থেকেই মানুষ অতিপ্রাকৃত নিয়ে উৎসাহিত। তাদের মস্তিষ্ক অলৌকিকের সংস্পর্শে এলে অত্যন্ত প্রীত হয়।

- কিন্তু তাই বলে স্বয়ং প্রধানাচার্য?

- হুম। দেখো, ওঁর বয়স হয়েছে। বার্ধক্য মানুষকে বদলে দেয়। হতে পারে পুরোটাই তাঁর বার্ধক্যর কারণে ঘটেছে। তাঁর অনিদ্রা আর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া, সবই স্বাভাবিক কারণে হতে পারে। আর ওঁর দেখা ওই দৃশ্যটা যে ওঁর অন্তরের পুরোনো ব্যথার কারণে দেখেছেন তা আমি নিশ্চিত। ওই দৃশ্য ওঁর অতীতের সঙ্গে যুক্ত।

- কীরকম?

চাণক্য উঠে দু-পাত্র খেজুরের রস ঢেলে, এক পাত্র শিষ্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে অন্য পাত্র নিজে নিয়ে বসলেন। বললেন,

- ওঁর অতীতের কিছু ঘটনা আছে যা তুমি জানো না। আমি জানি। যৌবনকালে তিনি পড়াশোনা করতে নিজের পরিবার ছেড়ে এখানে চলে

আসেন। পরিবারের আপত্তি তিনি শোনেননি। কিন্তু ওঁর অবর্তমানে ওঁর দেশের গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাতে ওঁর স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে সারাজীবন তিনি নিজেকে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে এসেছেন। আচার্যপ্রমুখ বিশ্বাস করেন যে তিনি যদি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে পরিবারকে ত্যাগ করে না আসতেন, তবে হয়তো তাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে সক্ষম হতেন। ওঁর দেখা দৃশ্যে, ওঁরই হাতের প্রদীপের আগুন থেকে তাঁর পরিবারের শরীরে আগুন লাগে। এটা বৃদ্ধর মনের গভীরে লুকোনো গভীর অনুতাপের নিদর্শন। আমার মতে এটাই তাঁর দেখা ভয়ানক সেই দৃশ্যর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

- বেশ। আপনার যুক্তি আমি মানছি। কিন্তু তক্ষশিলায় ঘটে চলা সমস্ত বিষয়টাই শুধুমাত্র রটনা আর জনশ্রুতি এটা আমি মানতে পারছি না।

দু-চুমুক রস পান করে তৃপ্তির স্বরে আচার্য বললেন,

- আমি একবারও বলছি না যে সেটাই ঠিক ব্যাখ্যা। আমি শুধুমাত্র সম্ভাবনার কথা বলছি। তা ছাড়া, আমারও ধারণা বিষয়টা এতটা সরল নয়। বললাম না? আমার মনে হয় সম্পূর্ণ রহস্য এখনও আমাদের সামনে আসা বাকি।

- আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণ?

- বিশেষ কারণ নেই। এটা আমার স্বজ্ঞা বা একটা অনুভূতি। আরও একটা সম্ভাবনা আছে। প্রবল সম্ভাবনা আছে।

- কী সম্ভাবনা?

- হতে পারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকের ওপরেই মাদকের প্রভাব পড়েছে। এবং সেটা করা সম্ভব একমাত্র খাবার অথবা পানীয় জলের মাধ্যমে।

- সেটা নিশ্চিত করার উপায়?

- তোমায় কষ্ট করে আবার গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে।

- কোথায়?

- প্রধান পাকশালায়। কালকেই আমি আচার্যপ্রমুখর সুপারিশে তোমায় সেখানকার কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করব। তোমার কাজ হবে কয়েক দিন নজরদারি করা। কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি খাবারে কোনো অজানা কিছু জিনিস মিশিয়ে দিচ্ছে কি না তার ওপর নজর রাখা।

- বেশ। আর জলের বিষয়টা?

- প্রতিটা পানীয় জলের জন্যে ব্যবহৃত কুয়োর ওপর গোপনে নজর রাখবে আমাদের সঙ্গে আসা মগধের সৈনিকরা। সাধারণ কর্মীদের বেশে তারা এই কাজ করবে।

- উত্তম প্রস্তাব।

- হ্যাঁ, এতে আমরা...

কথার মাঝপথে বাধা পড়ল কারণ বাইরে থেকে একজনের ডাক শোনা গেল,

- আচার্য চাণক্য?

হাসিমুখে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- আচার্য দধিচ! আসুন, আসুন। আমি জানতাম আপনি আসবেন নিশ্চয়ই।

ঘরে ঢুকলেন চাণক্যরই সমবয়সি একজন মানুষ। ভারী চেহারা, উঁচু নাক। ওঁর সঙ্গেই ভেতরে ঢুকলেন আরও একজন। ইনিও স্থূলকায়, দীর্ঘাঙ্গি, প্রসন্নচিত্ত মুখাবয়ব। দু-জনেরই বেশ এবং ন্যাড়া মাথা– টিকি থেকে বোঝা যায় এঁরা দু-জনেই ব্রাহ্মণ এবং এখানকার আচার্য।

চাণক্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখে বললেন,

- আচার্য বুধাদিত্য! স্বাগতম। আসুন আসুন, আচার্যগণ। এত বছর পর আপনাদের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি আপ্লুত।

দু-জনে আসন গ্রহণ করলেন। আচার্য বুধাদিত্য কপট ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন,

- আমরা মোটেই আপনার ওপর প্রসন্ন নই, আচার্য চাণক্য। আপনি এসেছেন তিন দিন হয়ে গেল। অথচ এই পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে একবারও দেখা করতে এলেন না।

- বন্ধুরা, আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আসার পর থেকে একদিনও অবসর পাইনি। আমি আপনাদের সঙ্গে প্রথম সুযোগেই দেখা করতে অবশ্যই যেতাম। আমি সত্যি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনারা কি এক পাত্র করে খেজুরের রস পান করতে ইচ্ছুক? খুব সুস্বাদু এই রস।

আচার্য দধিচ বললেন,

- আহা। হয়েছে, হয়েছে। আপনার এই অত্যধিক মধু-দ্রব্য প্রীতি এত বছরেও ক্ষীণ হয়নি দেখছি। আগে বলুন এই তরুণ ব্রাহ্মণটি কে?

কৌতুক মিশ্রিত স্বরে চাণক্য বললেন,

- ভালো করে দেখুন তো কে? চিনতে পারছেন না?

- না তো।

জীবসিদ্ধি এগিয়ে তাঁদের প্রণাম করে বলল,

- আচার্যগণ, আমি জীবসিদ্ধি।

- জীবসিদ্ধি! সে কী? এ কী বেশ? তুমি তো ব্রাহ্মণবেশ ধরেছ দেখেছি।

- আজকাল এইটাই আমার বেশ, আচার্য।

- ভালো, ভালো। আয়ুষ্মান ভবঃ। এত বছর বাদে তোমাদের দেখা পেয়ে খুবই ভালো লাগল।

আচার্য বুধাদিত্য বললেন,

- আচার্য চাণক্য, আমরা কিন্তু একটা বিশেষ নিবেদন নিয়ে এসেছি।

- বলুন কী করতে পারি আমি আপনাদের জন্যে?

- আপনাকে অন্তত সপ্তাহে এক বা দু-দিন আমাদের ছাত্রদের সময় দিতে হবে।

এই কথার সমর্থন করলেন আচার্য দধিচ,

- হ্যাঁ, আচার্য চাণক্য। আমরা ছাত্রদের আপনার কাহিনি বহুবার শুনিয়েছি। তারা আপনাকে চাক্ষুষ করতে এবং আপনার থেকে জ্ঞান লাভ করতে অত্যন্ত উদগ্রীব। আমি চাই না তারা এমন সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোক। আমরা চাই আপনার জ্ঞান, আপনার জীবনদর্শন এবং যুগান্তকারী ভাবনা আপনি ছাত্রদের সঙ্গে ভাগ করে নিন।

প্রণাম জানিয়ে চাণক্য বললেন,

- আমায় এই সুযোগ করে দেয়ার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি আগামী কয়েক দিনে সেই অবসর আমি পাব। আগামী কয়েক দিন আমার বিশেষ কাজ নেই। কাজ প্রধানত জীবসিদ্ধির।

১১.

পরের কয়েকটা দিন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। জীবসিদ্ধি পাকশালায় নজরদারি করে আর বাকি সৈনিকরা ব্যবহৃত জলের কুয়োগুলোর। রাতের বেলা এসে তারা শুধু চাণক্যকে খবর দিয়ে যায়। কিন্তু এখনও অবধি উল্লেখযোগ্য কিছুই তাদের কারুরই নজরে পড়েনি। চাণক্য তাদের আরও দিন পনেরো নজরদারি চালিয়ে যেতে বলেছেন। চাণক্য সেই বইটা পড়া শুরু করেছেন। মূল ক্রিয়া অবধি পৌঁছোতে এখনও সময় লাগবে। অনেক পাতা সেই পুথিটাতে। তবে এর থেকে বিশেষ কিছু খুঁজে পাওয়ার আশা চাণক্য রাখেন না। তিনি যতদূর বুঝতে পারছেন এগুলো সমস্ত অদ্ভুত উন্মাদের প্রলাপ লেখা। বিশ্বাসযোগ্য বা বিজ্ঞানসম্মত কোনো তথ্য এখানে লেখক দেননি। এইসব লেখা কিশোরদের আকৃষ্ট করে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁকে নয়। তিনি বার বার পড়তে গিয়ে ধৈর্য হারাচ্ছেন।

এর মাঝে শুধু মগধ থেকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠির বক্তব্য এইরকম,

প্রিয় জীবসিদ্ধি,

তোমাদের কুশল সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার চিঠিতে তক্ষশিলার এরকম আশ্চর্যজনক পরিস্থিতির কথা শুনে হতবাক হয়েছি। আমার ধারণা এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়িয়ে দেয়ার চক্রান্ত। আমি বিশ্বাস রাখি আচার্য এবং তুমি খুব তাড়াতাড়িই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে।

এদিকেও সব কুশল আছে। আচার্যকে জানিয়ে দিয়ো যে আমরা লুণ্ঠিত হওয়া স্বর্ণমুদ্রা ফিরে পেয়েছি। যদিও দস্যুরা ধরা পড়েনি। যেরকম ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে, সেই স্বর্ণমুদ্রা রাজকীয় সম্পত্তি বুঝতে পেরে তারা আর সেটা

ব্যবহার করতে পারেনি। পুরোটাই কয়েক দিন আগে, লুকিয়ে এক সৈনিক শিবিরের দরজায় রেখে দিয়ে গেছিল। অতএব, আচার্যকে এই নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতে বোলো। ওদিকের খবর দূত মারফত দিতে থেকো।

শুভেচ্ছা রইল।

ইতি,

চন্দ্রগুপ্ত।

এদিকে আচার্য চাণক্য ছাত্রদের মধ্যে সময় কাটাতে শুরু করেছেন। অনেক বছর পর নিজেকে আবার আগের মতো শিক্ষকের ভূমিকায় ফিরে পেয়ে তিনি নিজেও প্রফুল্ল। চাণক্য এই মুহূর্তে বসে আছেন আচার্য বুধাদিত্যর আশ্রমের প্রাঙ্গণের একটা বটগাছের তলায়, বাঁধানো বেদিতে। তাঁর সামনে বসে আছে এক ঝাঁক তরুণ ছাত্র।

- বিদ্যা। বিদ্যা কী? প্রয়োজনই-বা কী বিদ্যালাভ করার?

ছাত্রদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন চাণক্য,

- নির্ধনের একমাত্র ধন হল বিদ্যা। বিদ্যা হল এ যুগের কামধেনুস্বরূপ।* যে সম্পদ, তোমার থেকে কোনোদিন চোরও চুরি করতে সক্ষম হবে না, সেই সম্পদ হল বিদ্যা। সংকটের সময় যদি সব বন্ধু তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে, তবু যে চিরসঙ্গী কখনো তোমায় ছেড়ে যাবে না, সেই বন্ধু হল বিদ্যা। একজন মূর্খর জন্যে একটা বইয়ের ততটাই উপযোগিতা আছে, যতটা একজন অন্ধর কাছে আয়নার। পৃথিবীতে একমাত্র মূর্খ ব্যক্তিই বিদ্যার মূল্য বোঝে না।

মনে রাখবে, ঠিক যেভাবে একটা ফুল তার চারপাশে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়, সেভাবেই একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার আশেপাশের মানুষের মধ্যেও জ্ঞানের জ্যোতির সঞ্চার করে। শিক্ষা বিনা উচ্চকুল, যৌবন, সৌন্দর্য সবই বৃথা। অনেকটা পলাশ ফুলের মতো, তা দেখতে তো সুন্দর কিন্তু সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে অক্ষম।** তাই মূর্খর সঙ্গ ত্যাগ করো এবং জ্ঞানীর সঙ্গ নাও। এতেই উন্নতি। এই জগতে জ্ঞান হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং ঠিক মুহূর্তে, ঠিক ব্যবহারে সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

এর পরের দিনের জন্যে তোমাদের আমি একটা বিষয় ভাবতে বলব। সাফল্যর মূলমন্ত্র কী? আমি চাই আগামী কয়েক দিন তোমরা এই বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো। পরের সাক্ষাতে আমি তোমাদের প্রত্যেকের মতামত শুনব। ঠিক আছে?

ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে চাণক্যেকে প্রণাম জানিয়ে একে একে চলে যেতে

থাকল। তখনই আশ্রমের দিক থেকে আচার্য বুধাদিত্যর আওয়াজ শোনা গেল,

- সাধু সাধু! আমি নিশ্চিত যে ইতিহাসের পাতায় আপনার এই বচনগুলো লেখা থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে পথ নির্দেশ করবে।

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

- অনেক ধন্যবাদ, আচার্য।

হঠাৎ কিছু একটা যেন মনে পড়ে যাওয়ায় আচার্য বুধাদিত্য বেরোতে থাকা ছাত্রদের উদ্দেশে ডাক দিলেন,

- ওহে! সত্যকাম।

একজন ছাত্র পেছন ফিরে চাইল। তাকে বুধাদিত্য বললেন,

- তুমি অপেক্ষা করো। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বাকিরা যেতে পারো।

'কঠোর গুরু' হিসেবে আচার্য বুধাদিত্যর খ্যাতি আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই তাঁর তলব পেয়ে ছাত্রটি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়েছে। তার মুখের অভিব্যক্তি এবং দৃষ্টি দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ছাত্রটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল,

- আজ্ঞে, আচার্য?

- তোমার ঘরে সুগন্ধি তেল এল কোথা থেকে?

চমকে উঠল ছাত্রটি। বিদ্যার্থীদের এইখানে প্রায় সন্ন্যাস জীবন কাটাতে হয়। এটাই নিয়ম। অতএব, কোনোরকম প্রসাধনী বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস তাদের সঙ্গে রাখা নিষেধ।

আচার্য বুধাদিত্য আবার প্রশ্ন করলেন,

- বলো! চুপ করে থেকো না। উত্তর দাও। এই তেল তোমায় কে এনে দিয়েছে? তুমি জানো না যে শৃঙ্গার সামগ্রী ছাত্রদের জন্যে নিষিদ্ধ?

ভয়ে চোখ না তুলেই ছাত্রটি বলল:

- আমায় ক্ষমা করবেন, আচার্য। ওই সুগন্ধি আমি ফেলে দেব।

- কে এনে দিয়েছে আগে সেটা বলো। কাউকে আড়াল করার চেষ্টা কোরো না।

- কেউ এনে দেয়নি, আচার্য। ওটা... ওটা আমি নিজেই খুঁজে পেয়েছি।

- অসত্য বলছ তুমি! এই তেল মূল্যবান। খুঁজে পেয়েছ মানে কী?

- আমি সত্যি বলছি, আচার্য। আমি ওটা বাইরে থেকে আনাইনি।

- কোথা থেকে পেয়েছ তবে? তবে কি তুমি চুরি করেছ? কোনো আচার্য বা কর্মীর জিনিস চুরি করেছ? শেষে চৌর্যবৃত্তি?

ছাত্রটি এইবার কেঁদে ফেলল,

- না, আচার্য! আপনি বিশ্বাস করুন, আমি দোষ করিনি। ওটা আমি উত্তরের জঙ্গলে একটা খাদের থেকে পেয়েছি।

- কোথা থেকে?

- আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে ওদিকে খেলছিলাম। তখনই সুশীল খাদের ভেতর জঙ্গলে একটা পেটি পড়ে থাকতে দেখে। আমরা কৌতূহলী হয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা তুলে আনি। তাতেই এই সুগন্ধি তেলটা পাই।

- সে কী? একথা আগে তো বলোনি। আমায় বলা উচিত ছিল। তার থেকে আর কী কী নিয়েছিলে তোমরা?

- আচার্য, আমি শুধু ওটাই নিয়েছিলাম। ওতে কিছু ভালো পোশাকও ছিল। কিন্তু সেগুলো সবই কোনো বড়ো মানুষের। তাই সেগুলো আমরা আর নিইনি। কয়েকটা বই, আতর, আরও কিছু সামান্য জিনিস ছিল, সেগুলো আমরা নিজেরা রেখে দিই।

- খুব অন্যায় করেছ। চুরি করনি বলে এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সেই পেটি থেকে নেয়া প্রতিটা জিনিস আমায় দিয়ে যাবে। তোমার বন্ধুদেরও তাই করতে বলবে। বুঝেছ?

- তাই হবে, আচার্য। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

- বেশ। এবার তুমি আসতে পারো।

ছাত্রটি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার বাধা পেল।

- দাঁড়াও।

এইবার তাকে আটকেছেন আচার্য চাণক্য। চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি। বললেন,

- ওই পেটি কি তোমার কাছে আছে?

- না, আচার্য। আমরা তো ওটা ওখানেই ফেলে এসেছি।

- আমায় সেই জায়গাটা দেখাতে পারো?

কিশোরটি বেশ অবাক হয়েছে। আচার্য বুধাদিত্যও অবাক হয়েছেন বটে। হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত পেটি নিয়ে চাণক্যর এরকম কৌতূহলের ব্যাখ্যা তিনি পাচ্ছেন না।

চাণক্য আবার প্রশ্ন করলেন,

- বলো? আমায় নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?

- হ্যাঁ। অবশ্যই, আচার্য।

- তবে এখনই নিয়ে চলো দেখি।

ছেলেটা আরও হতভম্ব হল। আচার্য বুধাদিত্য কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। কারণ চাণক্যর মুখের ভাব গম্ভীর। ছাত্রটি বলল:

- বেশ, আসুন আমার সঙ্গে, আচার্য।

বেশ কিছুটা পথ হাঁটার পর চাণক্য এবং বুধাদিত্য ছাত্রটির সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছোলেন। খাদের একটু নীচে একটা কাঠের পেটি দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আনা দড়ির মাথায় পাথর বেঁধে, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় নীচের ওই পেটির হাতলে ফাঁস লাগল। সেটা টেনে তুলতে তিনজনের খুব বেশি

অসুবিধে হল না। ছাত্রটির কথা মতোই, সেটা খুলে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। পোশাক, এক জোড়া পুরোনো জুতো, কয়েকটা নথি ইত্যাদি। পোশাকগুলো আর পেটির অবস্থা দেখে অনুমান করা যায় যে বেশ অনেক মাস ধরে এগুলো এখানে পড়ে। যদিও কাপড়ের ভাঁজ এখনও স্পষ্ট। অর্থাৎ, এগুলো মোটেই পুরোনো বা ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র নয়। কিছু ভূর্জপত্র তাতে আছে। যদিও লেখা অস্পষ্ট। কিন্তু এইটুকু বোঝা যায় এগুলো জীববিদ্যা ও রসায়নের ওপর লেখা কোনো নথিপত্র। পেটির ঢাকনা বন্ধ করে চাণক্য উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত থেকে ধুলো ঝাড়লেন। ওঁর কপালে গভীর ভ্রূকুটি। মুখে চিন্তিত ভাব স্পষ্ট। বুধাদিত্য প্রশ্ন করলেন,

- কী হয়েছে, আচার্য চাণক্য? এই ফেলে দেওয়া পেটিটাকে নিয়ে আপনি এত চিন্তিত কেন?

চাণক্য প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। শুধু নিজের মনেই বললেন,

- আচার্য বিন্দাচল মনে হয় তক্ষশিলা ছেড়ে যাননি।

*চাণক্যনীতি- ৪.৫, **চাণক্যনীতি- ৩.৮*

১২.

সেইদিন রাতের দিকে, চাণক্যর ঘরে চাণক্য জীবসিদ্ধির সঙ্গে আলোচনারত।

- এই জিনিসপত্র যে আচার্য বিন্দাচলেরই, সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে, আচার্য?

- ইঙ্গিত তাই পাওয়া যাচ্ছে না কি?

- কিন্তু তাঁর পেটি হঠাৎ তিনি ফেলে দিয়ে উধাও হবেন কেন? সেগুলো নিজের বাড়িতে রেখে না গিয়ে, সঙ্গে নিলেন। তারপর আবার ফেলে দিলেন?

- হুমম। সম্ভবত এই কাজটা করা হয়েছে, সবাইকে এই ধারণা দিতে যে তিনি এখানকার অধ্যাপনা ছেড়ে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছেন। সব ছেড়ে তিনি উধাও হলে লোকের সন্দেহ হত।

- কিন্তু তারপর সেগুলো ফেলে দেবেন কেন? আপনি কি সন্দেহ করছেন তিনি এখানকার এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত?

- সবই সম্ভাবনা। হয়তো তিনি আচার্যর বেশ ছেড়ে, অন্য কোনো ছদ্মনাম ও ছদ্মপরিচয়ে গত এক বছর ধরে লুকিয়ে আছেন। আবার অন্য একটা সম্ভাবনাও আছে।

- কী সম্ভাবনা?

- নিজেই ভেবে দেখো। আমি বলব না।

জীবসিদ্ধিকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাল। চাণক্য তাকে প্রশ্ন করলেন,

- ওহে জীবসিদ্ধি, তোমার শরীর সুস্থ আছে তো? পাকশালায় গুপ্তচরের কাজে কি খুব বেশি পরিশ্রম হচ্ছে নাকি?

- না, আচার্য। তা নয়। তবে সামান্য মাথাব্যথা আছে। সম্ভবত কাল বৃষ্টিতে ভেজার ফল।

- হুমম। তুমি এইবার ওই পাকশালার কাজটা বন্ধ করতে পারো। খাবারে যে কিছু সমস্যা নেই তা তো প্রায় নিশ্চিত। আর লাভ নেই নজরদারি চালিয়ে।

- বেশ। তাই হোক। তাহলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

- একবার আচার্য বিন্দাচলের বাড়ি আর গবেষণাগারটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ওটার তত্ত্বাবধান তো এখন জীববিদ্যার নতুন আচার্য এবং বাসব করছে। তাই না?

- বাসব তো তাই বলল।

- তবে তো সহজেই একবার পরীক্ষা করা যায়। বাসবকে কালকেই সেখানে একবার নিয়ে যেতে বলব।

তখনই বাইরে থেকে কেউ দরজায় করাঘাত করল। চাণক্য দরজার দিকে চেয়ে বললেন,

- এত রাত্রে আবার কে এল?

জীবসিদ্ধি গিয়ে দরজা খুলে দিতে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখা গেল। হাতে মশাল। দৌড়ে আসার কারণে হাঁফাচ্ছে। লোকটা বলল:

- আচার্য চাণক্য?

ভেতর থেকে চাণক্য উঁকি দিলেন,

- বলুন?

- আচার্য, আমি আয়ুরালয় থেকে আসছি। প্রধানাচার্য আপনাকে খবর দিতে বললেন। এক ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে।

- সেকী? কাকে? কখন ঘটল?

- কিছুক্ষণ আগেই। ছাত্রর নাম সুনাভ। আপনারা কি অনুগ্রহ করে আসবেন একটিবার?

- হ্যাঁ। অবশ্যই।

ভৃত্যর সঙ্গে দু-জনে এসে পৌঁছেছে আয়ুরালয়ে। সর্বক্ষণ শান্ত থাকা আয়ুরালয়তে এই মুহূর্তে কোলাহল চলছে। ভেতরে ঢুকে সুনাভর ঘরে পৌঁছে চাণক্য দেখলেন স্বয়ং প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের দিকে করুণ

দৃষ্টিতে চাইলেন। ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ। সামনে পড়ে আছে সুনাভর দেহ। চোখ খোলা, হাত-পা বাঁধা, মুখে আতঙ্কিত দৃষ্টি। প্রথম দৃষ্টিতে শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না, তবে চাণক্য সামনে গিয়ে দেখলেন তার শ্বাসনালির জায়গায় নীলচে আঘাতের চিহ্ন। কেউ প্রচণ্ড আঘাত করেছে তার গলায়। আর তাতেই গলার তরুণ-অস্থি* ভেঙে কিশোরটির মৃত্যু হয়েছে। আচমকা চাণক্য ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। চারটে ঘর পরেই পুষ্পলের ঘরে ঢুকলেন।

তারও হাত-পা বাঁধা। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মুহূর্তের আশঙ্কায় চাণক্যর হৃদয়ের গতি বেড়ে গেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই পুষ্পলের বুক ওঠা-নামা করতে দেখে ওঁর বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন আয়ুরালয়ের কর্মীদের। তিন জন এগিয়ে এল। তাদের উদ্দেশে বললেন,

- এই ঘরে সর্বক্ষণ অন্তত দু-জন পাহারায় থাকবে। এই মুহূর্ত থেকে কোনো অজানা মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল। মনে রেখো, এই ছাত্রর প্রাণ বিপন্ন।

তাদের পাহারায় রেখে তিনি ফিরে এলেন সুনাভর ঘরে। চাণক্য মৃতদেহর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার খোলা চোখ বন্ধ করে দিলেন। সেখানে উপস্থিত আয়ুরালয়ের দুই কর্মীর উদ্দেশে বললেন,

- অনুমান করতে পারি, রাতে এই ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়ে বলে প্রতি রাতে আপনারাই তাদের হাত-পা বেঁধে রাখেন। কিশোরটি মৃত্যুর আগে, তার হত্যাকারীকে দেখে আর্তনাদ করেছিল। কিন্তু আপনারা সেটাকে রোজকার উন্মাদনা ভেবে কেউ দেখতে আসেননি। তাই না?

দু-জন মাথা নীচু করল। চাণক্য আবার তাদের উদ্দেশে বললেন,

- ওপরের তলায়, কয়েক দিন আগে পর্যন্ত পুষ্পল ছিল। বর্তমানে সেই ঘরে কেউ আছে?

একজন না জানলেও অন্যজন বলল:

- না, আচার্য। বর্তমানে সেই ঘরে কেউ নেই।

- হুমম। যাক।

চাণক্য আরও একবার ঝুঁকে পড়লেন মৃতদেহর ওপর। গলার আঘাতটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে প্রধানাচার্যকে বললেন,

- চলুন, আচার্যপ্রমুখ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

- এ কোন অভিশাপ লাগল এই বিদ্যামন্দিরে? কোন অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর?

- অভিশাপের বিষয়ে আমি বলতে পারব না। তবে এই কাণ্ডটা কোনো অপদেবতার কাণ্ড নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী আচার্য-জ্যেষ্ঠ। আমি সত্যি এই হত্যাকাণ্ডর কোনো পূর্ব আশঙ্কা করিনি। এটা আমার দোষ।

বেরিয়ে এসে জীবসিদ্ধি প্রত্যেককে করণীয় কী, তা বুঝিয়ে দিল। কাল সকালে এখানকার ন্যায়রক্ষী শিবিরে খবর দিতে হবে। এটা হত্যা, সরকারি পক্ষ থেকে তদন্ত হবে।

সেই রাতের মতো কর্তব্য মিটিয়ে, বৃদ্ধ প্রধানাচার্যকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে নিজেদের পথ ধরলেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। কিছুক্ষণ দু-জনেই কিছু বললেন না। চুপচাপ পথ চললেন। অন্ধকার পথ, দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে স্থাপত্য এবং স্তূপ। আজকে আকাশে মেঘ, তাই অন্ধকার চারিদিক। একটা মশাল হাতে জীবসিদ্ধি সামনের পথ কিছুটা আলোকিত করে চলছে চাণক্যর পাশাপাশি। একটা গাছে কোনো এক রাতপাখি করুণ স্বরে ডেকে উঠল। অকারণে যেন সেই শব্দে চমকে উঠল জীবসিদ্ধি। বহু বছরের চেনা এই পথ, এই গাছ, এই পরিবেশ। তবু এই পরিস্থিতিতে সব কেমন যেন অচেনা লাগছে তার। এই নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগছে জীবসিদ্ধির। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতেই প্রশ্ন করল জীবসিদ্ধি,

- আচার্য, কী ভাবছেন?

সঙ্গেসঙ্গে উত্তর দিলেন না চাণক্য। একটু দেরি করে উত্তর দিলেন,

- একটা রহস্যর রেশ কাটতে-না-কাটতেই আরও একটা রহস্য এসে হাজির হচ্ছে। এই ছাত্রদের ওপর কে হামলা করতে পারে এই মুহূর্তে আমি ভেবে পাচ্ছি না।

- ছাত্রদের?

- পুষ্পলকেও আজ হত্যা করা হত আমি নিশ্চিত। তার ঘর পরিবর্তন হওয়াতে সে বেঁচে গেল।

- তার মানে তৃতীয় ছাত্র, অর্থাৎ কুমারেরও প্রাণহানির আশঙ্কা আছে?

- অবশ্যই। আগামীকাল সর্বপ্রথম তাকে জানিয়ে সতর্ক করতে হবে।

অতিথি-নিবাস এসে গেছে। চাণক্য জীবসিদ্ধিকে বললেন,

- ঘুমিয়ে পড়ো হে, জীবসিদ্ধি। তোমার চোখে অনিদ্রার চিহ্ন দেখছি। কাল থেকে আর পাকশালায় যেতে হবে না। তুমি বোধ হয় একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করছ।

জীবসিদ্ধি একটু ইতস্তত করে বলল:

- রাতে ঘুম আসতে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে বটে।

- বেশ। দুশ্চিন্তা বাদ দাও। ওটা গুরুর ওপর ছাড়ো হে। শুভরাত্রি।

- শুভরাত্রি, আচার্য।

দু-জন নিজের নিজের দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকেই চাণক্য ডাক দিলেন,

- জীবসিদ্ধি!

জীবসিদ্ধি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার চাণক্যর দরজায় ফিরে এল,

- বলুন, আচার্য।

চাণক্য দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তাতেই আলো হয়ে আছে কিছুটা। চাণক্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে দেখছেন। জীবসিদ্ধি আবার প্রশ্ন করল,

- কী হয়েছে, আচার্য?

তার দিকে না তাকিয়েই চাণক্য বললেন,

- আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল। জানলা খোলা, দেখো।

- সে কী? আপনি নিশ্চিত?

- হুমম।

- চোর? কিছু তো নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সব জায়গামতো আছে।

- নিয়েছে। একটা জিনিস তার জায়গায় নেই।

- কোন জিনিস?

শান্ত স্বরে জবাব দিলেন চাণক্য,

- ওই তন্ত্র বইটা!

গ্রীবা- neck region, তরুণঅস্থি- cartilage [ref. 14]

১৩.

চাণক্য প্রথমেই ঘরের কোনায় গিয়ে বিন্ধ্যাচলের পুরোনো কাঠের পেটিটা খুলে দেখলেন। কিছুক্ষণ ভালো করে প্রতিটা জিনিস দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

- আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল এইটা থেকে হয়তো কোনো জিনিস চুরি যাবে। কিন্তু এটা যেমন রেখে গেছিলাম সেরকমই আছে। চুরি গেছে শুধু ওই পুঁথিটা। ওই চারপায়ার ওপরেই রেখেছিলাম। এখন নেই সেটা।

- ওই বই আপনি কতটা পড়েছিলেন?

- বেশিটা নয়। সামান্যই। আশ্চর্য লাগছে আমার। ওই বইয়ে যে গুরুতর কিছু থাকতে পারে আমার একবারও সেটা মনে হয়নি। ওটা অতি নিম্নমানের অলৌকিক মনগড়া তন্ত্র-মন্ত্র লেখা বই বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। এই পুরো ঘটনায় ওটার যে কোনো বিশেষ কার্যকারিতা নেই, সেটা আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম।

- কিন্তু সেই বই চুরি হয়েছে যখন, তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

চাণক্য নিজের আসনে বসলেন। প্রদীপের শিখার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। ভাবছেন কিছু। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন,

- আজকে রাতে সব কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটছে। প্রথমে ওই ছাত্রটিকে হত্যা করা হল, আর তারপর আমার নিজের ঘর থেকে বইটা চুরি গেল। আমার ভাবনায় কোথাও ভুল হয়ে গেছে, জীবসিদ্ধি। নিজেকে খুব মূর্খ মনে হচ্ছে।

জীবসিদ্ধি কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে নিজেও একটা আসনে বসল। বলল:

- সুনাভ নামের ছাত্রটির জন্যে সত্যি হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে।

- হুমম। কতটা ভয়ংকর, ভাবো জীবসিদ্ধি। তাকে এবং পুষ্পলকে রাতে আয়ুরালয়ের কর্মীরাই হাত-পা বেঁধে রাখছে, যাতে তারা নিজেদের শরীরে কোনো আঘাত করতে না পারে। ব্যাপারটা যতই নির্মম মনে হোক, এই পরিস্থিতিতে এইটাই একমাত্র উপায়। তাদেরই মঙ্গলের জন্যে এটা করা হচ্ছিল। এদিকে সেই সুযোগ নিয়েই হত্যাকারী অতি সহজে তাকে হত্যা করল। বেচারা নিজের চোখে বিপদ আসতে দেখেও বাধা পর্যন্ত দিতে পারল না। হত্যাকারীকে দেখে আর্তনাদ করল, সেটাও কর্মীরা রোজকার চিৎকার ভেবে কেউ আর সাহায্যর জন্যে এগিয়ে এল না।

- সেটাই। ভাবলেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে। আচ্ছা আচার্য, আপনার কি বাসবকে সন্দেহ হয়?

উত্তরে চাণক্য পালটা প্রশ্ন করলেন,

- তোমার কি তাকে সন্দেহ হয়?

- হ্যাঁ, হয়। সে-ই তো জানত যে এই বই আপনার কাছে আছে।

- বাসব যে অন্য কাউকে একথা এতদিনে বলে দেয়নি সে-বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? আমার তো মনে হয় এতদিনে অর্ধেক তক্ষশিলা জেনে গেছে যে আমরা অনুসন্ধান করতে এসেছি এবং সেই বই আমার কাছে আছে। তা ছাড়া গ্রন্থাগারে কেউ তোমাদের নজর করেনি, সে-বিষয়ের নিশ্চয়তা কী?

- আপনি বাসবকে সন্দেহ করেন না তার মানে?

- না। তার কারণ, যদি তার এই বইটা আমাদের থেকে লুকানোরই হত, তবে সে প্রথমে আমাদের সেটা খুঁজে পেতে সাহায্য করত না।

- আর এই হত্যার ব্যাপারে? যদিও তার হত্যা করার কোনো কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

- না। হত্যাকারী হিসেবে বাসবকে কখনোই সন্দেহ করা যায় না। আমি নিশ্চিত যে হত্যাকারী আর যে-ই হোক, বাসব নয়। তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। তুমি কি অনুমান করতে পারছ?

- না। আপনিই বলুন যে আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?

- তার কারণ এই ক্ষেত্রে পুষ্পলকে হত্যা করা হয়নি। হত্যাকারী জানত না যে পুষ্পলকে মাত্র কয়েক দিন আগেই দোতলার ঘর থেকে নীচে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে বাসব সেটা জানত। বাসব নিজে আমাদের সুনাভ এবং পুষ্পলের ঘরে নিয়ে গেছিল। অতএব, বাসব হত্যাকারী হলে আজ শুধু সুনাভ নয়, পুষ্পলকেও হত্যা করা হত।

- অকাট্য যুক্তি, আচার্য।

- হুমম। কিন্তু আমার বড়োই অনুশোচনা হচ্ছে, জীবসিদ্ধি। ওই বইটা... ওটা যদি আমি আলস্য না করে এতদিনে পড়ে ফেলতাম, তবে হয়তো রহস্যর

সমাধানের একটা সূত্র সহজেই পেতাম। কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনা কম।

জীবসিদ্ধি কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। সেটা লক্ষ করে চাণক্য বললেন,

- কী বলতে চাও, বলো।

অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে জীবসিদ্ধি ধীরে ধীরে বলল,

- আচার্য, অশুভ বলে কি সত্যি কিছু নেই? আমাদের জানার বাইরে কি কিছুই নেই?

- কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো।

- আচার্য, এই তক্ষশিলায় আমার একটা অশুভ অনুভূতি হচ্ছে। আমার কেন জানি না নিজের ঘরে একা থাকলে মন ভারাক্রান্ত লাগে।

চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি দৃশ্যমান। প্রদীপের হলুদ আলোয় ওঁর জ্বলজ্বলে চোখ শিষ্যকে পর্যবেক্ষণ করছে। প্রশ্ন করলেন,

- জীবসিদ্ধি, আমায় সত্য বলো। গোপন করবে না। তুমি কি কিছু দেখেছ?

'না' সূচক ঘাড় নাড়ে জীবসিদ্ধি,

- না, আচার্য। আমি কিছুই দেখিনি। কিন্তু আমার ঘরে একা থাকলে সর্বক্ষণ মনে হয় কেউ যেন আমায় দেখছে। গোপনে আমার ওপর নজর রাখছে।

- ভয় লাগে?

- ভয় নয় ঠিক। কিছুটা বিষণ্ণ লাগে। একটা অশুভ অনুভূতিতে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে আজকাল।

চকিতে উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। এগিয়ে গিয়ে বসলেন ঠিক জীবসিদ্ধির সামনে। নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

- তোমার হাতটা দাও।

- হাত? কেন?

- দাও।

জীবসিদ্ধি চাণক্যর বাড়িয়ে দেয়া হাতে নিজের ডান হাতটা রাখল। চাণক্য জীবসিদ্ধির বুড়ো আঙুলের গোড়ায় আঙুল চেপে মনে মনে গুনতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর হাত ছেড়ে বললেন,

- নাড়ির গতি ও রক্তচাপ সামান্য বেশি। কাল সকালে আরও একবার দেখব। তবেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে।

- আচার্য! আপনি কি সন্দেহ করছেন আমার শরীরেও মাদক জাতীয় কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে? কিন্তু এ যে অসম্ভব!

- তুমি নিশ্চিত যে তুমি স্বপাক ছাড়া অন্য কোনো খাবার খাওনি?

- আমি নিশ্চিত! এই বিষয়ে আপনি আশঙ্কা প্রকাশ করার পর থেকেই আমি খুব সাবধান থেকেছি। খাবারের মাধ্যমে আমার শরীরে কিছুই ঢুকতে পারবে না। তবে হ্যাঁ... জল পান করেছি।

- না। জলে কিছু থাকলে, আমার শরীরেও তার লক্ষণ দেখা যেত। একই জল আমিও পান করছি। সৈনিকরাও সন্দেহজনক কিছুই দেখেনি এতদিনে।

- আচার্য, আপনার কোনোরকম অনুভূতি হচ্ছে না?

- না।

- তার মানে আপনি অভিশাপ, অপদেবতার বিষয়টা বিশ্বাস করছেন না?

- না। তার কারণ আছে, জীবসিদ্ধি।

- কী কারণ?

- এই কয়েক দিন আমি যে ছাত্রদের মাঝে সময় কাটিয়েছি, সেটা শুধুই তাদের নীতিকথা আর বাণী শোনাতে নয়। সময় সুযোগ মতো আমি তাদের থেকে এই ভয় পাওয়ার বিষয়টা জেনেছি। আর তার থেকেই একটা চমৎকৃত তথ্য উঠে এসেছে।

- কী তথ্য, আচার্য?

- এই ভয় আর বিষণ্ণতার অনুভূতি অনেকের মধ্যেই, অনেক আগে থেকেই দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কয়েক মাস আগে, সেই রাতে ওই চার জনের তন্ত্রক্রিয়া করার আগে থেকেই বেশ কয়েকজনের মধ্যে এই লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা তারা নেহাতই মনের ভুল মনে করে চিন্তিত হয়নি। ওই রাতের ঘটনার পর ব্যাপারটা লোকমুখে বেশি ছড়িয়ে গেছে। মানবমন তাদের মনের সুপ্ত ভয়কে সেই কাণ্ডর সঙ্গে জুড়েছে মাত্র। নিজেদের মনে বাসা বেঁধে থাকা সুপ্ত ভয়কে অবলম্বন দিয়েছে মাত্র, চার ছাত্রর সেই তন্ত্রক্রিয়া।

- আপনি বলতে চাইছেন যে সেইদিন রাতের ঘটনার সঙ্গে, রোজকার এই ঘটনাগুলোর সম্পর্ক নেই?

- সেরকমই মনে হয়েছিল আমার। অন্তত সেই রাতের তন্ত্রক্রিয়াকে কখনোই এখানকার বাসিন্দাদের মনের ভয়ের, বা ভয়ানক দৃশ্য দেখার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কিছু কিছু বাসিন্দা অনেক আগে থেকেই এই অনুভূতির শিকার হয়েছে।

- কিন্তু তাই যদি হবে আচার্য, তাহলে সুনাভকে কেন হত্যা করা হল? আর এই বইটাই-বা কী কারণে চুরি হল?

- ঠিক এই বিষয়টাই আমায় সবথেকে বেশি ভাবিত করছে। আমিও প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে ওই রাতের ঘটনাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই কারণেই আমার কাছে ছাত্রদের হত্যার চেষ্টা এবং এই বই চুরি হওয়াটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এখন আমারও মনে হচ্ছে যে এই তন্ত্রক্রিয়ায় কিছু একটা রহস্য আছে। এবং সেটাই ভেবে বের করতে হবে।

- জটিল।

- হুমম। অত্যন্ত জটিল। তবে আমি তোমায় নিশ্চিত করে বলতে পারি জীবসিদ্ধি, যে, এটা কোনো অশুভ অপশক্তির কাজ নয়। এখানে যা ঘটেছে

এবং যা ঘটছে তা অত্যন্ত সুকুশল কোনো মানব মস্তিষ্কের ষড়যন্ত্র। তাই মনে জোর রাখো, জীবসিদ্ধি।

- কিন্তু... কিন্তু আমার শরীরে মাদক কীভাবে প্রবেশ করল?? আমি তো কিছুতেই সেটা অনুমান করতে পারছি না।

- আমিও পারছি না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে মুহূর্তে এই প্রশ্নর উত্তরটা আন্দাজ করতে পারব, সেই মুহূর্তে সব রহস্যজাল থেকে পর্দা উঠে যাবে।

জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়াল। বলল:

- অনেক রাত হয়েছে, আচার্য। এবার আপনি বিশ্রাম নিন। আমি আসি।

- শোনো। তুমি আমার ঘরে এসে ঘুমোও।

এই কথায় জীবসিদ্ধি লজ্জিত হল। মৃদু হেসে জীবসিদ্ধি বলল,

- না, না। তার প্রয়োজন নেই। আমি অতটাও দুর্বল নই।

- না। এটা আমার আদেশ। তুমি এই ঘরেই রাতে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করো। আমি কোনো দ্বিরুক্তি শুনতে চাই না।

- বেশ। তবে এতে আপনারই অসুবিধে, আচার্য।

- কোনো অসুবিধে নয়। তোমার ভালো ঘুম হওয়া প্রয়োজন।

ঘরের একদিকে চাণক্যর শয্যা, আর উলটো দিকে জীবসিদ্ধি মেঝেতে শয্যা পাতল। রাতে প্রদীপ নিভিয়ে শয্যা নেয়ার আগে চাণক্য বললেন,

- আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, জীবসিদ্ধি। চাণক পুত্র, বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য কথা দিচ্ছে, আমি এই রহস্যর সমাধান করবই।

১৪.

পরের দিন সকালে প্রথমেই চাণক্য কুমার সুভাষের কাছে খবর পাঠালেন যেন সে আরও অতিরিক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। আজকে একবার আচার্য বিন্দাচলের গবেষণাগারটা তল্লাশি চালাবেন বলে ঠিক করেছেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি বলল:

- তবে বাসবকে তলব করি?

- নাহ্। আমরা যে আচার্য বিন্দাচলকে সন্দেহ করছি সেটা তাকে না জানানোই শ্রেয়। সে নিজে একসময়ে বিন্দাচলের অনুগত ছিল। বাসব নিজেই বলেছে সেকথা। আর তা ছাড়া আমাদের সন্দেহর বিষয়টা আমি কাউকেই জানাতে চাইছি না। বিন্দাচলের পেটিটা যে আমি খুঁজে পেয়েছি সেই তথ্য এই মুহূর্তে কাউকে না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। বাসবকে জানানো মানেই সবাই জেনে যাবে।

- বেশ। তবে সামান্য ফলাহার করে চলুন আমরা রওনা হই।

দু-জনে সবে প্রাতঃভোজ শেষ করেছে, তখনই বাইরে থেকে কারুর

আসার শব্দ পাওয়া গেল। মগধ থেকে দূত এসেছে। তার হাতে একটা রাজমোহর লাগানো চিঠি। চাণক্যর ইশারায়, জীবসিদ্ধি সেটা নিয়ে, খুলে পড়তে শুরু করল। এইবারের চিঠি চাণক্যকেই লেখা।

প্রিয় আচার্য,

প্রণাম নেবেন। আশা করছি আপনারা কুশল আছেন। তক্ষশিলার এখন অবস্থা কী তা চিঠি দিয়ে জানাবেন। জীবসিদ্ধির চিঠি থেকে আপনার সন্দেহর কথা জেনেছি। আশা করি সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়িই হবে।

এইদিকে সব ঠিক চলেছে। তবে আপনার অবর্তমানে, রাজ্যে কর ও অর্থনৈতিক হিসেব-নিকেশে আমাদের রাজকোষের হিসেবরক্ষকরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কয়েকটা হিসেবে গরমিল দেখা দিচ্ছে। তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিল, আমি তাদের বিরত রেখেছি। কারণ এই মুহূর্তে, তক্ষশিলার রহস্যর সমাধান হওয়াটাকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

আশা করছি আপনি ফিরে এলে, তাদের এইসব সামান্য সমস্যার সমাধান হবে।

শুভেচ্ছা রইল।

ইতি,
আপনার শিষ্য,
চন্দ্রগুপ্ত।

চিঠি পড়া শেষ করে জীবসিদ্ধি বলল:

- এরা আবার কী সমস্যা বাধাল? কীসের হিসেবে সমস্যা তাদের?

- অনুমান করতে পারছি না। তবে আশা করি সমস্যা গম্ভীর কিছু নয়। তাহলে সম্রাট অবশ্যই জানাতেন। আসলে প্রথম থেকেই অর্থনীতির দিকটা তো আমারই তত্ত্বাবধানে থেকে এসেছে, তাই এই বিষয়ে সম্রাট নিজে বা প্রধান-অমাত্য কৃষ্ণনাথ, কেউই বিশেষ অবগত নন। আর এই প্রথম আমি দীর্ঘদিনের জন্যে মগধের বাইরে। তাই তাদের সমস্যার সম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক।

- তা তো নিঃসন্দেহে। আচার্য, ওই যে দেখুন বাসব আসছে।

বাসব হন্তদন্ত হয়ে অতিথি-নিবাসে ঢুকল। তাদের কাছে এসে বলল:

- আচার্য! আপনারা সংবাদ পেয়েছেন? কাল রাতে সুনাভকে কেউ হত্যা করেছে! আমি তো ভাবতেই পারছি না।

- হুম। শুনেছি বাসব। আমরা কাল আয়ুরালয়তে গেছিলাম। তদন্ত দল এসেছে?

- শুনলাম তারা এসেছে। আপনি কি সেখানেই যাবেন?

- না, বাসব। আজ কোথাও যাব না। জীবসিদ্ধি ক্লান্ত। তার স্বাস্থ্য ভালো নেই। আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন।

কথাটা শুনে বাসব বেশ অবাক হয়েছে মনে হল। কিছুটা আশাহতও। সে বোধ হয় ভেবেছিল যে চাণক্য নিশ্চয়ই আয়ুরালয়তে যেতে চাইবেন। বাসব খানিকটা থতোমতো খেয়ে বলল:

- আচ্ছা, বেশ। আচার্য এ কী ঘটছে? একের পর এক মৃত্যু!

কিছুক্ষণ রাতের ঘটনা নিয়েই কথাবার্তা হল। জীবসিদ্ধি ও চাণক্য গতকাল কী কী ঘটেছে তা বলল। তবে বই চুরি যাওয়ার ঘটনাটা চাণক্য বললেন না। অকারণে অন্যকে কোনো তথ্যই দেয়া উচিত নয় বলে তিনি বিশ্বাস করেন। শুধু কথার মাঝেই একবার প্রশ্ন করলেন,

- আচ্ছা বাসব, তোমরা যে সেইদিন পুথিটা খুঁজে পেয়েছ সেটা কি কাউকে জানিয়েছিলে?

- হ্যাঁ, আচার্য। সে তো অনেককেই জানিয়েছি। প্রধানাচার্য মহাশয় তো রোজই খবর নেন যে নতুন কোনো অগ্রগতি হল কি না। তা ছাড়া অন্যান্য বাসিন্দারাও আপনাদেরকে নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী। তাদেরকেও বলেছি যে বইটা আপনি নিয়েছেন। কেন? এটা কি জানানো উচিত হয়নি আমার?

- না, না। সেইরকম কিছু নয়। এমনি জানতে চাইলাম যে এখানকার মানুষজন কতটা কৌতূহলী।

- সবাই কৌতূহলী, আচার্য। কারণ কম-বেশি সকলেই ভয়ে আছে। এতগুলো মৃত্যু পর পর ঘটল। তার ওপর আবার কালকের ঘটনা।

- হুম। স্বাভাবিক।

- আমি তবে আজ আসি, আচার্য। আপনারা বিশ্রাম নিন। কোনো প্রয়োজন হলে আমায় তলব করবেন।

- তা তো করবই।

দু-জনকে প্রণাম জানিয়ে বাসব বিদায় নিল। তাকে যতক্ষণ চলে যেতে দেখা গেল, ততক্ষণ অবধি অপেক্ষা করলেন চাণক্য। বাসব দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতেই তিনি বললেন,

- চলো, জীবসিদ্ধি। এইবার যাওয়া যাক।

পথ চলতে চলতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আচার্য, আপনি কী অনুমান করছেন আচার্য বিন্দাচলের বিষয়ে? আপনার কি মনে হয় যে তিনিই সব ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন চাণক্য। তাঁর মনের মধ্যে অনেক বছর আগে দেখা বিন্দাচলের স্মৃতি ভেসে উঠছে। বললেন,

- তোমার প্রশ্নর উত্তর দেয়ার আগে তোমায় কয়েকটা বিষয় বুঝতে হবে। প্রথমত আচার্য বিন্দাচলকে যে খুব বেশি চিনেছিলাম তা নয়। শুধু জানতাম যে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের, অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি। আচার্য হিসেবে তক্ষশিলায় আমার যোগ দেয়ার অনেক বছর আগে থেকেই তিনি এখানকার আচার্য ছিলেন। ঠিক যেমনভাবে আমি সবসময়ই চেয়ে এসেছি যে গুণী ব্যক্তিরা যেন আমাদের মিত্রপক্ষে থাকেন, একইভাবে আচার্য শকুনিও তাই চাইতেন। অতএব, অনেক আগে থেকেই শকুনি, বিন্দাচলকে নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন।

শকুনি নিজেও যে অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে-বিষয়ে আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তিনিও নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আচার্য শকুনি সেই সময় থেকেই গান্ধারের রাজকুমার অম্বিকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়েছিলেন, যাতে গান্ধার রাজের হৃদয়ে, এই তক্ষশিলায় বসে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার হতে থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তি কোনোদিনই নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখেননি। তিনি শুধুই নিজে ক্ষমতাবান হতে চেয়েছেন। দেশের কথা তিনি ভাবেননি।

এরপর আমি আসি তক্ষশিলায়। তার আগে অবধি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রচুর প্রভাব ছিল। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক সময়ে তিনি নিয়ম ভেঙেই, একাধিক রাজকুমারকে নিজের আশ্রমে যুক্ত করতেন। বেশ কিছু আচার্যর ওপর তিনি নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। আমি আসার পর তাঁর এই কাজগুলোর বিরোধিতা করি। আমি তক্ষশিলার উন্নতির স্বার্থে নিবেদিত ছিলাম, আর তিনি শুধুই নিজের উন্নতির স্বার্থে কাজ করতেন। অতএব সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। তারপর এই তক্ষশিলায় আচার্যদের মধ্যে দুটো আলাদা শিবির হতে বেশি সময় লাগেনি। বিন্দাচল ছিলেন আমার বিরোধী শিবিরের সদস্য।

কী কারণে যে তিনি আচার্য শকুনির ভক্ত হয়েছিলেন তা বলা কঠিন। তবে তিনি নিজে অত্যন্ত গুণী এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আমি ওঁর প্রিয়পাত্র আচার্য শকুনির বিরোধিতা করতাম বলে আমায় তিনি সুনজরে দেখতেন না বটে, তবে তিনি যে আমায় কখনো অসম্মান করেছেন তা বলতে পারি না। বরং তিনি আমার জ্ঞান এবং আদর্শর সম্মান করতেন। আমিও তাঁকে একজন অগ্রজ আচার্য হিসেবে সম্মান দিতাম। ব্যস, এই অবধিই আমাদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল।

- হ্যাঁ। আমার মনে আছে।

চাণক্য আবার বললেন,

- আচার্য বিন্দাচলের সঙ্গে আচার্য শকুনির একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। শকুনি ছিলেন একজন শঠ, স্বার্থপর এবং ক্ষমতালোভী মানুষ। কিন্তু বিন্দাচল

একজন সৎ এবং আদর্শবাদী শিক্ষক। অতএব তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, না। আমার মনে হয় না যে আচার্য বিন্দাচল এই ষড়যন্ত্রে কাণ্ডারি। কারণ তিনি একজন আদর্শবাদী শিক্ষক। আমি তাঁকে যতদূর চিনেছি, তার ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে, তিনি আর যাই করুন, কখনোই এই মহাবিদ্যালয়ের নাম কলুষিত হয় এমন কোনো কাজ করতে পারেন না।

১৫.

তক্ষশিলার এইটাই প্রধান গবেষণাগার। তাই এটা সুবৃহৎ। এটা যে শুধুই গবেষণার কাজে লাগে তা নয়। এইখানে উৎপাদন করা অনেক জিনিস সারা দেশে এবং বিদেশে রফতানি করা হয়। এগুলোর আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড়ো অংশের ব্যয়ভার বহন করা হয়। ভেষজ তেল, ফুল থেকে উৎপাদিত সুগন্ধি, কর্পূর, ধুনো এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ রফতানি করা পণ্যের মধ্যে মুখ্য। বিশেষ করে ওষুধ।

আপাতত এখানে কয়েকজন কর্মচারী কাজ করছে। দু-জন ব্রাহ্মণকে ঢুকতে দেখে অবাক হল না। ভাবল বোধ হয় কেউ প্রদর্শনে এসেছে। জীবসিদ্ধি একজনকে প্রশ্ন করে উদ্ভিদবিদ্যার অংশটা কোথায় তা জেনে নিল। এই অংশটা বিভিন্ন ধরনের গাছে ভরতি যার বেশিরভাগই মাটির পাত্রে গজিয়ে উঠেছে। চাণক্য একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। নিজের কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা লাল খড়ি বের করে কয়েকটা গাছের পাত্রে চিহ্ন দিতে লাগলেন। জীবসিদ্ধি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

- আরে, আচার্য! করছেন কী?

- সাহায্য করো আমায়। অপরিচিত গাছগুলো চিহ্নিত করো। আমরা দু-জনই উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ না হলেও, আশা করছি খুব বেশি অপরিচিত গাছ পাব না।

- কিন্তু তাতে কী লাভ হবে?

- আহা। আপাতত গুরুর ওপর একটু ভরসা রাখো। চলো... শুরু করা যাক।

বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দু-জন মিলে কয়েকটা অপরিচিত গাছ চিহ্নিত করতে পারলেন। কাজ শেষ করে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- এইবার? কী করবেন এই গাছগুলো নিয়ে?

- ক-টা গাছে চিহ্ন পড়েছে?

- বারোটা।

- হুমম। এইবার কয়েকজন সৈনিককে পাঠাব যেন সন্ধ্যার দিকে চিহ্নিত গাছের পাত্রগুলো তুলে নিয়ে আসে। আর কালকেই এগুলোকে তাদের সঙ্গে পাটলিপুত্র পাঠাব।

- সেখানে কী হবে?

- সেখানকার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই অপরিচিত প্রতিটা গাছের পরীক্ষা করানো হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ফলাফল আমার জানা প্রয়োজন। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তবু এটা জরুরি।

- উত্তম প্রস্তাব।

নিজের টিকির বাঁধনে হাত চালিয়ে চাণক্য বললেন,

- হুমম। এইবার তবে চলো, বিন্দাচলের বাড়িটা একবার দেখে আসি। শুনলাম তো গত এক বছর ধরে সেটা খালি পড়ে আছে। আর সেটা এখান থেকে কাছেই।

একজন কর্মচারীকে প্রশ্ন করতেই সে আচার্য বিন্দাচলের বাসভবনের পথ বলে দিল। তবে সঙ্গে এও বলল যে সেখানে কেউ থাকে না। লোকটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে তা খেয়াল করে চাণক্য বললেন,

- আসলে এই আমার সঙ্গী, শিল্পকলা বিভাগের নতুন নিযুক্ত আচার্য। সে উপযুক্ত বাসভবনের সন্ধান করছিল। তা, আমিই বললাম যে আচার্য বিন্দাচলের বাড়িটা তো ফাঁকা আছে। যদি মহাশয়ের পছন্দ হয়, তবে আচার্যপ্রমুখর সঙ্গে কথা বলব।

এত সুন্দর গুছিয়ে বলা মিথ্যা কাহিনিটা লোকটা বিশ্বাস করল সহজেই। তার মুখে ফুটে ওঠা কৌতূহলী ভাবটা মিলিয়ে গেল। চাণক্য শুধু একবার জীবসিদ্ধির চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসলেন। জীবসিদ্ধি মনে মনে আরও একবার আচার্যর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। এই লোকটা উত্তর না পেলে আরও দশজনকে বলত যে দু-জন বিন্দাচলের বাড়ির খোঁজ করছে। সন্দেহ করত। তাতে বিষয়টা পাঁচকান হত। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ তার কৌতূহলী প্রশ্নের একটা নীরস উত্তর পেয়ে যায়, তার উৎসাহ দূর হয়ে যায়। সেটা নিয়ে আর সে জল্পনা করবে না। কারুর সঙ্গে কথাও বলবে না আর এটা নিয়ে।

গবেষণাগার থেকে বের হয়ে বেশিক্ষণ পথ চলতে হল না। একটু চলার পরেই বিন্দাচলের বাড়িতে এসে পড়ল দু-জনে। দেখেই বোঝা যায় যে এই বাড়িটা এক বছর মতো পরিত্যক্ত হয়ে আছে। বাড়ির দরজা শুধুই আলগা লাগানো, অতএব ভেতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হল না। ভেতরে এখনও কিছু সামান্য আসবাবপত্র ছড়িয়ে আছে। কিছু ধুতি ও গায়ের জামা, কিছু ভূর্জপত্র, এক জোড়া পাদুকা, প্রদীপ ইত্যাদি। সবই ধুলো পড়ে মলিন।

চাণক্য ঝুঁকে পড়ে একটা খড়ম তুলে নিলেন। জীবসিদ্ধিকে বললেন,

- ওহে জীবসিদ্ধি, দেখছ? এটা কিন্তু বেশ নতুন। অথচ আমাদের ঘরে রাখা পেটিতে যে দুটো আছে, তা বেশ পুরোনো নয় কি?

- হ্যাঁ। তাতে কী প্রমাণিত হয়, আচার্য?

চাণক্য উত্তর দিলেন না। কাঠের অন্যান্য দেরাজগুলো খুঁজতে লাগলেন। একগাদা ভূর্জপত্র বের করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। জীবসিদ্ধি পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল বিদেশ থেকে আনানো কোনো জিনিসের বিনিময় রসিদ, ছাত্রদের জন্যে কিছু হাতে-লেখা প্রশ্নপত্র, গবেষণাপত্র ইত্যাদি। অতি সামান্য সব জিনিস।

- আরব দেশ থেকে বেশ কিছু অজানা গাছ আনিয়েছিলেন বিন্দাচল। প্রায় দু-বছর আগে। এই গবেষণাপত্রগুলো সবই দেখি দু-বছর আগের। আশ্চর্য! তিনি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগের এক বছরের কোনো নথি নেই।

- আর ওই পেটিতে যে নথিপত্র আছে, সেগুলো?

- ওগুলোও পুরোনো। দরকারি কিছুই না।

- কিন্তু সেটাই কি স্বাভাবিক না? জরুরি নথি তিনি এখানে ছেড়ে যাবেন কেন? বা, ফেলেই-বা দেবেন কেন? সেগুলো নিশ্চয়ই নিজের সঙ্গেই নিয়ে গেছেন।

- তাও ঠিক যুক্তি বটে।

চাণক্য আরও একবার পুরো বাড়িটা খুঁজে দেখলেন। একটা মাটির মালসার কাছে গিয়ে আটকে গেলেন। তাতে কিছু ভূর্জপত্র জ্বালানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আধ পোড়া ভূর্জপত্র পরীক্ষা করলেন। একটা টুকরো জীবসিদ্ধির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

- বিন্দাচল বেশিরভাগ নথির ওপরেই তারিখ উল্লেখ করতেন। অন্যান্য লেখাগুলো দেখলেই বুঝবে। এইটা দেখো। এই টুকরোটায় তারিখ দেখা যাচ্ছে। যদিও অস্পষ্ট।

চাণক্যর থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে চোখের কাছে আলোয় এনে দেখল জীবসিদ্ধি।

- দেড় বছর আগের কোনো একটা তারিখ।

- হুমম।

দু-জনে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। নিজেদের অতিথি-নিবাসের পথ ধরল। বেলা অনেক হয়ে গেছে। সূর্য মধ্য গগন থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়া শুরু করেছে। জীবসিদ্ধি উপলব্ধি করল সে ক্ষুধার্ত। চাণক্যকে চিন্তিত লাগল। তিনি কিছু একটা ভাবছেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,

- আচ্ছা জীবসিদ্ধি, তোমার ক-টা পাদুকা আছে?

এরকম অদ্ভুত প্রশ্নর অর্থ জীবসিদ্ধি বুঝল না। উত্তর দিল,

- একটাই।

- হুম। আমারও। মানুষের একটা বা বড়োজোর দুটো খড়ম থাকে সাধারণত। তাই নয় কি?

- হ্যাঁ। সাধারণত। কাঠের খড়ম অনেকদিন চলে। একটা পুরোনো হলে নতুন নেয়া হয়।

- হুম। আশা করা যায় বিন্দাচলেরও দুটোই পাদুকা ছিল। একটা নতুন, অন্যটা পুরোনো। অথচ, তিনি নতুন পাদুকাটা বাড়িতে ছেড়ে, পুরোনোটাকে সযত্নে সঙ্গে নিলেন। তারপর আবার পাদুকা সমেত নিজের পেটিটা ফেলে দিলেন নির্জন জঙ্গলে।

জীবসিদ্ধি কোনো কথা বলল না। সে এইভাবে ভেবে দেখেনি। চাণক্য আবার কথার রেশ ধরে বলতে থাকলেন,

- অর্থাৎ, বিন্দাচল খালি পায়ে তক্ষশিলা ছেড়ে চলে গেলেন? বিষয়টা আশ্চর্য নয় কি? এটা বিশ্বাসযোগ্য?

- তা বটে। এই কাজের কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

আরও কিছু একটা বলতেন, তখনই সামনে আসতে থাকা একজনকে দেখে কথা শেষ করলেন না। সাধারণ পোশাক পরা হলেও লোকটা বলিষ্ঠ। একটু এগিয়ে এসে লোকটা প্রণাম করতে দু-জনে চিনতে পারলেন লোকটাকে। এ তাদেরই সঙ্গে আসা, মগধের একজন সৈনিক।

- প্রণাম, আচার্য। প্রণাম, জীবসিদ্ধি মহাশয়।

জীবসিদ্ধি প্রতিনমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করল,

- উৎপল, তাই তো? তা, তুমি এদিকে কী করছ?

- আজ্ঞে, আমি এইদিকের পানীয় জলের কুয়োটার ওপর গোপনে নজরদারি করি। তাই তো সাধারণ বেশে।

- ওহো।

তা, সন্দেহজনক কিছুই তো দেখিনি গত দেড় মাসে। আর কি নজরদারি চালানোর প্রয়োজন আছে, আচার্য?

শেষ প্রশ্নটার উদ্দেশ্য অবশ্যই চাণক্য। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন,

- নাহ্। আমার মনে হয় আর প্রয়োজন নেই। তা তুমি ক-টা কুয়োর ওপর নজরদারি চালাও এদিকে?

- এদিকে দুটো কুয়ো আছে। তবে তার মধ্যে একটা পরিত্যক্ত। ব্যবহার হয় মাত্র একটা কুয়ো। তাই শুধু একটার ওপরেই আমি নজর রাখতাম, আচার্য।

জীবসিদ্ধি বলল:

- বেশ। আর কাল থেকে প্রয়োজন নেই। কাল একটা কাজ করবে তোমরা। গবেষণাগারটা চেনো তো? তোমাদের কয়েকজন গিয়ে সেখানে উদ্ভিদবিদ্যার অংশ থেকে কয়েকটা গাছ নিয়ে আসবে। দেখবে বারোটা পাত্রে আমরা...

কথা থেমে গেল জীবসিদ্ধির। তার চোখ পড়েছে চাণক্যর দিকে। চাণক্যর কপালে তীব্র ভ্রূকুটি। দৃষ্টি উজ্জ্বল।

- কী ব্যাপার, আচার্য?

চাণক্য জীবসিদ্ধির প্রশ্নর উত্তর না দিয়ে, সৈনিক উৎপলকে প্রশ্ন করলেন,

- পরিত্যক্ত কুয়োটা কোথায়?

- এই তো। এইখানেই। ওই পরিত্যক্ত বাড়িটার পেছনেই। কয়েক পা গেলেই পাবেন।

আর কোনো কথা না বলে চাণক্য পেছন ফিরে হাঁটা লাগালেন। জীবসিদ্ধি আর উৎপল একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, চাণক্যর পিছু নিল।

আচার্য বিন্দাচলের বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরেই পুরোনো কুয়োটা। সেটার মুখ একটা কাঠের পুরোনো ঢাকনা দিয়ে বন্ধ। কুয়োর চারিদিকে আগাছা আর জঙ্গল ভরে গেছে। চাণক্য গিয়ে ভারী ঢাকনাটা সরাতে শুরু করলেন। সৈনিক আর জীবসিদ্ধি এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করতে যেতেই, চাণক্য হাত তুলে তাদের বাধা দিলেন।

- আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই এটা একজনের পক্ষে সরানো সম্ভব কি না।

সামান্য ভারী হলেও, একটু চেষ্টা করতেই চাণক্য সেটা সরিয়ে ফেললেন। ঝুঁকে নীচে দেখার চেষ্টা করলেন। তাঁর দেখাদেখি, বাকি দু-জনও ধারে এসে উঁকি দিল। সূর্যর আলো নীচ অবধি পৌঁছোতে পারছে না। তবে নীচে পরিত্যক্ত কালো জল দেখা যাচ্ছে। চাণক্য আবার ঢাকনাটা জায়গামতো বসিয়ে দিলেন। সৈনিক উৎপলের দিকে ফিরে বললেন,

- তোমাদের মধ্যে একটা দল, আজ সন্ধ্যায়, গবেষণাগারের উদ্ভিদের অংশে গিয়ে লাল চিহ্ন দেয়া গাছগুলো নিয়ে আসবে। আশা করি সেই সময়ে কেউ দেখবে না তোমাদের। একই প্রজাতির অনেক গাছ আছে, একটা করে কেউ সরিয়ে ফেললে সেটা কেউ লক্ষ করবে না। বুঝেছ? সেগুলো নিজেদের সেনা শিবিরে নিয়ে রাখবে। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবে।

- যথা আজ্ঞা, আচার্য।

- অন্য একটা দল, কাল সকালে এইখানে আসবে। এই কুয়োটাতে কেউ একজন নেমে পরীক্ষা করবে।

অবাক হয়ে উৎপল বলল:

- কিন্তু আচার্য, এই জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার হয় না।

- জল পরীক্ষা করতে বলিনি। একজন নেমে কুয়োর তলাটা পরীক্ষা করবে। ঠিক আছে?

- বেশ, আচার্য। যথা আজ্ঞা।

১৬.

বাকি দিনটা চাণক্য গম্ভীর থাকলেন। জীবসিদ্ধি কয়েকবার তাঁকে কথা বলানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কোনো লাভ হল না। বিকেলে শুধু জনৈক সৈনিক এসে

জানিয়ে দিয়ে গেল যে, নির্দেশ মতোই বারোটা গাছ সমেত মাটির পাত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চাণক্য একটা চিঠি লিখে তার হাতে দিলেন।

- কাল সকালেই তোমাদের কয়েকজন গাছগুলো নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। সাবধানে যাবে, সেগুলো যেন নষ্ট না হয়ে যায়। নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যা করবে। পাটলিপুত্র পৌঁছে প্রধান অমাত্যর সঙ্গে দেখা করবে এবং তাঁকে এই চিঠিটা দেবে। বাকি ব্যবস্থা তিনি করবেন।

নির্দেশ বুঝে নিয়ে সৈনিক চলে গেল।

বরাবরই চাণক্যর অনেক ভোর বেলা শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস। সকালে উঠে স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করে তিনি প্রভাতী প্রার্থনা শুরু করেন। কিন্তু আজ তাঁর কাজে বাধা পড়ল।

সবে সূর্যপ্রণাম সেরেছেন, তখনই এক ব্যক্তিকে অতিথি-নিবাসের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলেন। এই মুহূর্তে অতিথি-নিবাসে তাঁরা দু-জন ছাড়া আর কেউ নেই, অতএব, লোকটা যে তাঁর কাছেই এসেছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। সে এসে চাণক্যকে প্রণাম জানাল,

- প্রণাম, আচার্য।

- প্রণাম।

- আপনার সকালের পুজোয় বিঘ্ন ঘটানোর জন্যে দুঃখিত। আমায় যুবরাজ সুভাষ পাঠিয়েছেন।

চাণক্যর মনে আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন,

- কুমার? কোনো বিপদ হয়নি তো?

- বিপদ হত, আচার্য। তবে তা এড়ানো গেছে। গতরাতে কেউ কুমারের ঘরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর দেহরক্ষীর তৎপরতায় কুমার রক্ষা পেয়েছেন।

- যাক। একটু নিশ্চিন্ত হলাম। আমি এরকম একটা আশঙ্কা করেছিলাম।

-গতকাল সতর্ক করে দেয়ার জন্যে আপনাকে কুমার ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আচার্য। আপনি কি একবার কষ্ট করে আসবেন কুমারের বাড়িতে?

- হ্যাঁ। অবশ্যই যাব। আপনি কুমারকে গিয়ে বলুন সকালের প্রার্থনা শেষ করেই আমি আসছি।

- ধন্যবাদ, আচার্য।

লোকটা বিদায় নিতে চাণক্য প্রথমেই গিয়ে জীবসিদ্ধিকে তুললেন। তাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে তাকেও তৈরি হয়ে নিতে বললেন। এরপর নিজে আবার প্রার্থনায় মগ্ন হলেন।

কয়েক ঘণ্টা পর চাণক্য ও জীবসিদ্ধি কুমারের ছাত্রাবাসে এসে হাজির হলেন। দ্বাররক্ষী প্রথমে তাদের বাধা দিতে যাচ্ছিল, তখনই ভেতর থেকে কুমার বেরিয়ে এসে রক্ষীকে নিরস্ত করে তাঁদের ভেতরে আমন্ত্রণ জানালেন। চাণক্য ঢুকতে প্রথমেই কুমার চাণক্যর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন।

- আচার্য! আচার্য! আপনি মহান। কাল শুধুমাত্র আপনার কারণেই আমার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। আপনি যদি সতর্ক করে না দিতেন তবে কাল নির্ঘাত আততায়ীর হাতে আমার মৃত্যু হত।

- আততায়ীই যে প্রবেশ করেছিল তা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে, কুমার? চোরও তো হতে পারে। যদিও তক্ষশিলার সুরক্ষিত প্রাঙ্গণে তা বিরল ঘটনা।

- না না, আচার্য। অনুপ্রবেশকারী আমায় হত্যার চেষ্টা করতেই এসেছিল। আসুন, নিজেই দেখুন।

কুমারের সঙ্গে দু-জন তার ঘরে ঢুকতে, কুমার মেঝের ওপর রাখা লোহার একটা বড়ো কৃপাণ তাঁদের দেখাল। ওটার ধারে এখনও শুকনো রক্ত লেগে আছে।

- এই দেখুন। অনুপ্রবেশকারী এইটা ফেলে গেছে।

- হুম। অনুমান করতে পারি, এই রক্ত তোমার দেহরক্ষীর?

- হ্যাঁ। এই যে... এই বল্লভ, আমার নিজস্ব অনুগত দেহরক্ষী। এর তৎপরতাতেই কাল রক্ষা পেয়েছি। যদিও সেটা করতে গিয়ে বল্লভ হাতে চোট পেয়েছে।

ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবিশাল দেহধারী, বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁদের প্রণাম জানাল। তার বাঁ-হাতে, কাঁধের কাছে মলম পট্টি করা। যদিও লাল রক্তের ছাপ তার ওপর দিয়েও ফুটে উঠছে। চাণক্য বললেন,

- কী ঘটেছিল বিশদে বলবে?

কুমার বলল,

- তবে বল্লভই বলুক রাতের ঘটনা।

বাকি তিন জন বল্লভের দিকে ফিরতে সে বলা শুরু করল,

- আমি কুমারের ঘরেই গতকাল রাতে ঘুমিয়েছিলাম। আমি আগে সৈনিক হিসেবে অনেক যুদ্ধ করেছি, তাই ঘুমের মধ্যেও সতর্ক থাকার প্রশিক্ষণ আমার আছে। শেষরাতের দিকে একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারি জানলার কাঠের পাল্লা খুলে কেউ ঢোকার চেষ্টা করছে। আমি হাতে তলোয়ার নিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি জানলার ধারে। একটু বাদেই জানলা খুলে একজন ভেতরে মাথা বাড়ায়। আমি তলোয়ারের আঘাত করি, কিন্তু ঠিক মুহূর্তে সে সরে গিয়ে বেঁচে যায়। সে ঢোকার চেষ্টা ছেড়ে, এবার পেছন ফিরে পালানোর চেষ্টা করে। আমি প্রথমেই কুমারকে চেঁচিয়ে সতর্ক করি এবং জানলা দিয়ে নিজেও বাইরে লাফিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য সেই আততায়ীকে ধাওয়া করা।

ওই যে দেখুন, ওই পুষ্করিণীর কাছে গিয়ে তাকে ধরতে পারি। কিন্তু অন্ধকারে আমি খেয়াল করিনি তার হাতে এই ছুরিটা ছিল। তখনই সে আমায় আঘাত করে। কিন্তু আমিও পালটা প্যাঁচে তার হাত মুড়ে দিতেই ছুরিটা পড়ে যায়। কিন্তু এরপর সে আমায় ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে আর তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

চাণক্য সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন,

- হুম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রাঙ্গণে একজন হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে কুমার যে সুরক্ষিত আছে এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর্য বল্লভ, তুমি কি লোকটির মুখ দেখেছ?

- তার মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, আচার্য।

- বেশ। আর কুমার? তুমি কিছু দেখেছ কি?

কুমার মাথা নাড়ল,

- না, আচার্য। আমার ঘুম ভাঙে তলোয়ার চালানোর আওয়াজে। বল্লভের তলোয়ার, অনুপ্রবেশকারীকে না ছুঁয়ে, জানলার গায়ে লাগে। আর সেই শব্দেই আমি জেগে যাই। তারপরেই বল্লভ আমায় সতর্ক করে চেঁচিয়ে এবং জানলা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দেয়। আমি একটু হতভম্ব হয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। উঠে যখন জানলার কাছে যাই তখন পুষ্করিণীর ধারে দু-জনকে লড়াই করতে দেখতে পাই শুধু। এরপর আমি বাকি লোকদের ডাকি এবং তাদের বলি বাইরে গিয়ে বল্লভকে সাহায্য করতে। আলো নিয়ে এরপর বহুক্ষণ আমার লোকেরা তল্লাশি করে ভোর অবধি। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পায়নি।

চাণক্য কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে থাকলেন। জানলার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করলেন। জানলার গায়ে তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। যথেষ্ট বল প্রয়োগ করেই আঘাত করা হয়েছিল, ঠিক সময়ে অনুপ্রবেশকারী সরে না গেলে, সে খুবই বড়ো রকমের আঘাত পেত। বেশ কিছুটা দূরে পুষ্করিণীর পাড় দেখা যাচ্ছে।

মাঝের জমিটুকুর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন চাণক্য। কারণটা জীবসিদ্ধি বুঝতে পারল। গতকাল রাতে কুমারের লোকেরা পুরো জায়গাটা হাঁটাচলা করে এলোমেলো করে দিয়েছে। আততায়ীর পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো সূত্র যদি থেকেও থাকত, তা এখন আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কুমারের লোকেরা তল্লাশি করতে গিয়ে উপকারের থেকে অপকার বেশি করেছে। তবে তাদের দোষ দেয়া যায় না।

চাণক্য কুমারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,

- কুমার, দু-দিন আগের রাতে তোমার বন্ধু সুনাভকে হত্যা করা হল। আর গতকাল রাতে তোমায় হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করছি ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছ?

চিন্তিতভাবে কুমার উত্তর দিল,

- বুঝতে পারছি, আচার্য। সেই রাতের তন্ত্রাচার করার জন্যে কেউ আমাদের মৃত্যু চাইছে।

- কুমার, এইবার আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। আগেও প্রশ্নটা করেছি, আবার করছি। আমি চাই তুমি ভেবে-চিন্তে আমার প্রশ্নর উত্তর দাও।

- বলুন, আচার্য।

- তন্ত্র বইতে কি এমন কোনো গোপন তথ্য ছিল যা লুকিয়ে রাখতে সেই বই পড়েছে এমন চার জনকেই কেউ হত্যা করতে চাইতে পারে?

কিছুক্ষণ ভেবে কুমার উত্তর দিল,

- না, আচার্য। আমার তো সেইরকম কিছুই মনে পড়ছে না। এমন কোনো গোপন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা চার জন জানতাম না বলেই আমার ধারণা সেই কারণে কেউ আমাদের প্রাণনাশ করতে চাইবে। তা ছাড়া ওই পুথি তো শুনেছি আপনার কাছেই আছে। বাসবের থেকেই শুনলাম। আপনি নিজেই সেটা পড়ে দেখুন না। আমার অন্তত সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।

চাণক্য শুধু নিজের টিকিতে হাত বুলিয়ে বললেন,

- হুম।

কুমার একটু ইতস্তত করে বললেন:

- তবে আমার মনে একটা আশঙ্কা আছে। হয়তো তক্ষশিলার বাসিন্দাদের ধারণা হয়েছে যে যেহেতু আমাদের দোষেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অভিশাপ নেমে এসেছে, তাই হয়তো আমাদের মৃত্যু হলেই তাদের শাপমুক্তি হবে।

- কুমার, তুমি নিজে কি তাই বিশ্বাস কর? সেই রাতে তোমরা অপশক্তিকে মুক্তি দিয়েছিলে?

চাণক্যর চোখের দিকে চাইল কুমার সুভাষ। তার চোখে সত্যিই ভয় ফুটে উঠেছে। কাঁপা স্বরে উত্তর দিল,

- হ্যাঁ। সেইদিন যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক নয়। আমি এতটা ভয় কোনোদিন পাইনি। সেই দৃশ্য... উফ! কী ভয়ংকর!

চাণক্য আর কথা বাড়ালেন না। কয়েকজন কর্মচারীকে এরপর তিনি দু-একটা প্রশ্ন করলেন। কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। তারা কুমারের ডাকেই ঘুম থেকে উঠে এসেছিল। অতএব, তারা কিছুই দেখেনি বা কিছুই শোনেনি।

চাণক্য তাদের সতর্ক থাকতে উপদেশ দিলেন। কুমারের সুরক্ষার যেন কোনোরকম ত্রুটি না রাখা হয় বল্লভকে সেটার দিকে নজর রাখতে বললেন।

এরপর কুমারের থেকে বিদায় নিতে গেলে কুমার বলল:

- আচার্য, আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমার বাবারও তাই মত। এই অশুভ পরিবেশে আমি এতদিন থেকেছি সুস্থ হওয়ার আশায় এবং

প্রধানাচার্যর অনুরোধে। কিন্তু কালকের ঘটনার পর আর নয়। আমি আমার রাজ্যে ফিরে যেতে চাই।

চাণক্য কুমারের কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন,

- আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কুমার। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আর কয়েকটা সপ্তাহ ধৈর্য ধরো। তার মধ্যে যদি আমি রহস্যর সমাধান করতে না পারি, তবে আমি আর বাধা দেব না।

- বেশ, আচার্য। আপনি কাল আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। আপনার কথা আমি রাখব। প্রণাম, আচার্য।

নিজেদের বাড়িতে ফেরার পুরো পথে চাণক্য একটাও কথা বললেন না। তাঁকে চিন্তিত লাগল। বাড়ির কাছে আসতেই জীবসিদ্ধি আর চাণক্যর চোখে পড়ল তাঁদের বন্ধ দরজার সামনে উৎপল দাঁড়িয়ে। সে বোধ হয় বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের ফেরার অপেক্ষা করছিল। তাদের দু-জনকে দেখেই এগিয়ে এল উৎপল। তার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। এতটাই উত্তেজিত সে, যে প্রণাম জানানোর কথাও তার মনে নেই। প্রায় ছুটে এসে উত্তেজিতভাবে বলল:

- আচার্য! কুয়োর তলায় একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে!

১৭.

দড়ি ফেলে তুলে আনা হচ্ছে ভারী কিছু একটা। যতই দড়ি গোটানো হচ্ছে, ততই দুর্গন্ধে ভরে উঠছে চারপাশ। দু-জন সৈনিক মৃতদেহ তুলে আনছে এবং বাকি সৈনিকেরা দূরে দাঁড়িয়ে আশেপাশে নজর রাখছে। চাণক্য তাদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন একজনও এইদিকে আসতে না পারে।

নাকে গায়ের কাপড় চেপে দাঁড়িয়ে আছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃতদেহটা উঠে এল। পচনশীল, বিকৃত, কঙ্কালসার মৃতদেহ। সৈনিকরা দড়ি ধরে দেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। চাণক্য নাকে গায়ের কাপড় চাপা দেয়া অবস্থাতেই এগিয়ে গেলেন দেহটার দিকে। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। মুখ দেখে শনাক্ত করার উপায় নেই। মাথার খুলি ব্রহ্মতালুর কাছে দুই ফাঁক হয়ে আছে। দেহটা থেকে প্রচণ্ড পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। মৃতদেহর শরীরে দড়ির দাগ স্পষ্ট। ভারী পাথর বাঁধা ছিল শরীরের সঙ্গে যাতে মৃতদেহ ডুবে থাকে। মৃতদেহর পাশেই একটা ভারী লোহার ছোটো ডান্ডা পড়ে আছে। এটা আগেই তোলা হয়েছে। বেশ কয়েকদিন জলের সংস্পর্শে থেকে সেটা ক্ষয়ে গেছে।

সব কিছু দেখে নিয়ে চাণক্য উঠে সরে এসে জীবসিদ্ধির পাশে দাঁড়ালেন।

- কী বুঝছ, জীবসিদ্ধি?

- দেহের পচন থেকে অনুমান করা যায় প্রায় এক বছরের পুরোনো লাশ।

- হুম।

- মাথায় আঘাতে মৃত্যু হয়েছে। হত্যাকারী মৃতদেহর সঙ্গে হত্যার শস্ত্রটাও কুয়োয় ফেলে দিয়েছে।

- হুম। আর এই হতভাগ্য মানুষটা কে তা আশা করি অনুমান করতেই পারছ?

- আচার্য বিন্দাচল।

কিছুক্ষণ দু-জনের কেউই কোনো কথা বললেন না। নিশ্চুপভাবে বিকৃত মৃতদেহটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য দিগন্তরেখার দিকে ঢলে পড়েছে। পাখিরা বাড়ি ফিরছে।

জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আচার্য, এইবার? মৃতদেহ কোথায় নিয়ে যাব?

চাণক্য কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন জীবসিদ্ধির দিকে। তার প্রশ্নর উত্তর না দিয়ে তিনি, আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই সৈনিকের দিকে ফিরলেন। বললেন,

- মৃতদেহ আবার কুয়োর ভেতর নামিয়ে দাও।

জীবসিদ্ধি এবং সৈনিক দু-জন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে চাণক্যর দিকে। জীবসিদ্ধি সম্পূর্ণ বজ্রাহতের মতো চেয়ে আছে তার গুরুর দিকে।

- আচার্য! এ আপনি কী বলছেন?

চাণক্যর দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। তিনি দৃঢ় স্বরে আবার বললেন,

- মৃতদেহ জলে নামিয়ে দিয়ে, কুয়োর ওপরের ঢাকনাটা দিয়ে মুখটা ঢেকে, আবার আগের মতো করে দাও।

জীবসিদ্ধি আবার চাপাস্বরে বলে উঠল,

- আচার্য!

চাণক্য এইবার জীবসিদ্ধির চোখে চোখ রাখলেন। বললেন,

- জীবসিদ্ধি, নিজে একজন আচার্য ব্রাহ্মণ হয়ে, নিজেরই এক সহকর্মী শিক্ষকের মৃতদেহর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করতে, আমারও হৃদয়ে ততটাই যন্ত্রণা হচ্ছে যতটা তোমার। বিশ্বাস করো আমার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে হৃদয়ের থেকে, মস্তিষ্কের নির্দেশ মেনে চলাটা বেশি আবশ্যক। আমরা এই মুহূর্তে একটা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। আর এই সময়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা আমাদের সাজে না।

- আপনি কী বলতে চাইছেন, আচার্য?

- ভেবে দেখো। এই মৃতদেহ তুলে নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করতে গেলে, এই তক্ষশিলার প্রতিটা মানুষ জেনে যাবে ঘটনাটা। আর তাদের মধ্যেই



হত্যাকারীও জানতে পারবে সেটা। সে সতর্ক হয়ে যাবে। আমরা তাকে ধরার আগেই পালিয়ে যেতেও পারে। তাই নয় কি?

জীবসিদ্ধি কোনো উত্তর দিতে পারল না। চাণক্য আবার বললেন,

- এই মুহূর্তে এই খবর কাউকে জানতে দেয়া যাবে না, জীবসিদ্ধি। আমি নিরুপায়। আচার্য বিন্দাচলের আত্মা তবেই শান্তি পাবে, যদি তার হত্যাকারী শাস্তি পায়। আর সেই কারণে আজ এই কঠিন সিদ্ধান্ত আমায় নিতেই হবে।

জীবসিদ্ধির কাঁধে হাত রাখলেন চাণক্য। তারপর মৃতদেহর দিকে ঘুরে এগিয়ে গেলেন। মৃতদেহর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন চাণক্য। মৃতদেহর উদ্দেশে বললেন,

- হে আচার্য বিন্দাচল, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার মরদেহের সঙ্গে এই অবিচার করার জন্যে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু অনুগ্রহ করে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আমি কথা দিলাম, বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য খুব তাড়াতাড়িই আপনার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আজ আমায় ক্ষমা করবেন।

সরে এসে চাণক্য সৈনিকদের কাজ শুরু করতে ইশারা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আগের মতো কুয়ো ঢাকা দিয়ে দেয়া হল। সৈনিকদের বিদায় দিয়ে নিজেরাও পথ ধরলেন দু-জনে।

রাতে দু-জনের কেউই খেতে পারলেন না। কর্পূরের সুগন্ধের মাঝেও পচা দুর্গন্ধটা যেন এখনও তাঁদের নাকে লাগছিল। দু-জনের মধ্যে আজ খুব সামান্য কথাবার্তা হল। ঘুমোতে যাওয়ার আগে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- ওহে জীবসিদ্ধি, এই ঘরে থেকে তোমার মনের সেই ভয়ের ভাবটা কিছুটা কমেছে কি?

- হ্যাঁ, আচার্য। তবে আজ রাতে সম্ভবত আমি খুব ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখতে চলেছি। এবং তাতে আচার্য বিন্দাচলের বিকৃত মৃতদেহর একটা বড়ো ভূমিকা থাকবে বলে আশঙ্কা করছি।

শয্যায় শুয়ে, চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মৃদু হাসলেন চাণক্য। প্রদীপের আগুন নিভিয়ে জীবসিদ্ধি নিজেও শয্যা নিল। কিছুক্ষণ জেগে রাতের কীটপতঙ্গের এক সুরে ডেকে চলার শব্দ শুনল জীবসিদ্ধি। তারপর বলল,

- আচার্য।

অন্ধকারের ভেতর থেকেই উত্তর এল,

- বলে ফেলো।

- আপনি কি কিছু ভেবে পেয়েছেন? কোনো সূত্র?

- অনেক সূত্র পেয়েছি। একটা ঘটনা আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু অন্য ঘটনাগুলো সেটার সঙ্গে মেলাতে পারছি না। কিছু একটা আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, জীবসিদ্ধি। কিছু একটা সূত্র এখনও আমার অধরা। মন বলছে সেটা খুব তাড়াতাড়িই পাব। কিন্তু তার আগে অপেক্ষা করতে হবে।

- কীসের অপেক্ষা?

- মগধ থেকে চিঠি আসার অপেক্ষা করতে হবে। যদিও আমি অনুমান করতেই পারছি যে ওই গাছগুলো পরীক্ষা করার ফল কী আসবে। তবুও আমি নিশ্চিত হতে চাই। ধৈর্য রাখো কয়েকটা দিন।

- আর ততদিন আপনি কী করবেন, আচার্য?

- ভাবব। শুধুই ভাবব।

১৮.

বেশ কয়েকটা দিন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। যদিও মাঝে আরও একজন আচার্য এবং এক ছাত্রর রাতে ভয় পাওয়ার খবর পেয়েছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। চাণক্য নিয়মিত ছাত্রদের মাঝে সময় দিচ্ছেন। কয়েক দিন অন্তর একবার করে বাসব আসে। চারিদিকে ঘটে চলা ঘটনার খবর দিয়ে যায় তাঁদের। জীবসিদ্ধি এখন খানিকটা সুস্থ, ঘুমের সমস্যাও দূর হয়েছে কিছুটা। তবুও চাণক্য জীবসিদ্ধিকে একা নিজের ঘরে রাতে থাকতে দিতে রাজি হননি।

জীবসিদ্ধি বেশ অশান্ত হয়ে উঠছে। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। কিন্তু চাণক্যর মধ্যে সেই রকম কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। রোজকার নিয়মমতো দিন কাটিয়ে চলেছেন। নিজের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেনও খুবই কম। যে কেউ তাঁর জীবনযাপন দেখলে মনে করবে যে মানুষটা চরম আলস্যে দিন কাটিয়ে চলেছেন। কিন্তু জীবসিদ্ধি তার গুরুদেবকে বহু বছর ধরে চেনে। এই শান্তি হল আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। জীবসিদ্ধির মনে আছে, নন্দ সাম্রাজ্যর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহর দিনগুলোর কথা। মাঝে মাঝেই চাণক্য এরকম নিষ্ক্রিয়ভাবে দিন কাটাতেন। কিন্তু এই সময়টা তাঁর মনের মধ্যে ঝড় চলে। তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন সর্বক্ষণ। আর তাই বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে ফেলেন। এই কয়েক দিনের নিষ্ক্রিয়তার পরেই তিনি ফিরে আসতেন রাজশক্তির ওপর আঘাত হানার নতুন কোনো দুর্দান্ত পরিকল্পনা নিয়ে। এইবারও তাই হবে। জীবসিদ্ধি নিশ্চিত। নিজের গুরুর প্রতি তার অসীম আস্থা। আঁধার যতই নিরবচ্ছিন্ন হোক, চাণক্য আলো দেখাবেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়েছিল এমন বহু সমস্যার সমাধান সে এই মানুষটিকে করতে দেখেছে।

কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় জীবন জীবসিদ্ধির কাছে এবার অসহনীয় লাগতে শুরু করেছে। মাঝে একবার সে চন্দ্রগুপ্তকে চিঠি লিখেছে। কিন্তু তার প্রত্যুত্তর আসতে দেরি আছে। এদিকে সেই গাছগুলোর পরীক্ষার ফলাফলও আসছে না। ধৈর্য আর রাখতে না পেরে সে চাণক্যকে প্রশ্ন করেই ফেলল,

- আচার্য, আর কতদিন এভাবে থাকব?

চাণক্য ফাঁকা দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। শিষ্যর প্রশ্নে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসলেন।

- আহা! ধৈর্য হারাও কেন? বেশিদিন আর লাগবে না। আমি আমার চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছি যে গাছগুলো পরীক্ষা করে তার খবর যেন ঘোড়সওয়ার দূত মারফত না পাঠানো হয়। তাতে সময় বেশি লাগবে। উত্তর যেন দ্রুতগামী পত্রবাহী পায়রার মাধ্যমে পাঠানো হয়। অতএব, বেশি দেরি হবে না। আশা করা যায় আর কয়েক দিনের মধ্যেই চিঠি এসে পড়বে।

- সেই চিঠি এলেই সব রহস্যের সমাধান হবে?

দু-দিকে ঘাড় নাড়েন চাণক্য।

- না। ওটা শুধুমাত্র আমার একটা অনুমানের সত্যতা প্রমাণ। এর বেশি কিছু নয়।

- তার মানে রহস্যর সমাধান আপনি পেয়েছেন?

- পুরোটা সমাধান করে ফেলেছি বললে ভুল হবে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিছু আমি ভুলে যাচ্ছি। আর সেইটা মনে পড়লেই শেষ সূত্রটা মিলে যাবে।

- দয়া করে আলোকপাত করুন, আচার্য।

- বেশ। আমি তোমার সামনে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। তুমি সেগুলোর উত্তর ভাবো। প্রথম প্রশ্ন, সবার মনে এই ভয়ের উৎস কী বলে মনে হয়?

- অনুমান করতে পারি, আচার্য বিন্দাচলের তৈরি করা কোনো মাদক। সেটার প্রমাণ আসবে মগধ থেকে আসা চিঠিতে।

- হুম। ঠিক। এর পরের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসছে, সেই মাদক সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষের শরীরে কীভাবে প্রবেশ করছে? তাও আবার তাদেরই অজান্তে?

- আমি বলতে পারি না। ভেবে পাইনি।

উত্তর না দিয়ে চাণক্য পরের প্রশ্নে চলে গেলেন,

- এই ঘটনার সঙ্গে চার ছাত্রর করা সেই তন্ত্রক্রিয়ার সম্পর্ক কী? সেই বইয়ে কী লেখা ছিল?

- বিষয়টা কাকতালীয় হতে পারে।

- তাই যদি হবে, তাহলে সেই বই আমার ঘর থেকে কেন চুরি করা হল?

উত্তর দিতে পারল না জীবসিদ্ধি। চাণক্য আবার পরবর্তী প্রশ্ন করলেন,

- আমরা আসার পর থেকে অনেকের কাছেই তাদের দেখা ভয়ানক দৃশ্যর কথা জানতে পেরেছি। উল্লেখযোগ্য বিষয়, যে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা দৃশ্য দেখেছে। তুমি কি অনুমান করতে পারো এর কারণ কী?

- বোধ হয় পারি। প্রত্যেকে যে যে বিশেষ জিনিসে ভয় পায়, তারা সেটাই দেখতে পেয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের মনের ভয় তাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে।

- উত্তম! যথার্থ যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ। ঠিক যেমন আচার্যপ্রমুখর দেখা ভয়ানক দৃশ্যের ব্যাখ্যা আমি আগেই করেছি। সেভাবেই তোমার মনে সৃষ্টি হওয়া ভয়েরও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

- কীরকম?

- তুমি গুপ্তচর ছিলে। অত্যন্ত সাহসী একজন গুপ্তচর। খোদ মগধের হৃদয়ে, পাটলিপুত্রতে থেকে তুমি আমায় গোপন তথ্য দিতে। কিন্তু সেই দিনগুলোয় সর্বক্ষণ তোমার মনে এই আশঙ্কা থাকত যে কেউ হয়তো তোমায় দেখে নিল, কেউ তোমার ওপর নজর রাখছে। পথ চলতে বহুবার পেছনে চেয়ে দেখার স্বভাব তোমার আজও রয়ে গেছে।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে জীবসিদ্ধি। চাণক্য ব্যাখ্যা করতে থাকেন আবার,

- অতএব, তোমার অবচেতন মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে যে কেউ বুঝি গোপনে তোমার ওপর নজর রাখছে। আর এই কারণেই তোমার নিজের মনে হতে থাকে যে তুমি ঘরে একা নও। তোমার ওপর অদৃশ্য কোনো শক্তি নজর রাখছে। আমার এই ব্যাখ্যা কি তোমার কাছে সন্তোষজনক মনে হচ্ছে, জীবসিদ্ধি?

- হ্যাঁ। মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে, প্রথম যে বৃদ্ধ আচার্যর মৃত্যু হয়েছিল, তিনি অভিশাপের উল্লেখ করলেন কেন?

চাণক্য উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলেন। ওঁর চোখের তারায় কৌতুকের আভাস। বললেন,

- আমি তোমায় প্রশ্ন করব বলেছি। উত্তর দেব তো বলিনি হে জীবসিদ্ধি। আমি বরং পরের প্রশ্নটা তোমার সামনে রাখি। পরের প্রশ্ন, সেদিনের তন্ত্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের কে হত্যা করছে বা হত্যা করার চেষ্টা করছে? এর সঙ্গে এই পুরো ঘটনাক্রমের কী সম্পর্ক?

- আমি সত্যি আর কিছু অনুমান করতে পারছি না। আপনি কি এর উত্তর ভেবে পেয়েছেন?

- নাহ্। পাইনি। এবং এটাই আমায় ভাবিয়ে চলেছে। সব ঘটনার মধ্যে কোনো একটা সূত্র আছে যা এখনও আমার অধরা। সেই সূত্রটা না পেলে এই রহস্যর সম্পূর্ণ সমাধান করা যাচ্ছে না।

- বুঝলাম। তবে আমার মনে হয় অল্প সময়ের বিরতি নিয়ে একটু মুক্ত বাতাস এবং নীল আকাশে বেরোলে লাভ হয়।

- তুমি ভ্রমণের সঙ্গী খুঁজছ সেটা সোজাসুজি বলতে দ্বিধা কোরো না। সেটাই আসল কারণ। এর সঙ্গে রহস্যর সমাধানকে যুক্ত করে অজুহাত দেয়া অহেতুক।

সশব্দে হেসে উঠল জীবসিদ্ধি। চাণক্য নিজেও হেসে উঠলেন। বললেন,

- বেশ। ঘর থেকে কাল বেরোব। একটু প্রাঙ্গণে ঘুরে আসব তোমার সঙ্গে। তবে আজকে নয়।

- আজ নয় কেন? আজকের সকালটা কিন্তু বেশ সুন্দর। গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা করে দিয়েছে। আজ কিন্তু একটু হাঁটতে বেরোনোর আদর্শ দিন ছিল, আচার্য।

- নাহ্। আজ নয়। আজ একটা চিন্তাসূত্র আমার মাথায় এসেছে। সেটা এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে চাই না। কাল যাব। আশা করি কালও ভালোই থাকবে আবহাওয়া। তুমি বরং আজ একটা কাজ করো।

- কী আচার্য?

- একাই ঘুরে এসো। আর সঙ্গী করো চিন্তাকে। এই যে প্রশ্নগুলো করলাম, সেগুলোর উত্তর ভাবো।

১৯.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। উদ্দেশ্যহীনভাবে, ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলেছেন দু-জনে। জ্ঞান স্তূপ, বিভিন্ন আশ্রম, গ্রন্থাগার পেরিয়ে আরও এগিয়ে চলেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দু-জনে কথা বলছেন। বেশিরভাগই পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করছেন গুরু-শিষ্য। মাঝে মাঝেই মৃদু কৌতুকের কথাতে দু-জনে হেসেও উঠছিলেন। চাণক্য একটা সংস্কৃত শ্লোকের অপব্যাখ্যা নিয়ে একটা মজাদার কাহিনি শেষ করতেই হেসে ওঠে জীবসিদ্ধি। কিছুক্ষণ হেসে বলে,

- আচার্য, সত্যি বলছি, এই তক্ষশিলায় থাকার সময়ে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে একদিন এইভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলব, কৌতুক করব। আপনি কিন্তু সেই সময়ে আমাদের কঠিন শাসনে রেখেছিলেন।

- হুম। সেটা আমি অস্বীকার করছি না। তোমাদের ছ-জন ছাত্রকে আমি অন্যদের তুলনায় বেশিই কঠিনভাবে শাসন করতাম। তার কারণ তোমাদের ওপর নির্ভর করছিল গোটা আর্যাবর্তর ভবিষ্যৎ। তাই তোমাদেরকে পরখ করে নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

- আচ্ছা আচার্য, আমরা ছাড়াও আপনার কি অন্য কোনো ছাত্র ছিল?

একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন চাণক্য। বললেন,

- ছিল। এই দেশের যোগ্য ভাবী শাসক ও তার সহযোদ্ধাদের খুঁজে পেতে আমি বেশ কিছু বছর সন্ধান করেছিলাম। আমি বিভিন্ন মানসিক এবং চারিত্রিক পরীক্ষা রাখতাম ছাত্রদের সামনে। চন্দ্রগুপ্তকে আমি বহুবার কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছি। তার বিচারবোধ, বুদ্ধি এবং মানসিক দৃঢ়তার যথাযথ

প্রমাণ পেয়েই তাকে আমি এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছি। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদের আমি বাদ দিয়েছি।

- স্বাভাবিক। তবে আপনার সঙ্গে কৌতুক করার স্পর্ধা কোনোকালে হবে বলে আমরা কেউই কোনোদিন অনুমান করিনি।

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

- মা-বাবার আচরণ তার সন্তানের প্রতি কীরকম হওয়া উচিত জানো? বাল্যকালে তাকে শুধুই স্নেহ দিতে হয়। কৈশোরে তাকে শাসন করা প্রয়োজন। এবং যৌবনে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক রাখা উচিত। একজন গুরু তার ছাত্রর কাছে মা-বাবার সমকক্ষ হয়। অতএব, এখন আমি এবং তুমি বন্ধুর পর্যায়ে পড়ি।

- ধন্য আপনার জীবনদর্শন! খেয়াল করেছেন কি? কথা বলতে বলতে বহুদূর এসে গেছি। এইদিকে আর এগিয়ে লাভ নেই। সামনে স্মৃতিসৌধর প্রাঙ্গণ। তারপর আর কিছু নেই।

তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব একটা প্রাঙ্গণ আছে যেখানে স্বর্গত ছাত্র, কর্মী ও শিক্ষকের স্মৃতির উদ্দেশে একটা করে স্তূপ বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মৃত্যু হলে তাদের স্মরণে ছোটো আকারের এই সৌধ এইখানে স্থাপন করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। তাঁদের সামনে অনেকগুলো এরকম পাথরের স্মৃতিসৌধ। এত বছরের ইতিহাসে, প্রাঙ্গণে বহু মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ কর্মচারীদের থেকে শুরু করে পণ্ডিত আচার্য। সবার নামেই শিলা স্থাপন করা হয় যদি তার মৃত্যু কার্যকালে হয়ে থাকে। সমস্ত কর্মীকে সমান সম্মান দেয়াই এই রীতির উদ্দেশ্য। প্রাচীন শিলাগুলোর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন চাণক্য। খানিকটা নিজের মনেই বলেন,

- সম্ভবত গত কয়েক মাসে অনেকগুলো নতুন স্মৃতিসৌধ যোগ হয়েছে। কয়েক দিন পর আরও একটা নতুন যোগ হবে। আচার্য বিন্দাচলের, যা কিনা এক বছর আগেই স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল।

বিষণ্ণ দেখায় চাণক্যকে। জীবনের একমাত্র সত্য হল মৃত্যু। সেটা চাণক্য জানেন এবং মানেন। তবুও মৃত্যু তাঁর কাছে বরাবরই খুব দুঃখের জিনিস। সম্ভবত বাল্যকালে মা-বাবাকে হারানোর ফলেই আরও বেশি করে তাঁর এরকম মনে হয়। জীবসিদ্ধি বলল:

- একজন মানুষ দেখছি নতুন একটা সৌধ নির্মাণ করছে ওইদিকে। ওই যে দেখুন।

আঙুল দিয়ে দেখাল জীবসিদ্ধি। অনতিদূরে এক ব্যক্তি একটা শিলাখণ্ড

কেটে ঘাসের ওপর বসে তাতে নাম খোদাই করছে। চাণক্য বললেন,

- নিশ্চয়ই সুনাভর জন্যে বানানো হচ্ছে এটা।

দু-জনেই ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন সেইদিকে। কাছে গিয়ে বুঝলেন তাঁদের অনুমানই ঠিক। সুনাভর নাম খোদাই করছে লোকটা। তাঁদের দেখে প্রণাম জানিয়ে, আবার ছেনি আর হাতুড়ি তুলে নিজের কাজে লেগে গেল লোকটা। জীবসিদ্ধি খেয়াল করল যে এইদিকটাতে বেশ কয়েকটা নতুন স্মৃতিসৌধ দেখা যাচ্ছে। আগেরগুলোও সে-ই নির্মাণ করেছে কি না জানতে চাওয়ায় লোকটা জানাল যে, সে-ই এগুলো বানিয়েছে।

তাঁরা আসায় লোকটা বোধ হয় খুব একটা প্রসন্ন হয়নি। কাজের মাঝে অহেতুক কৌতূহলী দুই ব্রাহ্মণের প্রশ্নে সে কিছুটা বিরক্তই হয়েছে। সেটা বুঝেই জীবসিদ্ধি ফেরার জন্যে প্রস্তুত হল। চাণক্যকে ডাকতে গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল সে।

জীবসিদ্ধি লক্ষ করল, চাণক্যর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর কপালে গভীর ভ্রূকুটি। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন নতুন স্মৃতিফলকগুলোর দিকে। কী হয়েছে সে-প্রশ্ন করার আগেই চাণক্য জীবসিদ্ধির উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

- জীবসিদ্ধি, গত কয়েক মাসে কার কার মৃত্যু হয়েছে একবার আমায় মনে করিয়ে দাও তো।

একটু ভেবে জীবসিদ্ধি বলল:

- আচার্য ভীমরজ, ছিত্রবান এবং সবশেষে সুনাভ।

- অর্থাৎ, তিন জন। তাই তো?

- হ্যাঁ।

- তাহলে চতুর্থ স্মৃতিসৌধটা কার?

এই কথায় জীবসিদ্ধি লক্ষ করে বিষয়টা। এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি। সত্যি তো, নির্মীয়মাণ ফলকটা বাদেও আরও তিনটে নতুন প্রস্তরফলক দেখা যাচ্ছে পর পর। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন চাণক্য এবং তাঁর পিছু নিল জীবসিদ্ধি। উলটো দিক থেকে প্রথম সৌধয় নজরে পড়ল ছাত্র ছিত্রবানের নাম, পরেরটাতে আচার্য ভীমরজ। তার পরেরটাতে অপরিচিত একটা নাম দেখতে পেলেন দু-জনে।

'মনীন্দ্রনাথ'।

নামটা বেশ কয়েক বার মনে মনে পড়লেন চাণক্য। যেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছেন তিনি। যদিও জীবসিদ্ধি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে যে এই নাম আগে কখনোই সে শোনেনি। কিন্তু কে এটা? ফলকটা দেখে তো মনে হচ্ছে এটা কয়েক মাসের বেশি পুরোনো নয়। আচার্য ভীমরজের ফলকটার প্রায় সমসাময়িকই এটা। ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে কাজে নিমগ্ন ব্যক্তির উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন আচার্য,

- ওহে, মহাশয়। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনি কি বলতে পারেন যে এই স্মৃতিফলকটা যাঁর উদ্দেশে বানিয়েছিলেন, কে সেই মানুষটি?

এইরকম অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নে লোকটা বেশ বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়। তবু একজন ব্রাহ্মণ আচার্যকে সম্মান দিতেই হয়। তাই স্বরে যতটা সম্ভব বিরক্তি চাপা দিয়ে উত্তর দিল,

- একজন ছাত্রর।

- কীভাবে মারা গিয়েছিল জানেন?

- শুনেছিলাম আত্মহত্যা। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

- ধন্যবাদ।

আর কোনো কথা না বলে চাণক্য ফেরার পথ ধরলেন। তাঁর কপালের ভ্রূ জোড়া এখনও কুঁচকে আছে। কিছুদূর এগিয়ে তিনি, অতিথি-নিবাসে যাওয়ার রাস্তাটা ছেড়ে ডান দিকে মোড় ঘুরে গেলেন। জীবসিদ্ধি বুঝল যে তারা এখনই বাড়ি ফিরছে না। চাণক্য অন্য কোথাও চলেছেন। তাঁর পাশাপাশি চলতে চলতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- আমরা কোথায় চলেছি, আচার্য?

তার দিকে না তাকিয়েই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন চাণক্য,

- প্রধানাচার্যর কাছে।

২০.

- আচার্যপ্রমুখ, আসতে পারি?

আসনে বসে, চারপাইয়ের ওপর একটা ভূর্জপত্রতে কিছু লিখছিলেন বৃদ্ধ। চাণক্যর কথা শুনে তিনি দরজার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। হাসিমুখে বললেন,

- আরে, এসো বিষ্ণুগুপ্ত। এসো, এসো।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি প্রণাম করলেন প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টকে। তারপর তাঁর সামনে আসন গ্রহণ করলেন দু-জন। বৃদ্ধ জীবসিদ্ধির উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

- তোমার স্বাস্থ্য ঠিক আছে এখন? বাসবের কাছে কয়েক দিন আগে শুনছিলাম তোমার স্বাস্থ্য নাকি ভালো নেই?

- এখন সুস্থ আছি, আচার্য।

- উত্তম। আর বিষ্ণুগুপ্ত, তুমি বলো, এত বছর বাদে আবার বিদ্যার্থীদের মাঝে আচার্য রূপে ফিরে যেতে কেমন লাগছে?

- খুবই ভালো লাগছে, আচার্যশ্রেষ্ঠ।

- শুনে প্রসন্ন হলাম। দাঁড়াও, তোমাদের দুধ আর মধু দিই।

বৃদ্ধ একজন ভৃত্যকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। চাণক্য বাধা দিলেন।

- না, আচার্যপ্রমুখ। দয়া করে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার বেশি সময় আমরা নেব না। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি আমি। এগুলোর উত্তর জানা জরুরি।

- বলো, কী প্রশ্ন?

- আচার্যশ্রেষ্ঠ, আপনি কয়েক মাস আগে আমায় যে চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটার বক্তব্য আপনার মনে আছে?

মৃদু হেসে উনি বললেন,

- আমার স্মৃতিশক্তিতে বার্ধক্য বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি, বিষ্ণুগুপ্ত। মনে আছে আমার। কিন্তু কেন বলো তো?

- আমি যতদূর মনে করতে পারছি, তাতে আপনি তিনটে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। অথচ আমরা এখানে আসার পর আপনি যখন সব ঘটনা আমাদের বলেন, তখন মাত্র দুটো মৃত্যুর কথা বলেন। একটা হল বৃদ্ধ আচার্য ভীমরজের, ভয় পেয়ে মৃত্যু। এবং দ্বিতীয়টা ছিত্রবানের আত্মহত্যা। আমি জানতে চাই, তাহলে চিঠিতে আপনি তিনটে মৃত্যুর কথা কেন লিখেছিলেন?

একটু অবাক হলেন প্রধানাচার্য। খানিক ভেবে বললেন,

- হ্যাঁ। চিঠিতে আমি তিন জনের কথা উল্লেখ করেছিলাম বটে। তবে তাদের মধ্যে প্রথম জনের মৃত্যুর সঙ্গে এখানে ঘটে চলা অতিপ্রাকৃত ঘটনাক্রমের কোনো সম্বন্ধ নেই বলে, সেটার কথা উহ্য রাখি।

- সেই মৃত্যুর ঘটনাটাকে আপনার অপ্রয়োজনীয় মনে করার কারণ কী, আচার্য?

- কারণ এইসব ঘটনা শুরু হওয়ার অনেক আগেই সেই ছাত্র আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি যে, সেই বিশেষ রাতে চার ছাত্র তন্ত্রক্রিয়া করার আগেই একজন ছাত্র আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বলেই আমি আর সেটা বলিনি।

- আমি প্রার্থনা করি, আপনি ওই ছাত্রর আত্মহত্যার ঘটনাটা আমায় বিশদে বলুন। দয়া করে কোনো তুচ্ছ কথাও বাদ দেবেন না। সে-তথ্যটা যতই অপ্রয়োজনীয় মনে হোক, তবুও বাদ দেবেন না।

বৃদ্ধ মনের ভেতরে ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে, বলতে শুরু করলেন,

- এখানকার কঠোর নিয়মকানুনের কথা তুমি তো জানোই। আচার্য যদি কোনো ছাত্রকে যোগ্য মনে না করেন, তবে তাকে বহিষ্কার করা হয়। প্রতি বছর বহু ছাত্র তক্ষশিলায় আসে উচ্চশিক্ষার আশায়। ছাত্রদের এক বছর সময়সীমা দেয়া হয়, তার ভেতর কোনো ছাত্র চাইলে তার অধ্যয়নের আশ্রম পরিবর্তন করে নিতে পারে। যেমন জীবসিদ্ধি নিজে একসময় আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন ছেড়ে তোমার আশ্রমে এসেছিল। অনেক ছাত্রই এটা করে থাকে।

এক বছর আগে, মনীন্দ্রনাথ নামে এক ছাত্র প্রথমে ইন্দ্রজাল বিদ্যার আশ্রমে যোগ দেয়। কিন্তু বিষয়টা কঠিন মনে হওয়ায় সে ছ-মাসের পরেই কলা বিভাগে যোগ দেয়। কিন্তু অচিরেই তার আচার্য উপলব্ধি করেন যে কলা বিষয়েও তার কোনো গুণ নেই। আচার্যরা তাকে পরামর্শ দেন যে সে যেন নিজের জীবনের সময় নষ্ট না করে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করে। কারণ তার মধ্যে শিক্ষালাভের কোনোরকম সদিচ্ছা বা প্রচেষ্টা ছিল না। সেই অনুযায়ী, তার আচার্য আমার কাছে তার জন্যে একটা অব্যাহতি আবেদন লেখেন। আমি ছাত্রটিকে ডেকে প্রশ্নও করেছিলাম যে সে কি বিদ্যালয় ছাড়তে ইচ্ছুক? নাকি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চেষ্টা করতে চায়? তার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল তার কোনোদিনই শিক্ষালাভের সত্যিকারের কোনো ইচ্ছে ছিল না। সে সম্ভবত বাবার কথায় এসেছিল। অতএব, আমিও তার আচার্যর লেখা, তার নামের অব্যাহতি আবেদন মঞ্জুর করে দিই। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। কারণ এর দু-দিন পরেই সেই ছাত্র পশ্চিমের অব্যবহৃত প্রাঙ্গণের একটা মিনার থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। সম্ভবত তার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রবল চাপ ছিল তার ওপর। তাই বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাদের কাছে ফেরার চেয়ে, মৃত্যু তার কাছে সহজ পথ মনে হয়েছিল।

- সে যে আত্মহত্যাই করেছিল সে-বিষয়ে কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?

একটু চিন্তিত দেখায় প্রধানাচার্যকে। তিনি বলেন,

- দেখো বিষ্ণুগুপ্ত, এই ঘটনাটা ঘটেছিল, তক্ষশিলায় সমস্যা শুরু হওয়ার প্রায় এক মাস আগে। তাই আমাদের কারুর পক্ষেই বিষয়টা সন্দেহজনক মনে করার কোনো কারণ ছিল না। ছাত্রটির পরিবার শোকার্ত হলেও বিষয়টা মেনে নিয়েছিল। তাই এই বিষয়টা যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম দিন তোমায় বলা উচিত ছিল, তা আমার একবারও মনে হয়নি। আমি ভেবেছিলাম যে এই মৃত্যুর সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাক্রমের কোনো সম্পর্ক নেই।

- আপনার দোষ নয়। এখানে প্রতিটা মানুষেরই মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে সমস্ত সমস্যার মূল হল সেই রাতের তন্ত্রক্রিয়া। সবাই মনে করে সেই রাতের পর থেকেই সমস্যার শুরু হয়েছে। তাই কেউই সেই ঘটনার এক মাস আগে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাক্রমের যোগ খুঁজে পাবে না।

- ঠিক বলেছ। তবু চিঠিতে আমি মৃত্যুর সংখ্যাটা তিন লিখেছিলাম। যদিও পরবর্তী সময়ে আর সেটার উল্লেখ করিনি। তুমি কি সন্দেহ করছ যে বাকি ঘটনাক্রমের সঙ্গে এই ঘটনাটার যোগ আছে?

প্রশ্নটা চাণক্য শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। অন্যদিকে চেয়ে কিছু একটা ভাবছেন তিনি। হঠাৎ বললেন,

- এই ঘটনার ঠিক তারিখটা কী ছিল সেটা জানা প্রয়োজন।

আচার্যপ্রমুখ একজন ভৃত্যকে ডেকে কিছু আনার নির্দেশ দিলেন। ভৃত্যটি কিছুক্ষণ বাদেই একটা সেলাই করা ভূর্জপত্রর দিস্তা এনে হাজির করল। সেটা প্রধানাচার্যর সামনে চারপাইয়ের ওপর নামিয়ে রাখল। সেটা খুঁজে বৃদ্ধ বললেন,

- এই যে, এই হল মনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তারিখ।

চাণক্য এগিয়ে গিয়ে সেই ভূর্জপত্রটা দেখলেন। বললেন,

- হুম। তন্ত্রক্রিয়া করার ঠিক এক মাস আগের তারিখ।

চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। তাঁর আর কোনো প্রশ্ন নেই। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রধানাচার্যর কার্যালয় থেকে। মাটির দিকে চেয়ে পথ চলতে লাগলেন। জীবসিদ্ধি তাঁর পাশেই চলছিল। সে এতক্ষণ কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করল,

- কী ভাবছেন, আচার্য?

- চার ছাত্র যে রাতে তন্ত্রক্রিয়া করেছিল, সেটা অমাবস্যার রাত ছিল বলেই আমরা জানি। তাই না?

- হ্যাঁ। অমাবস্যার রাতকেই সমস্ত অশুভ তান্ত্রিক কার্যকলাপের যোগ্য সময় বলা হয় বলে শুনেছি।

- হুম। তার ঠিক একমাস আগের দিনটাও অমাবস্যা ছিল। তাই নয় কি?

- সেটাই স্বাভাবিক। কেন আচার্য? এই দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন?

- অবশ্যই, জীবসিদ্ধি। গভীর সম্পর্ক আছে। এবং এর থেকেই রহস্যর একটা অমীমাংসিত অংশের সমাধান হবে।

জীবসিদ্ধি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার আচার্যর দিকে। চাণক্য তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন,

- তোমার কথাই সত্যি হল তবে। খোলা বাতাসে ভ্রমণ করতে বেরিয়েই সমাধানের সূত্র পেলাম। ঘরে বসে আরও কয়েক দিন ভাবলেও এই অজানা তথ্যটা জানতে পারতাম না কখনোই। তোমায় ধন্যবাদ। তুমি অজান্তেই আমার বড়ো উপকার করলে হে, জীবসিদ্ধি।

হেসে উঠলেন চাণক্য।

২১.

গতকাল অতিথিনিবাসে ফেরার পর থেকে চাণক্য একান্তেই থেকেছেন। বেশিরভাগ সময়েই কাটিয়েছেন পদ্মাসনে বসে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। জীবসিদ্ধি ওঁকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করেনি। সে একটা কথা বুঝতে পেরেছে যে চাণক্য রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন। কালকেই তিনি সমাধানের শেষ সূত্র পেয়েছেন।

জীবসিদ্ধি নিজের ঘরেই থেকেছে। সেও সারাদিন ভেবেছে। ভেবে যতবারই তার মনে হয়েছে যে একটু হলেও কিছু রহস্যের জট সে নিজে খুলতে পেরেছে, ততবারই আবার জড়িয়ে গেছে জট। বিকেলে আবার একাই একটু হাঁটতে বের হয় জীবসিদ্ধি। খোলা হাওয়ায় মস্তিষ্কের দরজা খুলে যাবে সেই আশায়। প্রাঙ্গণে চলতে চলতে আজ অবধি ঘটা প্রতিটা ঘটনা প্রথম থেকে সাজানোর চেষ্টা করে সে।

সবার প্রথমেই আসে এক বছর আগে, আচার্য বিন্দাচলের হত্যা। আচার্য বিন্দাচলকে কেউ তাঁর বাড়িতেই, পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে। হত্যাকারী নিশ্চয়ই আগে থেকে ভেবে রেখেছিল যে সে হত্যা করবে। কারণ হত্যা করার জন্যে একটা ভারী ধাতব ডান্ডা সে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। হত্যা করে সেই অস্ত্র এবং মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পেছনে, একটা পরিত্যক্ত কুয়োয় ফেলে দেয়। তারপর সে ফিরে আসে এবং বেশ কিছু সমসাময়িক নথি আগুনে নিক্ষেপ করে। হত্যাকারী চায়নি যে কেউ তার নতুন গবেষণার বিষয়ে অবগত হোক।

এরপরে সে বিন্দাচলের কিছু জিনিস একটা কাঠের পেটিতে ভরে নিয়ে গিয়ে দূরে, একটা জঙ্গল ঘেরা খাদে ফেলে দেয়, যাতে সবাই ভাবে যে জিনিসপত্র নিয়ে আচার্য বিন্দাচল প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেছেন।

এর পরের ঘটনা প্রায় মাস ছয়েক পরের। একজন ছাত্র, নাম মনীন্দ্রনাথ, আত্মহত্যা করে। যদিও গতকাল আচার্যর প্রতিক্রিয়া দেখে সন্দেহ হয় যে এটা হয়তো আত্মহত্যা নয়। এই ঘটনার সঙ্গে বাকি সব কিছুর কোনো মিলই ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু একটা বিষয় ছাড়া। এই আত্মহত্যা বা হত্যাটা যেদিন হয়েছিল, সেইদিন ছিল অমাবস্যা। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা এর পরবর্তী অমাবস্যার রাতেই ঘটে। চার জন ছাত্র গোপনে একটা অজানা তন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়। সেই রাতে তারা প্রচণ্ড ভয়ংকর কিছু দৃশ্যও দেখতে পায়। এর ফলে চার জনের মধ্যে তিন জন উন্মাদ হয়ে গেছে। আর চতুর্থজন ভীত হলেও, এখন অনেকটা সুস্থ। এখানেও আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় জীবসিদ্ধির মনে। চার জনের মধ্যে একজন শুধু কীভাবে সুস্থ হল?

এই ঘটনার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অজানা ভয়ের ছায়া নেমে আসে। একে একে অনেকেই তাদের ভয় পাওয়ার এবং ভয়ংকর দৃশ্য দেখার কাহিনি নিয়ে এগিয়ে আসে। সকলের ধারণা হয় যে ওই রাতেই অসফল তন্ত্রসাধনার ফলে অভিশাপ নেমে এসেছে সকলের ওপর। যদিও, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্যর তদন্তে অন্য তথ্য উঠে এসেছে। তিনি জেনেছেন যে অনেকেই এই ঘটনার আগে থেকেই অবসাদ, অনিদ্রা এবং অজানা আতঙ্কে ভুগছিলেন। এটার কারণ কী? জানা নেই।

এরপর আরও একজন আচার্যর মৃত্যু ঘটে। আচার্য ভীমরজ। বৃদ্ধ মানুষটি, নিজের বাড়িতে কিছু একটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন। আর এর ফলেই ওঁর হৃদয়ের গতি থেমে যায়। কিন্তু ইনি মৃত্যুর আগের মুহূর্তে অভিশাপের কথা বলে যান। এটার কারণ কী হতে পারে? তিনি কি কিছু জানতেন? নাকি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন? এমনও তো হতে পারে, যে পুরোটাই শুনতে ভুল হয়েছে। হয়তো অত্যন্ত সাধারণ কিছু বলতে চেয়েছিলেন তিনি। ওঁর স্ত্রী ভুল শুনেছিল। সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

হাঁটতে হাঁটতে জীবসিদ্ধি অনেকটা দূর এসে গেছিল। সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে দেখে, এইবার সে অতিথিনিবাসে ফেরার পথ ধরল। যেখানে তার চিন্তার জালে ছেদ পড়েছিল, সেখান থেকেই আবার ভাবতে শুরু করল জীবসিদ্ধি।

বৃদ্ধ আচার্যর মৃত্যুর পর অভিশাপের কথাটা আরও ছড়িয়ে যায়। অশুভ অভিশাপে সবাই বিশ্বাস করে। এর পরেই চার জন ছাত্রর এক জনের মৃত্যু ঘটে। তীব্র আতঙ্কে ছিত্রবান, আয়ুরালয়ের দ্বিতীয় তলার জানলা থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্তত তাই বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বিচারে, এটাও হত্যা হওয়া বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। কারণ কেউ একজন যে এই ছাত্রদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে তা প্রমাণিত।

এর পরেই তক্ষশিলায় আসে সে এবং আচার্য চাণক্য। পরবর্তী সমস্ত ঘটনার সাক্ষী তারা নিজেরাই থেকেছে। আর তার মধ্যে প্রথম বড়ো ঘটনা হল, দ্বিতীয় ছাত্র, সুনাভর হত্যা এবং তৃতীয় ছাত্র, পুষ্পলের প্রাণহানির চেষ্টা। পুষ্পলকে এই মুহূর্তে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, কিন্তু সে পুরোপুরি উন্মাদনার গ্রাসে চলে গেছে। এই মুহূর্তে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য তার থেকে পাওয়ার আশা অতি ক্ষীণ। সেই রাতেই চাণক্যর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর ঘর থেকে তন্ত্র বইটা চুরি যায়। কেউ একজন চাইছে না যে সেই বই পুরোটা অন্য কেউ পড়ুক। কেন? কী আছে তাতে? সেটা না পাওয়া গেলে কীভাবে সেই তথ্য অনুধাবন করবেন আচার্য?

এর পরেই চতুর্থ ছাত্রর, অর্থাৎ কুমার সুভাষের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের চেষ্টা হয়। সেও সতর্ক থাকার কারণে রক্ষা পেয়েছে। যদিও সেও কোনো জরুরি তথ্য দিতে পারেনি আচার্য চাণক্যকে। তবে সে একটা সম্ভাবনার কথা বলেছে, যেটা জীবসিদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। সেটা হল, এই তক্ষশিলার বাসিন্দারাই হয়তো তাদের হত্যা করতে গোপন হত্যাকারী নিযুক্ত করেছে। তাদের কেউ হয়তো এই ধারণা দিয়েছে যে এই চার ছাত্রর মৃত্যু ঘটলে তবেই শাপমুক্তি ঘটবে সকলের। এই হত্যাকারী যে একজন প্রশিক্ষিত

মানুষ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুনাভকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার গলার তরুণ-অস্থি ভেঙে, সেটা একজন যুদ্ধকলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আর ভুলে গেলে চলবে না যে সেই হত্যাকারী, কুমারের দেহরক্ষীর সঙ্গে লড়াইও করেছে। অর্থাৎ সে যথেষ্ট ভালোরকম প্রশিক্ষিত।

এইবার থেকে যায় আরও অনেক প্রশ্ন। কে এই হত্যাকারী? আচার্য বিন্দাচল কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন? যদি ধরে নেয়া যায় যে তিনি মাদক জাতীয় কোনো উদ্ভিদ বিষয়ে গবেষণারত ছিলেন, তাহলেও প্রশ্ন আসে যে তার সঙ্গে বাকি ঘটনাগুলো কীভাবে যুক্ত? তাঁকে হত্যা করা হল কেন? কে করল?

সেইদিন রাতে কী এমন ঘটেছিল যে চার জন ছাত্র এত ভয় পেল?

যদি ধরে নেয়া যায় যে আচার্য বিন্দাচলের আবিষ্কৃত কোনো বিশেষ মাদকের প্রভাবে এইখানে মানুষদের মনে এই ভয় তৈরি হয়েছিল, তবে প্রশ্ন আসে, সেই মাদক কোন অলৌকিক উপায়ে এত জন মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হল? কেউ বেশি ভয় পেয়েছে, কেউ কম। কিন্তু মাদকের প্রভাবের লক্ষণ বেশিরভাগ বাসিন্দার মধ্যেই বর্তমান। তাঁর নিজের শরীরেও তা প্রভাব ফেলেছে। কীভাবে? খাবার আর জল? তার তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর যদি-বা তাই হয়, তবে আচার্য চাণক্যর শরীরে সেই লক্ষণ বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেল না কেন? তাঁরা দু-জন তো একই খাবার এবং পানীয় জল গ্রহণ করছেন সেই প্রথম দিন থেকেই। তবে?

কে? কে আছে এই গভীর ষড়যন্ত্রর নেপথ্যে? কেন সে হত্যা করতে চায় এই ছাত্রদের? কী তার উদ্দেশ্য? কীভাবে সে এতজন মানুষকে ভয় দেখাতে সক্ষম হচ্ছে? পুরোটাই কি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য? নাকি এর পেছনে সত্যিই আছে অতিপ্রাকৃতর অবদান?

এইসব এলোমেলো চিন্তার মাঝে ডুবে থাকতে থাকতেই নিজের ঘরের সামনে এসে পৌঁছে গেছে জীবসিদ্ধি। আচার্যর ঘরের দরজা খোলা। সেখানে এখন প্রবেশ করা সমীচীন কি না ভাবতে থাকে জীবসিদ্ধি। তখনই ঘরের ভেতর থেকে তার নাম ধরে ডাক দেন চাণক্য,

- জীবসিদ্ধি? এলে?

আর দেরি না করে আচার্যর ঘরে ঢোকে জীবসিদ্ধি। চাণক্য বসে আছেন তাঁর আসনে। নিজের লম্বা টিকির চুল বাঁধছেন। জীবসিদ্ধিকে দেখে মৃদু হাসলেন আচার্য। তাঁর চোখের তারা উজ্জ্বল। বিজয়ীর দৃষ্টি তাতে। এই দৃষ্টির সঙ্গে জীবসিদ্ধির পরিচয় আছে। রহস্যর সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন আচার্য চাণক্য! কোনো সন্দেহ নেই। এ সেই দৃষ্টি। উত্তেজিত হয়ে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- রহস্যর সমাধান হয়ে গেছে?!

- হুম। কিছু জায়গা এখনও পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, বলা চলে যে সমাধান হয়েছে।

- সাধু! সাধু!

- আরও একটা সুসংবাদ আছে।

- কী সুসংবাদ, আচার্য?

- মগধ থেকে চিঠি এসেছে। ওই উদ্ভিদের বিষয়ে আমার সন্দেহই ঠিক।

চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে হাত বাড়িয়ে একটা ছোট্ট কাগজের চিরকুট দিলেন। সেটা নিতে নিতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- যাক। বেশি দেরি হয়নি তবে।

- নাহ্। ওই কারণেই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে এই চিঠি যেন পায়রার গলায় বেঁধে পাঠানো হয়। চারদিন আগেই মগধ থেকে প্রশিক্ষিত পায়রা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তারিখ দেখলেই বুঝবে। আজই বিকেলে তা তক্ষশিলার পায়রা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে পৌঁছোয়। সেখান থেকেই এক দূত খানিক আগে এটা আমায় এনে দিল।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল জীবসিদ্ধি।

মহামতি চাণক্য,

প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার নির্দেশমতো সবকটা উদ্ভিদ পরীক্ষা করেছি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটামাত্র গাছ। সীমিত এই চিঠিতে আমি শুধু সেটার বিষয়েই লিখে পাঠালাম।

উদ্ভিদটা আরবদেশের কুখ্যাত একটা মাদক জাতীয় গাছ। স্থানীয় নাম 'কাৎ' বা 'খাৎ'। এই পাতা সেখানকার স্থানীয়রা নেশার উদ্দেশ্যে খেয়ে থাকে। এর অত্যধিক এবং টানা বহু বছরের সেবনে অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, বিষণ্ণতা, দুর্বল হৃদয় এবং আত্মহননের প্রবণতা বাড়ে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বিভ্রান্তিকর দৃশ্য দেখে, অমূলপ্রত্যক্ষ* এবং অহেতুক ভয়ের শিকার হয়।

আশা রাখি এই তথ্য আপনার উপকারে লাগবে।

ইতি,

সাম্বপাল।

পড়া শেষ করে জীবসিদ্ধি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাণক্যর দিকে চাইল। চাণক্য উত্তর দিলেন,

- মগধের মাদক ও উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ এই সাম্বপাল। মাদক বিষয়ে তার মতো জ্ঞান খুব কম পণ্ডিতের আছে।

- এর নাম শুনিনি আগে।

- শোনোনি কারণ এ রাজপণ্ডিত নয়। সত্যি বলতে এ একজন মাদকের কালোবাজারির সর্দার।

- সেকী? এরকম একজনের কাছে আপনি গাছগুলো পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন?

- হুম। ফুলের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান মৌমাছিরই থাকে।

কিছুক্ষণ ভেবে জীবসিদ্ধি আবার প্রশ্ন করল,

- কিন্তু আচার্য, এতে তো বলা হয়েছে এইসব লক্ষণ, শুধুমাত্র বেশি মাত্রায় এই জিনিস শরীরে প্রবেশ করলে, বা বহুদিনের ব্যবহারেই দেখা দেয়। এক্ষেত্রে তবে কেন দেখা দিল?

- অনুমান করতে পারি, আচার্য বিন্দাচল এই 'কাৎ' পাতার ওপর গবেষণা করে এর প্রভাব অনেক গুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটারই প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তক্ষশিলায়।

- কিন্তু তিনি তো মৃত। তবে কে রয়েছে এই হত্যা, এই ষড়যন্ত্রর নেপথ্যে? আপনি তা জানেন?

মৃদু হেসে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- হুম। আমি জানি।

অমূলপ্রত্যক্ষ - হ্যালুসিনেসন

২২.

তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ঝলমল করছে প্রভাতসূর্যর কিরণে। মৃদু বাতাস নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে আশপাশের দেবদারুর পাতাগুলো। শুকনো পাতা দুটো একটা ঝরে পড়ছে লাল পাথরের প্রাঙ্গণে। স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন সভাস্থল। স্বয়ং মহামতি পাণিনি এই মুক্ত প্রাঙ্গণে ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন একসময়ে। আজ সেখানেই জড়ো হয়েছে বেশ কিছু মানুষ। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই তক্ষশিলার আচার্য। আচার্য বুধাদিত্য এবং আচার্য দধীচ তাঁদের মধ্যেই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। চাণক্য তাঁদেরকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের আজকে এখানে ডেকে আনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। চাণক্যর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই এসেছেন।

এঁদের মাঝে স্বর্গীয় আচার্য ভীমরজের স্ত্রীও আছেন। চাণক্য ওঁকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকটা পরিচিত মুখ। বাসব, আয়ুরালয়ের কয়েকজন চিকিৎসক তথা কর্মী, এবং অন্যান্য কিছু দাস-দাসী যারা নিজেরাই কৌতূহলী হয়ে এসেছে। একদিকে দাঁড়িয়ে আছে কুমার সুভাষ এবং তার দেহরক্ষী বল্লভ। দূরে বেশ কয়েকজন ছাত্র এসে ভিড় করেছে, যদিও ছাত্রদের মধ্যে

শুধু সত্যকাম আমন্ত্রিত এবং তাকে এখানে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন চাণক্য। চাণক্য এই মুক্ত সভাস্থলে সবার আগে এসেছেন। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ঋজু ভঙ্গিতে। কেউ এলে তিনি করজোড়ে তাঁদের অভিবাদন জানাচ্ছেন। জীবসিদ্ধি ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছে। এখন সকলেই প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টর অপেক্ষায় আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনিও এসে উপস্থিত হলেন, সকলের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তিনি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আসন গ্রহণ করলেন। চাণক্যর দিকে চেয়ে একবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

চাণক্য এইবার উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে ঘুরে বলতে শুরু করলেন,

- সত্যেন ধার্যতে পৃথিবী, সত্যেন তপতে রবিঃ। সত্যেন বাতি বায়ুষ্চঃ সর্ব সত্য প্রতিষ্ঠিতম্।।*

উপস্থিত প্রত্যেকে নিশ্চুপ হয়ে চাইল বক্তার দিকে।

- সত্যই এই পৃথিবীর আধার, সত্যই সূর্যের তেজ এবং বায়ুর গতি। সত্য প্রতিষ্ঠার ওপরেই এই সারা জগৎসংসার টিকে আছে। আমরা আজ সেই সত্যর সন্ধানেই এখানে সকলে একত্রিত হয়েছি। প্রথমেই আপনাদের এখানে আনার জন্যে আমি এখানে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। আপনাদের ব্যস্ততার মাঝেও আমার অনুরোধ রাখার জন্যে ধন্যবাদ। সময় বড়ো মূল্যবান। তাই আপনাদের বেশি সময় আমি নেব না। যাদের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় নেই, সেই নবীন সদস্যদের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাখি। আমি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য, তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন আচার্য। আমার সঙ্গী জীবসিদ্ধি আমার শিষ্য এবং সে নিজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, গত কয়েক মাস ধরে ঘটতে থাকা ঘটনার ব্যাপারে আপনারা সকলেই অবগত। প্রায় দু-মাস আগে মাননীয় প্রধানাচার্য আমায় চিঠি দিয়ে এখানকার অবস্থা জানান এবং আমায় এখানে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি আমার ওপর একটা গুরুদায়িত্ব দেন। এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঘটতে থাকা আপাতদৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃত এবং রহস্যজনক ঘটনার সমাধানের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তান। রহস্যর নিভৃতে লুকিয়ে থাকা সত্য খুঁজে বের করতে বলেন আমায়। গত দেড় মাসে সেই প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে আজ আমি আপনাদের তা জানাতে চাই।

শুরু করা যাক গোড়া থেকে। মাস ছয়েক আগে, ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিভাগের চার জন ছাত্র, গ্রন্থালয় থেকে একটা অজানা পুথি খুঁজে পায়। তাতে তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা পিশাচসিদ্ধ হওয়ার পদ্ধতি লেখা ছিল। কৌতূহলবশত তারা এক অমাবস্যার রাতে, গোপনে সেই তন্ত্রক্রিয়া করে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ফলাফল হয় ভয়াবহ, যা আপনারা সকলেই জানেন। দুর্ভাগ্য যে, আমি আসার আগেই

একজন ছাত্র আত্মহত্যা করে। কিন্তু বাকি তিন জন ছাত্রকেই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং তা করতে গিয়ে দুটো তথ্য আমার সামনে উঠে আসে। প্রথমত, প্রত্যেকে সেই রাতে ভয় পেলেও, তারা যে দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিল, সেগুলি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ তিন জন ছাত্রের মধ্যেই কয়েকটি লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। উৎকণ্ঠা, প্রসারিত চোখের মণি, বিষণ্ণ ভাব এবং ভয়। এগুলো থেকে প্রথমেই সন্দেহ হয় যে এই ছাত্ররা মাত্রাতিরিক্ত মাদক সেবন করেছে। কিন্তু সেই একই লক্ষণ শুধু তাদের মধ্যে নয়, বরং কমবেশি এই তক্ষশিলার বেশিরভাগ অধিবাসীদের মধ্যেই দেখতে পেলাম। এমনকী আমাদের আচার্যপ্রমুখও এই লক্ষণগুলোর শিকার হয়েছেন। যদিও সবাই এই ঘটনাগুলোকে অভিশাপ বা অপশক্তির রোষ বলে ধারণা করে। কিন্তু আমার অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ আলাদা একটা তথ্য উঠে আসে। বাস্তবে এই লক্ষণগুলো এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনার কয়েক মাস আগে থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথমে কেউই সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এই তথ্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে সেই রাতের তন্ত্রক্রিয়ার সঙ্গে, সবার ভয় পাওয়ার কোনো যোগ নেই। কেউ-বা কারা এর আগে থেকেই এখানকার বাসিন্দাদের শরীরে কোনো এক অজানা মাদক জাতীয় ভয় উৎপাদনকারী জিনিস প্রবেশ করিয়েছে।

প্রত্যেকে অবচেতন মনে কিছু ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে। সকলের দেখা ভয়াবহ দৃশ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে আরও একটা তথ্য উঠে আসে। আর তা হল, এই মাদকের প্রভাবে মানুষের সামনে সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে, যে জিনিসকে সে ভয় পায়। অবচেতন মন তার সামনে তারই অন্তরের ভয়কে ফুটিয়ে তোলে।

উপস্থিত প্রত্যেকেই উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলা শুরু করেছে। একজন অচেনা ব্যক্তি প্রশ্ন করল,

- তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এগুলো কোনো অতিপ্রাকৃতর প্রভাব নয়? কোনো অভিশাপ নয়?

- না। এই পুরো ঘটনার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে প্রশ্ন আসে, তবে স্বর্গত আচার্য ভীমরজ মৃত্যুর আগের মুহূর্তে অভিশাপের উল্লেখ কেন করেছিলেন? এর উত্তর দেয়ার আগে আমি ওঁর স্ত্রীকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বৃদ্ধা মহিলা যিনি এতক্ষণ নিশ্চুপ বসেছিলেন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানালেন চাণক্যকে। চাণক্য প্রতি অভিবাদন জানিয়ে প্রশ্ন করলেন,

- মা, আমার একটাই প্রশ্ন। আপনার স্বামী কি বিষধর সাপকে ভয় পেতেন?

এই প্রশ্নে চমকে উঠলেন বৃদ্ধা। খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,

- আপনি ঠিকই বলছেন, মহামতি। আমার স্বামী বরাবরই বিষধর সাপকে ভয় পেতেন। কিন্তু এই তথ্য আপনাকে কে দিল?

সন্তুষ্টভাবে চাণক্য মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন,

- আপনার স্বামীই বলেছেন। মৃত্যুর আগেই বলেছেন। তিনি যে শব্দটা বলেছিলেন তা 'শাপ' অর্থাৎ অভিশাপ নয়। কথাটা 'সাপ' মানে নাগ! ওঁকে তাঁর অবচেতন মন বিষধর সাপ দেখিয়েছিল সেই রাতে। সেই দৃশ্য দেখেই ভয় পেয়ে ওঁর মৃত্যু হয়। এতে অভিশাপ বা পিশাচের কোনো সম্পর্ক নেই।

কথাগুলো উপস্থিত প্রত্যেকের মস্তিষ্কে স্থিত হতে একটু সময় দিলেন চাণক্য। তারপর আবার শুরু করলেন,

- অতএব, এই সমস্তটাকেই যদি অজানা মাদকের প্রভাব বলে ধরে নিই, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন আসে, সেই মাদকটা কী? এর উত্তর জানানোর আগে আপনাদের আমি আরও একটা ঘটনার কথা জানাতে চাই। এক বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছেড়ে একজন আচার্য কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি উদ্ভিদবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, আচার্য বিন্দাচল। কেউ জানত না তিনি কোথায় গেছেন বা কবে ফিরবেন। একদিন সকালে দেখা যায় তাঁর বাসভবন খালি। একটা পেটি এবং সমস্ত আবশ্যিক জিনিসপত্র নিয়ে তিনি আগের দিন কোনো এক সময়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছেন। বিষয়টায় কেউই গুরুত্ব দেয়নি। সবাই ধরে নিয়েছিল যে তিনি ফিরে আসবেন কিছুকাল পর। কিন্তু তিনি আর কোনোদিন ফিরলেন না। প্রত্যেকে ধরেই নিল যে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে চলে গেছেন।

একটু বিরতি নিয়ে চাণক্য বললেন,

একমাস আগে কয়েকজন ছাত্র উত্তরের জঙ্গলের খাদ থেকে কাঠের একটা পরিত্যক্ত পেটি খুঁজে পায়। সেই পেটির মধ্যে থাকা জিনিসপত্র থেকে আমার সন্দেহ হয় যে সেটা আচার্য বিন্দাচলের। আমি বিন্দাচলের পরিত্যক্ত বাসভবনটা তল্লাশি করি এবং কয়েকটা সন্দেহজনক সূত্র পাই। তাঁর কিছু গবেষণাপত্র কেউ আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে। হয় তিনি নিজে অথবা অন্য কেউ এই কাজ করেছে। আরও কিছু সূত্র থেকে আমার সন্দেহ দৃঢ় হয় যে বিন্দাচল এই প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাননি। তাঁকে কেউ-বা কারা হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলেছে এবং তাঁর জিনিসপত্র একটা পেটিতে ভরে নির্জন জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়, যাতে সকলের প্রাথমিক ধারণা হয় যে তিনি নিজেই স্থান ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আবার প্রশ্ন থেকে যায়। ওঁর মৃতদেহ কোথায়? মালপত্র সমেত পেটি তাঁর বাসভবন থেকে নিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ নয়। দিনের বেলাতেও একজন ব্যক্তিকে একটা পেটি নিয়ে যেতে দেখলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। কিন্তু মৃতদেহ? সেটা নিশ্চয়ই হত্যার জায়গা থেকে বেশি দূর নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাহলে সেই মৃতদেহ কোথায়?

চাণক্য এইবার ফিরলেন আচার্যপ্রমুখ ভদ্রভট্টর দিকে। বললেন,

- আমায় ক্ষমা করবেন, আচার্যশ্রেষ্ঠ। আরও একটা দুঃসংবাদ আমি আপনার থেকে গোপন করেছি। আচার্য বিন্দাচলের বাড়ি থেকে ফেরার পথে দৈবাৎ আমি জানতে পারি যে তাঁর বাসভবনের কাছেই একটা পরিত্যক্ত কুয়ো আছে। মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে সময় লাগেনি। আপনার অনুমতি ছাড়াই আমি সেই কুয়ো পরীক্ষা করিয়েছি। তাতে এক বছর পুরোনো, আচার্য বিন্দাচলের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এখনও সেই মৃতদেহ সেখানেই আছে।

এই তথ্য জানতে পেরে প্রত্যেকে উত্তেজিতভাবে কোলাহল শুরু করল। বজ্রাহতর মতো হতবাক বসে আছেন বৃদ্ধ প্রধানাচার্য। চাণক্য আরও একবার করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে।

** চাণক্যনীতি - ৫.১৯*

২৩.

চাণক্য আবার সামনে ফিরে সকলের উদ্দেশে বলতে শুরু করলেন,

- আমার সন্দেহ হয়েছিল যে আচার্য বিন্দাচলের হত্যার সঙ্গে নিশ্চয় পরবর্তী ঘটনাক্রমের কোনো যোগাযোগ আছে। আর সেই কারণেই আমি তাঁর গবেষণাগার থেকে কয়েকটা অজানা উদ্ভিদ, পরীক্ষা করতে মগধে পাঠাই। সেই পরীক্ষায় আমার সামনে আরও একটা তথ্য উঠে আসে। সেইসব উদ্ভিদের মধ্যে একটা বিশেষ গাছের পাতা মাদক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই গাছের নাম 'কাৎ' এবং তা পাওয়া যায় আরব দেশে। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আমরা বিন্দাচলের বাড়িতে কিছু আরব দেশ থেকে আনা গাছের বিনিময় রসিদ আগেই পেয়েছিলাম। অতএব, আমি সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই বিশেষ উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করেই আচার্য বিন্দাচল এক ধরনের মাদক বানিয়ে ফেলেছিলেন। এর প্রভাব, সাধারণ মাদকের চেয়ে বেশি এবং অত্যধিক মাত্রায় একবার ব্যবহারে তা মানুষকে উন্মাদ পর্যন্ত করতে সক্ষম। এই ভয়ানক আবিষ্কারের ব্যবহার আচার্য বিন্দাচল সম্ভবত কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানিয়েছিলেন। তক্ষশিলার বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সেই ব্যক্তি এই আবিষ্কারটা ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু বিন্দাচল এই ষড়যন্ত্রে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

একটু বিরতি নিয়ে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চাণক্য। প্রত্যেকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে তাঁর কথা। আবার তিনি কথা শুরু করলেন,

- এই জিনিসটাই গত কয়েক মাস ধরে এখানকার বাসিন্দাদের শরীরে একটু একটু করে প্রবেশ করানো হয়েছে। তিল তিল করে প্রতিটা মানুষ

এই মাদকের প্রভাবে ভয় পেয়েছে, অতিপ্রাকৃত ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে এবং ভয়ে একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এইবার আসি সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নে। কীভাবে? কীভাবে এই মাদক সবার শরীরে কম বেশি প্রবেশ করানো সম্ভব হল, অথচ কেউ জানতেও পারল না?

খাবার আর জলে কোনোরকম সমস্যা নেই তা আমি নজরদারি রেখে নিশ্চিত হয়েছি। অতএব, আমি ভাবতে থাকলাম যে আর কোন উপায়ে এই কাজ করা সম্ভব। কুমার সুভাষ নিশ্চিত করে আমাদের বলে যে তন্ত্রক্রিয়া করার প্রয়োজনে সে বা তার বন্ধুরা কোনোরকম মাদক জাতীয় খাবার বা পানীয় সেই রাতে গ্রহণ করেনি। এবং প্রথমদিকে সব স্বাভাবিক থাকলেও, যতই তাদের উপাচার এগিয়েছে, ততই তাদের মনে ভয় বাড়তে থাকে। তাদের হৃদয়গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের মনে ভয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। আমি ঠিক বলেছি তো কুমার?

শেষ প্রশ্নটা যাকে উদ্দেশ করে করা, একাধারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই কুমার সুভাষ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়। চাণক্য আবার শুরু করলেন,

- এর থেকে অনুমান করা যায় যে মাদক মিশ্রিত জিনিসটা নিঃসন্দেহে সেই রাতে যজ্ঞে আহুতি দেয়া কোনো জিনিসের মধ্যে ছিল। সেটা এমন কোনো জিনিস যা সবাই রোজ ব্যবহার করে এবং সেটা সেই রাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছিল।

আরও একটা বিষয় এখানে আমায় ভাবিত করেছিল। চার ছাত্র একইসঙ্গে সমস্ত কাজ করলেও, তাদের মধ্যে কুমারের ওপর এর প্রভাব পড়েছিল সবথেকে কম। কুমারের বক্তব্য থেকে জানতে পারি তিন জন তার অনেক আগে থেকেই ভীত এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা চিৎকার করার অবস্থাতে পর্যন্ত ছিল না, শুধু কুমার নিজে আর্তনাদ করতে পেরেছিল। প্রশ্ন জাগে যে কুমার সুভাষের মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে যা অন্যদের নেই? কেন তার ওপর এই মাদকের প্রভাব কম?

এর উত্তর কুমার নিজেই আমাদের বলেছিল। আমরা কথায় কথায় জানতে পেরেছিলাম যে কুমারের ধোঁয়া সহ্য হয় না! ধোঁয়া! হ্যাঁ, এটাই উত্তর! এই মাদক সবার শরীরে প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই কারণেই তার ওপর এতদিনেও মাদকের কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ বিদ্যালয় থেকে সকল বাসিন্দাকে যে জিনিস দেওয়া হয়, তা সে নেয়নি। সে তার নিজের সঙ্গে আনা প্রদীপের তেল, ধুনো এবং কর্পূর ব্যবহার করে এসেছে। আর এই তিনটে জিনিসই সেই রাতে অতিরিক্ত মাত্রায় আগুনে আহুতি দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু কোন বস্তু? তেল? না, তেল হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, তেলের সঙ্গে কোনো জিনিস সহজে মিশিয়ে দেয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, তেল তো এত

বছর ধরে কুমার সুভাষও ব্যবহার করে এসেছে। অতএব, তেল হতে পারে না। ধুনো? হতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই সাধারণ পুজোর কাজে ধুনো বেশিমাত্রায় ব্যবহার হয়। এই মাদক এমন কিছুতে মেশানো হয়েছে যা রোজ ব্যবহার হয়, কিন্তু স্বল্প পরিমাণে। অতএব, উত্তরটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। কর্পূর! এই তক্ষশিলায় যা রোজকার ব্যবহারের জিনিস। প্রতিটা বাড়িতে সন্ধ্যা বেলায় কর্পূরের আগুন জ্বালা হয়। এর থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া আক্রান্ত করেছে মানুষদের। কর্পূরে মাদক মেশানোর আরও একটা বড়ো সুবিধা আছে। 'কাৎ' পাতা থেকে নির্মিত মাদকে যদি-বা কোনো গন্ধ থেকে থাকে, তা কর্পূরের সুবাসে ঢেকে যায়। নিখুঁত পরিকল্পনা!

প্রতিটা মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। গুঞ্জন নয়, জোর গলায় লোকেরা নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করছে। আচার্য দধীচ প্রশ্ন করলেন,

- কিন্তু কে? কে এই নীচ ষড়যন্ত্রর কাণ্ডারি? কে এই অপরাধী, আচার্য?

- মাদকের উৎস এবং তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিটা বুঝতে পারলেই, অপরাধী কে চিহ্নিত করা আর কঠিন থাকে না। আচার্য বিন্দাচলের গবেষণার কথা কে জানতে পারে? অবশ্যই সেই ব্যক্তি যে তাঁর সহকারী ছিল এক সময়ে। কর্পূরে মাদক সে-ই মেশাতে পারে যার সে-সুযোগ ছিল। যে নিয়মিত এই প্রাঙ্গণের প্রতিটা বাড়িতে তেল, কর্পূর ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেয়।

উপস্থিত প্রতিটা মানুষের দৃষ্টি একজনের ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। দূরে এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে। প্রধানাচার্যর মুখ থেকে অস্ফুটে নামটা বেরিয়ে এল,

- বাসব!

সে কিন্তু অন্যদের দিকে দেখছে না। সে চেয়ে আছে চাণক্যর দিকে। জীবসিদ্ধির যেন মনে হল তার পোড়া ঠোঁটের কোনায় হাসি খেলছে। এইবার মুখ খুলল বাসব। স্বরে তার কোনোরকম উত্তেজনার চিহ্ন নেই। শীতল কণ্ঠে বলল:

- আমায় আপনার সন্দেহ প্রথম কবে হল, আচার্য?

মৃদু হেসে চাণক্য উত্তর দিলেন,

- অনেক আগেই সন্দেহ হয়েছিল তোমায়, বাসব। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেও একটা ভুল করে ফেলেছিলে। তোমায় যখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে এই প্রাঙ্গণে তুমি কোনো ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছ কি না, তখন তুমি আমায় একটা মনগড়া কাহিনি শুনিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে যে একদিন রাতে জলাশয় থেকে তুমি পিশাচমূর্তিদের উঠে আসতে দেখেছিলে। আর সেটাতেই তোমার মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। কারণ একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, চার

জন ছাত্র বাদে, বাকি সবাই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো দেখেছে নিজেদের বাড়িতে। বন্ধ ঘরে! চার ছাত্রর কথা আলাদা। তারা বেশিমাত্রায় বিষাক্ত কর্পূরের ধোঁয়া, প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করিয়েছিল। কিন্তু তোমার তো সেইরকম কিছু ঘটেনি। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে বলেছিলে খোলা আকাশের নীচে তুমি ভয় পেয়েছ। আমার সেইদিনই সন্দেহ হয় যে তুমি মিথ্যা বলছ।

হেসে উঠল বাসব।

- আপনি সত্যি বুদ্ধিমান, আচার্য। আপনি যেদিন এসেছিলেন সেইদিনই আমি জানতাম যে আপনি আমায় ধরে ফেলবেন।

চাণক্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

- আমার আরও ধারণা, ছাত্রর এই দুর্গতির জন্যেও তুমিই পরোক্ষভাবে দায়ী। তুমি গত অনেক মাস ধরে বাসিন্দাদের শরীরে ধীরে ধীরে বিষাক্ত মাদক প্রবেশ করিয়েছ। ছ-মাস আগে যখন কয়েকজনের মধ্যে তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল তখন তুমি আরও একটা ষড়যন্ত্র করলে। গ্রন্থাগারে তোমার কাজের দায়িত্ব থাকত তা আমরা আগেই শুনেছি। আমার অনুমান, সেই সময়েই তুমি লক্ষ কর যে চার জন ছাত্র বেশ কয়েকদিন ধরে গুপ্তবিদ্যার বই খুঁজছে। তোমার মাথায় কুবুদ্ধি আসে। তুমি একটা অতি সাধারণ তন্ত্র পুথি খুঁজে বের কর। তার সামনের পৃষ্ঠা সরিয়ে ফেলো, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে এই পুথি আসলে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারপর সেটা এমন জায়গায় রেখে দাও যাতে পরের দিন চার জনের মধ্যে কেউ একজন এলেই সেটা খুঁজে পাবে। সামনের পাতায় সেটার নাম বা লেখকের নাম না থাকায়, স্বাভাবিকভাবেই তাদের কিশোর মন সেটাকে প্রাচীন, প্রামাণিক পুথি ধরে নেবে। পরবর্তী ঘটনা একেবারে তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে। তারা সেই বই দেখে একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব তন্ত্রক্রিয়া করতে যায়। অতিমাত্রায় কর্পূর ব্যবহারে তারা ভয় পায়। সবাই ধরে নেয় যে তাদের মনের ভয়ের উৎস এই তন্ত্রক্রিয়ার ফলে মুক্ত হওয়া পৈশাচিক, অলৌকিক শক্তি।

একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন,

- এই ঘটনার আগেই অনেক মাস ধরে তিন জন ছাত্রর শরীরে মাদক ছিল। বহুদিন ধরে রক্তে এই বিষ মিশে যাওয়ার ফলে তাদের শরীর আগে থেকেই দুর্বল ছিল। তাই সেই রাতে অত্যধিক বিষাক্ত ধোঁয়া প্রবেশ করার ফলে তারা উন্মাদ হয়ে যায়। কিন্তু কুমার সারাজীবন কোনো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার করেনি। সেই কারণে তার রক্তে, সেই রাতের আগে অবধি কোনোরকম মাদক ছিল না। তার ওপর শুধুই আহুতি দেয়া অতিরিক্ত কর্পূরের ধোঁয়া প্রভাব ফেলে। সেই কারণেই তার ওপর এর প্রভাব ছিল অনেকটা কম। তাই বাকি তিন ছাত্র, মানসিকভাবে আক্রান্ত হলেও, কুমার সুস্থ হতে পেরেছে।

এরপর যখন জানতে পারলে যে আমরা এখানে আসছি, বিশ্বাসযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তুমি আচার্যপ্রমুখর কাছে আর্জি জানালে যে তোমায় যেন আমাদের সাহায্যের জন্যে নিযুক্ত করা হয়। প্রধানাচার্য তাতে রাজি হলেন। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা। কিন্তু তোমার ওপর আমার সন্দেহ হতেই, আমি তোমায় এড়িয়ে গিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। তুমি যে ভয়ংকর খেলা গত এক বছর ধরে খেলে এসেছ, তা আজকে শেষ হল।

চাণক্য থামতেই সবাই একসঙ্গে বলে উঠল,

- সাধু! সাধু!

দু-জন সৈনিক এসে বাসবকে ধরেছে ইতিমধ্যে। যদিও সে নির্বিকার। প্রধানাচার্য উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে বললেন,

- বিষ্ণুগুপ্ত, তুমি আরও একবার প্রমাণ করলে যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ করলে যে, তোমার সাহায্য চেয়ে আমি ভুল করিনি। তক্ষশিলা তোমার প্রতি আজীবন ঋণী থাকবে।

চাণক্য তাঁকে থামালেন,

- একটু অপেক্ষা করুন, আচার্যশ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ রহস্যর সমাধান এখনও হয়নি। এখনও অনেক বাকি রয়ে গেছে যে।

২৪.

প্রতিটা দৃষ্টি আবার চাণক্যর ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। আরও রহস্য আছে? আর কোন রহস্যর কথা বলছেন আচার্য? অন্যেরা না বুঝলেও জীবসিদ্ধি বুঝতে পেরেছে তার গুরুর কথার তাৎপর্য। এখনও অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর যে তিনি দেননি।

চাণক্য হাত উঠিয়ে সবাইকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে বললেন,

- আমি তক্ষশিলায় এসেছিলাম যে রহস্য সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটার সমাধান আপনাদের বলেছি। কিন্তু এখানে সমান্তরালভাবে একটা নয়, দুটো অপরাধ ঘটে চলছিল গত কয়েক মাসে। সেগুলোর নেপথ্যে থাকা সত্য এখনও আপনাদের জানানো বাকি আছে।

আমি এখানে থাকাকালীন, আয়ুরালয়ে সুনাভ নামে এক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। সেই রাতেই, আমি যখন আয়ুরালয়তে গেছিলাম, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার ঘর থেকে একটা জিনিস চুরি হয়। তদন্তের স্বার্থে আমি গ্রন্থাগার থেকে সেই তন্ত্র বইটা এনেছিলাম, যেটা সেই রাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সত্যি বলতে, এই ঘটনা আমায় সবথেকে বেশি চিন্তিত করে তুলেছিল। কারণ আমি যে তত্ত্ব নিজের মস্তিষ্কে সাজিয়ে

তুলেছিলাম, তার সঙ্গে ছাত্রর হত্যা এবং এই পুথির কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ওই পুথি কিছুটা পড়েই আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে এটা অত্যন্ত সাধারণ আজগুবি প্রক্রিয়া লেখা একটা বই। তন্ত্রক্রিয়ার সঙ্গে আসল সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাহলে আমার কাছ থেকে বই চুরি হবে কেন? কী এমন তথ্য ওই অবাস্তব পুথির পাতায় আছে যা আমার থেকে লুকোতে চাইছে? আর কেনই-বা বাকি তিন ছাত্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চায় অপরাধী?

আমি বাসবকে ষড়যন্ত্রের মূল কুচক্রী হিসেবে চিহ্নিত করার পরেও এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। চার ছাত্রকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার? বই খুঁজতে বাসব নিজেই আমায় সাহায্য করেছিল। তাহলে সে-ই আবার ওটা চুরি কেন করবে? তা ছাড়া কয়েকটা সূত্র থেকে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে আর যাই হোক, আয়ুরালয়ের হত্যাকারী সে হতে পারে না। তাহলে?

হত্যাকাণ্ডর এক দিন পরের রাতে কুমার সুভাষের নিজস্ব ছাত্রাবাসেও আততায়ী হানা দেয়। পরের দিন সেখানে পৌঁছে তার এবং তার দেহরক্ষীর বক্তব্য শুনি। দু-জনেই প্রায় একই কাহিনি শোনায়। কিন্তু দু-জনের বর্ণনায় একটা জায়গায় অসংগতি আমার কাছে ধরা পড়ে। তার দেহরক্ষী বল্লভের বক্তব্য ছিল যে পুষ্করিণীর ধারে গভীর অন্ধকার থাকায় সে আগন্তুকের হাতের অস্ত্র দেখতে পায়নি। আর তার ফলেই তার হাতে আঘাত করতে পেরেছিল আগন্তুক। ঠিক আছে। কথাটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু এর পরেই কুমার বলে, সে নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে পুষ্করিণীর ঘাটে দু-জনকে লড়াই করতে দেখেছে। আমি তার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারি যে পুষ্করিণীর ঘাট বেশ কয়েক গজ দূরে। মেঘলা আকাশ, অন্ধকার রাতে এত দূরের দৃশ্য একমাত্র নিশাচর পাখি বা শ্বাপদ প্রাণী দেখতে পায়। যেখানে তার দেহরক্ষী বল্লভের বক্তব্য যে, সে আঁধারে তার এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিপক্ষর হাতের অস্ত্র দেখতে পায়নি, সেখানে কুমার বলছে যে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে সে দু-জনকে দেখতে পাচ্ছিল। এটা কীভাবে সম্ভব? অতএব, হয় কুমার মিথ্যে বলছে, বা, বল্লভ মিথ্যে বলছে। অথবা দু-জনেই মিথ্যে বলছে!

চাণক্যসহ সবার দৃষ্টি ঘুরে গেছে কুমার সুভাষ ও তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালকায় বল্লভের দিকে। কুমার অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। জীবসিদ্ধির মনে হল সে কাঁপছে। তার দেহরক্ষী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে চোখ কুঁচকে। তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চাণক্য ফের বললেন,

- আমার মনে সন্দেহ হয় যে কুমার আর তার দেহরক্ষী মিলে একটা মনগড়া কাহিনি আমাদের শোনাচ্ছে। সম্ভবত তার দেহরক্ষী বল্লভকে দিয়েই কুমার হত্যা

করিয়েছে তার সহপাঠী সুনাভকে। সেই রাতেই আয়ুরালয়তে পুষ্পলকেও হত্যা করা হত, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে বেঁচে যায়। সুনাভর হত্যার পদ্ধতি থেকেই বোঝা যায়, তাকে যে হত্যা করেছে সেই ব্যক্তি বলিষ্ঠ এবং যুদ্ধকলায় পারদর্শী। কুমার কিছু একটা তথ্য আমাদের থেকে গোপন করতে চাইছে।

কী সেই তথ্য, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। পুরো ঘটনার মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। আমার মন বলছিল যে কিছু একটা সূত্র আমি দেখেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই সূত্রটা হঠাৎই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলাম দু-দিন আগে ভ্রমণে বেরিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত স্মৃতিসৌধ-ক্ষেত্রে গিয়ে আমি বেশ কয়েকটা তুলনামূলক নতুন পাথরের সৌধ দেখতে পাই। তার ভেতর প্রথম ফলকটাতে মনীন্দ্রনাথ নামে এক ছাত্রর নাম দেখি। সেই নামটা পড়েই আমার মনে একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট স্মৃতি জেগে ওঠে। আমার মনে হয় এই নামটা আমি কোথাও যেন শুনেছি। প্রধানাচার্যর কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এই ছাত্রর বিষয়ে। তন্ত্রক্রিয়ার সেই রাতের একমাস আগে, মনীন্দ্রনাথ নামের এই ছাত্র আত্মহত্যা করেছে। স্বভাবতই কেউ তার মৃত্যুর সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার কোনো সম্পর্ক পায়নি। কিন্তু দুটো তথ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই ছাত্রটিও আগে 'ইন্দ্রজাল বিদ্যা' বিভাগের বিদ্যার্থী ছিল দ্বিতীয়ত, তার মৃত্যু ঘটেছে অমাবস্যায়। যে অমাবস্যার রাতে চার জন ইন্দ্রজাল বিদ্যার ছাত্র তন্ত্র হবন করেছিল, তার ঠিক আগের অমাবস্যায়। এই দুটো সূত্র কি শুধুমাত্র সংযোগ বা কাকতালীয়? আমার তা মনে হয়নি।

একটু থেমে বিরতি নিলেন চাণক্য। সকলে নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে। বাতাসে গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার কথা শুরু করলেন,

- এখানে আসার পরে, প্রথমেই আমি তিন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেছিলাম। সেইদিন সুনাভ এবং পুষ্পল কিছুই গুছিয়ে বলে উঠতে পারেনি। শুধু তারা সেই রাতে যে বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে, বা রোজ করছে সেগুলো এলোমেলোভাবে বর্ণনা করেছিল। সুনাভ সেদিন বার বার একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল। মণি! আমি ধরে নিয়েছিলাম সে তার দেখা পিশাচ-মূর্তির লাল চোখের মণি বোঝাতে চাইছে। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম সে-বিষয়ে। সে বোঝানোর চেষ্টাও করেছিল আমায় যে এই 'মণি' চোখের মণি নয়। কিন্তু আমি সেদিন তার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি।

সে বোঝাতে চেয়েছিল যে তাকে ভয় দেখাতে রোজ ভয়াবহ পিশাচদের সঙ্গে, 'মণি' নামের অন্য একজনও আসে। এই 'মণি' যে আসলে 'মনীন্দ্রনাথ'-এর সংক্ষেপিত নাম, তা আশা করি এখন সকলেই অনুমান করতে পারছেন।

এই কারণেই আমার সেইদিন 'মনীন্দ্রনাথ' নামটা স্মৃতিসৌধতে পড়ে মনে হয়েছিল এই নামটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। এইবার তবে ঘটনাটা সাজানো যাক। আমার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণে কোনো জায়গায় ভুল হলে কুমার সুভাষ সংশোধন করে দিতে পারবে আশা করি। কি কুমার? পারবে না?

শেষ প্রশ্নটা করে সুভাষের দিকে চাইলেন চাণক্য। কুমার সুভাষের কিশোর মুখে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। তাতে কোথায় যেন ভয়ও মিশে আছে। তার দিকে তাচ্ছিল্য মেশানো একটা শব্দ ছুড়ে দিয়ে চাণক্য নিজের কথায় ফিরলেন।

- তন্ত্রক্রিয়া। বিশেষ করে পিশাচসিদ্ধি মতে কালো জাদুর একটা প্রধান অঙ্গ হল নরবলি। এই বিশেষ তন্ত্রক্রিয়ারও একটা প্রয়োজন ছিল একজন মানুষের প্রাণ। কিন্তু তাকে বলি হিসেবে উৎসর্গ করতে গেলে, তাকে হত্যা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট দিনে। তন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে যে অমাবস্যার রাতে, তার ঠিক আগের অমাবস্যায় নরহত্যা করার বিধান দেয়া ছিল সেই বইয়ে।

চার জন ছাত্র এই বিষয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে নরহত্যা করতেও তারা পিছপা হল না। শিকার হিসেবে বেছে নেয়, তাদেরই একজন প্রাক্তন সহপাঠীকে। এই তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে সবচেয়ে উৎসাহী ছিল কুমার সুভাষ। অনুমান করতে পারি এই পুরোটাই তার মস্তিষ্কপ্রসূত পরিকল্পনা ছিল। তারা এমন একজনকে নিজেদের বলি হিসেবে বেছে নেয় যার মৃত্যু হলে সকলেই আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করবে। সবাই ধরেই নেবে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হওয়ার শোকে 'মণি' বা মনীন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেছে।

বিশেষ দিনটাতে চার জন মিলে মনীন্দ্রনাথকে পশ্চিমের প্রাঙ্গণের জনশূন্য ভগ্নস্তূপে নিয়ে যায়। সম্ভবত মনীন্দ্রনাথ ভেবেছিল যে বিদ্যালয় ছাড়ার আগে তার পুরোনো সহপাঠীরা তাকে বিদায় জানাতে চায়। সেই হতভাগ্য কল্পনাও করতে পারেনি যে কী ভয়ানক ফাঁদে সে পা দিয়েছিল সেদিন। কুমার এবং তার তিন বন্ধু মিলে তাকে ধাক্কা দিয়ে একটা মিনার থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। চার জনেই এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, কেউই মুখ খুলবে না, সে-বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু সমস্যা হল যখন তিন জন তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। মাদকের প্রভাবে সুনাভ তার সামনে মনীন্দ্রনাথকে দেখতে শুরু করেছিল। মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অপরাধবোধ, তাকে মনীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা দেখাতে থাকল রোজ। এর মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠা কুমার বুঝতে পারল যে প্রলাপের মধ্যে তার বন্ধুরা অপরাধের কথা বলে ফেলতে পারে। কুমারের মনে আশঙ্কা দেখা দিল। অসুস্থতার অজুহাতে কুমার নিজের লোকলশকর ডেকে নিল তক্ষশিলায়। এদের মধ্যে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষী বল্লভকে তার বিপদের কথা বলল।

তার এই অপরাধের কথা যদি প্রকাশ হয়ে যায় তবে তাকে যুবরাজ পদ খোয়াতে হবে। তাই আর কোনো উপায় নেই। মুখ বন্ধ করতে সরিয়ে ফেলতে হবে তার তিন সঙ্গীকে। আমরা এখানে এসে যাওয়ায় কুমারের আশঙ্কা আরও বাড়ল। কুমার সুভাষ জানত যে সেই রাতে ঝড়বৃষ্টিতে অন্যান্য জিনিসের মতোই তন্ত্র বইটাও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এ তথ্য তার অজানা ছিল যে বইটা সেই রাতে উদ্ধার করা হয়েছিল। এরপর যখন বাসবের থেকে জানতে পারল যে আমি সেই তন্ত্র বই খুঁজে পেয়েছি, তখন তার মাথায় বজ্রপাত হল। কারণ সেটা পড়লেই আমি জানতে পেরে যাব যে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গেলে এক অমাবস্যা আগে নরহত্যা করতে হয়।

অতএব, এক রাতে, কুমারের আদেশে বল্লভ হত্যা করল সুনাভকে। সে জানত যে খবরটা পেয়ে আমি নিশ্চয়ই ওই রাতে আয়ুরালয়তে যাব। সেই সুযোগে আমার ঘর থেকে বই চুরি করল কুমার সুভাষ। এই চুরি সে নিজে করেছিল নাকি অন্য কোনো অনুচর দিয়ে করিয়েছিল তা বলতে পারি না। তবে অনুমান করতে পারি সেটাও এই বল্লভই করেছিল। কারণ গোপন কথা বল্লভ ছাড়া আর কাউকে কুমার জানিয়েছিল বলে মনে হয় না। আমার তো এও সন্দেহ যে ছিত্রবানের মৃত্যুও দুর্ঘটনা নয়। সেটাও কুমার সুভাষের সুপরিকল্পিত হত্যা।

উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল কুমার,

- না, না, না! মিথ্যে কথা। ছিত্রবান সত্যিই আত্মহত্যা করেছিল!

শিকার ফাঁদে পা দিলে, শিকারির মুখের ভাবে যেমন সন্তুষ্টি জাগে, সেই সন্তুষ্টির ভাব ফুটে ওঠে চাণক্যর মুখে। বললেন,

- হুম। যাক! অন্য দুটো হত্যার কথা তাহলে সর্বসমক্ষে স্বীকার করলে, কুমার।

২৫.

কুমার সুভাষ হিংস্র দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল চাণক্যর দিকে। পরমুহূর্তে পেছন ঘুরে হাঁটা দিতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে প্রায় দশ জন মৌর্য সৈনিক তাদের পথ আটকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কুমারের দেহরক্ষী বল্লভের ডান হাত তলোয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। চাণক্যর কথায় তা মাঝপথেই আটকে গেল।

- লাভ নেই। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সেরাদেরই বেছে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। অতএব, অসি যুদ্ধে সবাইকে পরাস্ত করতে পারবে না কেউই। শান্তভাবে অস্ত্র সমর্পণ করলেই তোমার মঙ্গল। তক্ষশিলার আসামি তুমি। এখানেই বিচার হবে। তবে দোষ স্বীকার করলে তোমার সাজা যাতে কম হয়, সে-বিষয়ে আমি খেয়াল রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় থাকল বল্লভ। নিজের পরিস্থিতি বিচার করল কয়েক

মুহূর্ত। কোমর থেকে তলোয়ারের বাঁধনটা খুলে সশব্দে সেটা সামনে দাঁড়ানো সৈনিকের দিকে ছুড়ে দিল সে।

চাণক্য বললেন,

- হুম। ঠিক সিদ্ধান্ত। আর কুমার, তোমার অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি। তোমার কুকর্মর কথা বিশদে লিখে একটা চিঠি আমি আজ সকালেই তোমার বাবা, মহারাজ চক্রভামের কাছে দূত মারফত পাঠিয়ে দিয়েছি। তাতে অবিলম্বে তোমায় যুবরাজ পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশও দিয়েছি।

দু-চোখ জ্বলে উঠল কুমারের।

- সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আপনি কে? আপনি এটা করতে পারেন না!

- অবশ্যই পারি। কারণ আমি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য! তোমার বয়স এবং রাজবংশর কথা মাথায় রেখে তোমায় কারাগারে নিক্ষেপ করছি না এটাই যথেষ্ট। তোমায় আজীবন, তোমার প্রদেশে গৃহবন্দি রাখা হবে, কুমার। তোমার বহিষ্কার পত্র আজই প্রধানাচার্যর থেকে পেয়ে যাবে। আর তোমার দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করা হল।

কথা শেষ করে চাণক্য সবার উদ্দেশে বললেন,

- তক্ষশিলা আবার ফিরে যাক তার আগের গরিমাময় দিনে। আতঙ্কর অভিশাপ শেষ হল আজ থেকে। সব বাসিন্দাকে বলছি, আপনারা আজকেই নিজেদের বাড়ির সমস্ত বিষাক্ত কর্পূর মাটিতে পুঁতে ফেলুন। খেয়াল রাখবেন পুরোনো সমস্ত কর্পূর যেন নষ্ট করা হয়। আপনাদের রক্তে বিষাক্ত ধোঁয়া মিশে থাকায় এর প্রভাব আরও কয়েক মাস হয়তো থাকবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সকলে সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। আরও একবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই আচার্য বিন্দাচলের উদ্দেশে শোক জ্ঞাপন করে। তিনি সত্যিই একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন। নিজের আবিষ্কারের অপব্যবহার তিনি মেনে নেননি। আর সেই কারণেই প্রাণ হারিয়েছেন নিজের সহকারী রূপে থাকা হত্যাকারী বাসবের হাতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়তে আমার শেষ কাজ শুধু বাকি আছে। আচার্য বিন্দাচলের মরদেহর অন্তিম সৎকার আমায় করতে হবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। ওম শান্তি। ওম শান্তি। ওম শান্তি।

একে একে প্রত্যেকে বিদায় নিলেন। কুমার সুভাষ মাথা নীচু করে স্থানত্যাগ করল। আর তার দেহরক্ষীকে নিয়ে চার জন সৈনিক অন্যদিকে চলে গেল। বাসবকে দু-দিকে দু-জন সৈনিক ধরে রেখেছে। তাকেও নিয়ে যাচ্ছিল। চাণক্য বাধা দিলেন।

- দাঁড়াও। একে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বাসবের ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে। তাকে যে চাণক্য প্রশ্ন করবেন সেটা যেন তার কাছে প্রত্যাশিতই ছিল। এই মুহূর্তে উপস্থিত শুধু কয়েকজন সৈনিক, তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বাসব, প্রধানাচার্য, জীবসিদ্ধি এবং চাণক্য নিজে। চুলের বাঁধনটা একবার ঠিক করে বেঁধে নিয়ে চাণক্য এগিয়ে গেলেন বাসবের দিকে। মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন বাসবের। চাণক্যর চোখে চোখ রেখে বাসব শান্ত কণ্ঠে বলল,

- আপনার বুদ্ধির আরও একবার প্রশংসা না করে পারছি না, আচার্য। আমি কিন্তু সত্যি এতটা ভেবে পাইনি। সুনাভর হত্যাটা আমাকেও ভাবিত করেছিল। বইটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম একটা সাধারণ দোকানে। পুরোটা পড়ে দেখিনি। আমি শুধু মূল উপকরণগুলো দেখেছিলাম আর তাতেই বুঝেছিলাম যে এতে যথেষ্ট মাত্রায় কর্পূর ব্যবহার হবে। তাই ওটা উঠিয়ে এনেছিলাম। ওটাতে যে কোনো মানুষের প্রাণ উৎসর্গ করার উল্লেখ আছে তা জানতাম না আমিও। ধন্য আপনি।

চাণক্য কথাগুলো শুনলেন বলে মনে হল না। বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়ালেন। বললেন,

- যেকোনো রহস্যর সম্পূর্ণ সমাধান করতে হলে তিনটে প্রশ্নর উত্তর অনুধাবন করার প্রয়োজন পড়ে। কে? কীভাবে? এবং কেন? আমার কাছে প্রথম দুটোর উত্তর থাকলেও, শেষ প্রশ্নের উত্তর নেই। আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে এই পুরো ষড়যন্ত্র তুমি কেন রচনা করলে? দু-বছরেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করে এই কাজ করার উদ্দেশ্য কী তোমার? কী লাভ হত তোমার সবাইকে ভয় দেখিয়ে?

উত্তর না দিয়ে উন্মাদের মতো অট্টহাস্য করল বাসব। চাণক্য আবার প্রশ্ন করলেন,

- যদি এই কাজ কারুর নির্দেশে করে থাকো, তবে কে সে? চুপ করে থেকো না। উত্তর দাও!

হাসি থামিয়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে বাসব বলল:

- সেকী! বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, স্বয়ং কৌটিল্য বুঝতে পারছে না আমার উদ্দেশ্য? হা হা হা হা! তবে শুনে রাখুন, আচার্য। আপনি হেরে যাবেন। আপনি হেরে গেছেন।

একজন সৈনিক বাসবের দিকে এগিয়ে আসছিল তাকে প্রহার করতে। চাণক্য হাত তুলে বাধা দিলেন। আবার শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,

- কী বলতে চাইছ তুমি, বাসব?

ধক করে জ্বলে উঠল বাসবের চোখের তারা।

- চিনতে পারছেন না, আচার্য? চিনতে পারছেন না আমায়? অবশ্য

আপনারই-বা দোষ কী? মুখ তো আগুনে পুড়ে আর চেনার যোগ্য নেই। আর গলার স্বর বয়ঃসন্ধিতে পালটে গেছে। দাঁড়ান, একটা জিনিস দেখাই। এটা দেখলে আমায় নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

পরনের ধুতির কোমরের কাছ থেকে একটা ধাতব গোলাকার জিনিস বের করে আনল বাসব। চাণক্যর সামনে সেটা তুলে ধরে বাসব বলল:

- দেখুন তো, গুরুদেব। চিনতে পারেন কি না।

সেটা দেখেই চাণক্য চমকে উঠলেন। জীবসিদ্ধিও কম চমকিত হয়নি। কারণ জিনিসটা তার পরিচিত। বিশেষ ধরনের একটা লোহার হাত-বালা। এটার ঠিক সমরূপ একটা বালা আছে জীবসিদ্ধির নিজের ডান হাতের কবজিতে। এই বালা আছে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর হাতে এবং তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের হাতে। এই বালা চাণক্যর ছ-জন প্রিয় ছাত্রর প্রত্যেকের কাছে একটা করে আছে।

অস্ফুটভাবে চাণক্য উচ্চারণ করলেন একটা নাম,

- ইন্দ্রজিৎ!

২৬.

প্রধানাচার্য এবং জীবসিদ্ধি অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন চাণক্যর দিকে। অবাক হয়েছে উপস্থিত সৈনিকরাও। তবে সবচেয়ে বেশি যিনি হতবাক হয়েছেন, তিনি আচার্য চাণক্য স্বয়ং। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি বাসবের বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে আছেন। একসঙ্গে অনেকগুলো স্মৃতি ভিড় করে আসছে ওঁর মনে। বাসবের চামড়া কুঁচকে যাওয়া মুখটা আক্রোশের অভিব্যক্তিতে আরও বীভৎস মনে হল জীবসিদ্ধির। তার মনেও প্রচুর প্রশ্ন ভিড় করছে। কে এই ব্যক্তি?? আচার্যর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? সবথেকে বড়ো কথা, এই বালা তার কাছে কীভাবে এল? এই বালা চাণক্য শুধুমাত্র তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছ-জন ছাত্রকে দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞান স্বরূপ। তবে? সেটা এই শয়তানটার কাছে কী করছে?

বাসব দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

- যাক! চিনতে পেরেছেন তবে, গুরুদেব। আমি তো ভাবলাম নিজের প্রথম শিষ্যকে ভুলেই গেছেন। ভুলেই গেছেন সেই কিশোরকে, যাকে আপনি সারা আর্যাবর্তের সম্রাট হওয়ার মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আমায় এই তক্ষশিলায় নিয়ে এসে শিক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর তারপর নিজের কার্যসিদ্ধি হয়ে যেতেই যাকে অবাঞ্ছিতর মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ। আমিই ইন্দ্রজিৎ!

নিজেকে সামলে নিতে চাণক্যর কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। চোখের তারা থেকে বিহ্বল ভাব কেটে গিয়ে তাতে আবার তার সাধারণ শান্তভাব ফিরে এল। বললেন,

- হুম। আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। বাসবজিৎ হল মেঘনাদ ইন্দ্রজিতেরই অন্য নাম। এত ষড়যন্ত্রর নেপথ্যে তোমার তবে উদ্দেশ্য ছিল আমায় এখানে এনে বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত করা। আর শুধুমাত্র আমার ওপর নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তুমি হত্যা পর্যন্ত করলে। তুমি সেই মানুষটাকে হত্যা করেছ যে বিশ্বাস করে তোমায় এখানে কাজ দিয়েছিল। আচার্য বিন্দাচল তোমায় বিশ্বাস করেছিল! ধিক্কার তোমায়, ইন্দ্রজিৎ। ধিক্কার আমায়, যে, একসময় তোমায় নিজের শিষ্য বানানোর মতো ভুল করেছিলাম।

আবার জ্বলে উঠল বাসবের দৃষ্টি,

- আপনি! হ্যাঁ, আপনি আমার জীবন ধ্বংস করেছেন। আমি এই দেশের সম্রাট হতে পারতাম। আপনি জানতেন আমার মধ্যে সেই শৌর্য, সাহস আর বুদ্ধি ছিল। কিন্তু আপনি আত্ম অহংকারের কারণে আমায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যোগ্য ছিলাম আমি! যোগ্য ছিলাম আমি সম্রাট হওয়ার! আমার জায়গায় আপনি এক হীনকুলকে সিংহাসন দিলেন।

কঠোর হয়ে উঠল চাণক্যর কণ্ঠ,

- মহাকাল প্রমাণ করেছে যে আমি ঠিক বিচার করেছিলাম। নিজের হীন কৃতকার্যর দ্বারা তুমি প্রমাণ করেছ যে তুমি কোনোকালেই যোগ্য ছিলে না। শুনে রাখো, ইন্দ্রজিৎ! শুনে রাখো চাণক পুত্র চাণক্যর কথা! তুমি অযোগ্য ছিলে সেদিনও এবং আজও তাই আছ।

সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন,

- বন্দি করো একে। আজই বন্দিকে সঙ্গে নিয়ে চার জন সৈনিক রওনা হয়ে যাও মগধের উদ্দেশে। পাটলিপুত্রর কারাগারে একে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সৈনিকরা টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে বাসব চিৎকার করতে থাকল,

- নিপাত যাবে তোমার রাষ্ট্র! ধ্বংস হবে মগধ। হা হা হা হা হা! তোমার সর্বনাশের পালা শুরু হয়ে গেছে, বিষ্ণুগুপ্ত। তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমায় পরাস্ত করলেই সব শেষ, তুমি ভুল ভাবছ। ভুল ভাবছ তুমি!! হা হা হা! ধ্বংস হোক তোমার সাজানো এই স্বপ্ন!

ভুরু কুঁচকে চাণক্য অন্যদিকে চেয়ে থাকলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে, বুকের ওপর থাকা নিজের লম্বা টিকির চুলে হাত বোলালেন কয়েক বার। চিন্তা ভঙ্গ হতেই, করজোড়ে প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টকে প্রণাম জানিয়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে অতিথি-নিবাসের দিকে পা চালালেন। জীবসিদ্ধিও গুরুর দেখাদেখি, বৃদ্ধকে বিদায় জানিয়ে, পিছু নিল চাণক্যর। তার মনে এখন বহু প্রশ্ন ঘুরছে। একটা ব্যাপার সে অনুমান করতে পারছে যে বাসব ছদ্মনামের মানুষটা, তাদের সকলের আগে, চাণক্যর শিষ্য ছিল কোনো এক সময়ে। কিন্তু এর উল্লেখ কখনো চাণক্যর মুখে

সে শোনেনি। তার বাকি গুরুভাইরা, এমনকী চন্দ্রগুপ্তও এর বিষয়ে সম্ভবত অবগত নয়। আশ্চর্য মানুষ তার আচার্য! আরও কত গোপন রহস্য যে ওঁর মনে আছে, তার অনুমানও জীবসিদ্ধি কোনোদিন করতে পারবে না।

অতিথি-নিবাস পৌঁছে চাণক্য নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। তার আগে শুধু একটা কথাই বললেন,

- জীবসিদ্ধি, আচার্য বিন্দাচলের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করো। আজকের মধ্যে এই কাজটা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। অনেক অপেক্ষা করেছেন তিনি।

- বেশ, আচার্য।

তৃতীয় প্রহর নাগাদ সব ব্যবস্থা করে জীবসিদ্ধি ডেকে নিয়ে গেল চাণক্যকে। প্রধানাচার্য সহ প্রত্যেক আচার্যর উপস্থিতিতে, চাণক্য নিজে আচার্য বিন্দাচলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। সব কাজ শেষ করে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি অতিথি-নিবাসের পথ ধরলেন। নিবাসের কয়েক পা দূরে ওঁরা লক্ষ করলেন যে দু-জন সৈনিক তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে একজন সৈনিক উদগ্রীব হয়ে বলল:

- আচার্য, আমায় ক্ষমা করুন। দুঃসংবাদ আছে।

- কী দুঃসংবাদ, বীর?

- আচার্য। বাসবজিৎ নামে লোকটার মৃত্যু হয়েছে। তাকে হত্যা করেছে আততায়ী!

- কী? এর অর্থ কী, সৈনিক? কে হত্যা করল তাকে?

- ক্ষমা করুন, আচার্য। আমরা জানি না। বন্দিকে আমরা সঙ্গে নিয়ে সবে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তুলতে উদ্যত হয়েছিলাম। ঠিক সেইসময়ে আচমকা ধনুর্ধারী একজন ঘোড়সওয়ার চলে আসে দ্রুতবেগে। সম্ভবত আমাদেরই অপেক্ষায় ছিল। দ্রুতগতিতে চলমান ঘোড়ার পিঠ থেকেই লোকটা একটা তির ছোড়ে। আমরা সতর্ক হওয়ার আগেই সেটা বন্দিকে বিদ্ধ করে। ঘটনাটা এতটাই আকস্মিক ছিল যে আমরা কিছু করার আগেই সব কিছু ঘটে যায়। পিছু নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা, কিন্তু বিফল হয়েছি। ঘোড়া মাঝপথে ফেলে হত্যাকারী লোকালয়ে মিশে গেছে। মুখ ঢাকা থাকায় তাকে চিহ্নিত করারও কোনো উপায় ছিল না।

- তোমরা চার জন সৈনিক থাকতে এ কীভাবে হয়? কীভাবে এই ভুল ঘটতে দিলে তোমরা?

মাথা নীচু করে দু-জনে বলল:

- ক্ষমা করবেন, আচার্য।

চোখ বুজে নিজের টিকিতে একবার হাত চালিয়ে শান্ত হলেন চাণক্য। চোখ খুলে বললেন,

- আমায় মৃতদেহর কাছে নিয়ে চলো।

মাটিতে শুয়ে আছে বাসবজিতের মৃতদেহ। হাত দুটো বুকের ওপর রাখা। ডান চোখের কোটরে একটা তির বিদ্ধ হয়ে আছে। এখনও রক্তপাত হয়ে চলেছে চোখ থেকে। মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে।

মৃতদেহর ওপর ঝুঁকে পড়লেন চাণক্য। তিরটার ওপর আঙুল বোলালেন বার কয়েক। জীবসিদ্ধি লক্ষ করল, আচার্যর কপালে ভ্রূকুটি। জীবসিদ্ধির নিজেরও সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বাসবকে কে হত্যা করল? মূল অপরাধী তো বাসব নিজেই। তবে তাকে আবার হত্যা করল কে?

চাণক্য ডাকলেন,

- জীবসিদ্ধি।

- হ্যাঁ, আচার্য।

- তিরটা লক্ষ করো।

চাণক্যর পাশেই বসে ঝুঁকে পড়ল জীবসিদ্ধি। হাত দিয়ে পরীক্ষা করল তিরটা। তার কপালেও চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

- কিছু মনে পড়ছে?

- হ্যাঁ। কয়েক মাস আগে এই একই ধরনের তির আমি দেখেছি।

- হুম। আমি তবে ভুল করিনি। আমিও চিনতে পেরেছি এই তির দেখেই। কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ আশা করি?

গম্ভীর গলায় উত্তর দিল জীবসিদ্ধি,

- হ্যাঁ। আমাদের কয়েকজন সৈনিককে এই বিষাক্ত তির দিয়েই হত্যা করা হয়েছিল সেইবার। রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলা ঘোড়ার গাড়িতে একদল দস্যু হামলা করেছিল। সোনা ভরা একটা সিন্দুক তারা লুঠ করে। সেইবার মৃত সৈনিকদের শরীরে এই একই তির দেখেছিলাম।

- হুমম। ঠিক বলেছ। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই একই তির, তক্ষশিলায় কী করছে?

২৭.

চিন্তিতভাবে কাঠের চারপায়া আসনে বসে আছেন চাণক্য। স্থিরদৃষ্টিতে সামনে রাখা প্রদীপের শিখার দিকে চেয়ে আছেন। সেটার প্রতিফলন ওঁর চোখের তারায় পড়ছে। তার সামনেই মেঝের আসনে শুয়ে আছে জীবসিদ্ধি। জীবসিদ্ধি লক্ষ করছে যে বহুক্ষণ হল আচার্যর চোখের পাতা পড়েনি। ঘরে ফিরে আসার পর থেকেই এরকমভাবে বসে আছেন চাণক্য।

চিন্তিত জীবসিদ্ধি নিজেও। যখন তার মনে হয়েছে সব রহস্যর সমাধান হয়েছে, তখনই আবার একটা নতুন রহস্য তাদের সামনে চলে এসেছে। সৈনিকদের থেকে জানা গেছে যে তিরটা বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মৃত্যু হয়েছে বাসবজিতের। চোখে তির লাগলে তক্ষুনি মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। অতএব, তিরের ফলায় নিঃসন্দেহে বিষ ছিল। ঠিক যেমন মগধের সৈনিকদের বিষাক্ত তির দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই একই ধরনের তির। কিন্তু বাসবকে হত্যা করা হল কেন? কেই-বা হত্যা করল তাকে?

- ওহে, জীবসিদ্ধি।

চিন্তায় ছেদ পড়ল। উঠে বসল জীবসিদ্ধি।

- বলুন, আচার্য।

- পাটলিপুত্র থেকে আসা চিঠিগুলো তোমার কাছে আছে না?

- হ্যাঁ। আমার ঘরে। নিয়ে আসব?

- হুম। সবকটা চিঠি একবার আমায় এনে দাও। দুশ্চিন্তা হচ্ছে, জীবসিদ্ধি। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

জীবসিদ্ধি উঠে গেল নিজের ঘরে। খানিকক্ষণ বাদেই চিঠিগুলো নিয়ে ফিরে এল। চাণক্য এক-একটা চিঠি খুলে, তারিখ অনুযায়ী কোলের ওপর সাজালেন। পাশে দাঁড়িয়ে জীবসিদ্ধি তার গুরুর কার্যকলাপ লক্ষ করছে। চাণক্য চিঠিগুলো আবার পড়তে শুরু করলেন। প্রথমবার পড়া শেষ করে আবার পড়লেন। অন্যমনস্কভাবে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রদীপের শিখার দিকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

- সর্বনাশ হতে চলেছে। অথবা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সব আমার ভুল। দৃষ্টির সামনে থাকা সত্ত্বেও আমি মূল সমস্যাটা দেখতে পাইনি।

জীবসিদ্ধি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,

- এইসব কী বলছেন, গুরুদেব? কার সর্বনাশ হতে চলেছে?

- দেশের!

- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আচার্য।

পায়চারি করতে শুরু করেছেন চাণক্য। দু-হাত পেছনে দিয়ে ঘরময় হেঁটে চলেছেন। নিজের মনেই কিছু কথা বলে চলেছেন। কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা কানে এল জীবসিদ্ধির।

- ফিরতে হবে... নজর রাখছে... কে হতে পারে... হ্যাঁ... নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই... আমি নিশ্চিত... খবর পাঠাতে হবে... এক্ষুনি।

হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন চাণক্য। জীবসিদ্ধির দিকে ফিরে বললেন,

- জীবসিদ্ধি, কালকে সকালে পাখিশালায় যাবে। সেখানকার পাখি

প্রশিক্ষকের থেকে তার সবচেয়ে দ্রুতগামী তিনটে পায়রা চাইবে। আমার দেয়া চিঠিটা প্রথমটার গলায় বেঁধে নিজে উড়িয়ে দেবে পাটলিপুত্রের উদ্দেশে। এরপর তুমি ফিরে আসবে। তুমি ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর যেন প্রশিক্ষক দ্বিতীয় পায়রাটা উড়িয়ে দেয়। আরও কিছুক্ষণ পর, তৃতীয়টা।

- সে করব। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাখির গলায় কোন চিঠি থাকবে?

- প্রথম চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকবে না। আমার আসল নির্দেশ থাকবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চিঠিতে। আমার চিঠি চন্দ্রগুপ্তর হাত অবধি পৌঁছোনোটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সম্ভাবনা আছে যে তোমায় চিঠি পাঠাতে দেখে সেই চিঠি মাঝপথেই আটকে দেয়ার চেষ্টা হতে পারে। পায়রাটাকে তির মেরে মাটিতে এনে ফেলতে পারে আমাদের শত্রুরা। সেই কারণেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পায়রার ব্যবস্থা করতে বললাম।

অবাক হয়েছে জীবসিদ্ধি। প্রশ্ন করল,

- এইসব ব্যবস্থা তো যুদ্ধ চলাকালীন ব্যবহার হয়, আচার্য। এখন এই অতিরিক্ত সাবধানতার কারণ কী?

- সাবধানতা কখনো অতিরিক্ত হয় না, জীবসিদ্ধি। আর যুদ্ধর কথা বলছ? তবে শুনে রাখো, মগধের ওপর হামলা করা হয়েছে! দু-মাস আগেই মগধের ওপর হামলা করেছে তার সবথেকে বড়ো শত্রু।

- কী বলছেন আপনি, আচার্য? সম্রাট তো আমাদের কিছুই বলেননি! যুদ্ধর সম্ভাবনা থাকলে কি আমরা জানতাম না সেটা?

চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবলেন আচার্য। একটা বড়ো ভূর্জপত্র তুলে তাকে তিনটে ছোটো টুকরো করলেন। দোয়াত থেকে কলম তুলে প্রথমটাতে লিখলেন,

'এখানে সব কুশল মিটেছে। কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে মগধের উদ্দেশে রওনা হব।'

এরপর পরের দুটো ভূর্জপত্রতে লিখলেন,

'এই মুহূর্ত থেকে, রাজকোষ থেকে সমস্ত বড়ো অঙ্কের আর্থিক লেনদেন স্থগিত করা হোক। শীঘ্রই ফিরছি।'

নীচে নিজের অঙ্গুরিমুদ্রা দিয়ে সিলমোহর দিলেন। তিনটে ভূর্জপত্র ভাঁজ করে ছোটো করে সেগুলো জীবসিদ্ধির হাতে দিলেন। বললেন,

- মন দিয়ে শোনো। আমাদের হাতে সময় নেই। আজ রাতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও। কারণ কাল তুমি এই চিঠি পাঠিয়ে ফিরে এলেই আমরা তক্ষশিলা ত্যাগ করব।

- বেশ। সৈনিকদের তাহলে আজকেই সেই খবর দেয়া প্রয়োজন।

- না! একদম না। আমাদের তক্ষশিলা ত্যাগ করতে হবে গোপনে। প্রধানাচার্য ছাড়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের গুরুকুল ত্যাগ করার খবর যেন জানতে না পারে। সৈনিকদেরও জানানো যাবে না। তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে গেলে সবার

নজরে আসবেই। খবর গোপন থাকবে না। আমি শুধু প্রধানাচার্যকে বলে দেব, তিনি যেন সবাইকে জানিয়ে দেন যে, আমরা আরও কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর রওনা হব। কিন্তু বাস্তবে আমরা কালকেই দক্ষিণ দরজা দিয়ে দু-জনে মগধের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দেব। আশা করি প্রধান ফটক বাদে অন্য দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলে গুপ্তচরের নজর এড়ানো সম্ভব হবে।

- গুপ্তচর?

- অবশ্যই! তা না হলে ইন্দ্রজিৎকে আমরা বন্দি করার পর পরই তাকে হত্যা করা হয় কীভাবে? নিশ্চয়ই আমাদের ওপর কেউ-বা কারা নজর রেখে চলছিল।

- বেশ। কিন্তু আচার্য, আপনি বলছেন যে মগধের ওপর শত্রুর আক্রমণ হয়েছে। এটা আমি বুঝলাম না।

- সব যুদ্ধই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়া হয় না, জীবসিদ্ধি। সব হামলা শুধু সীমান্তে করা হয় না। কাল সব বুঝিয়ে বলব। বিশ্রাম নাও আজ। কাল থেকে আমাদের দু-জনের সুদীর্ঘ পথযাত্রা শুরু হবে।

২৮.

গান্ধারের সীমান্তে একটা গ্রামে আজকে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। ব্রাহ্মণদের জন্যে যেকোনো গৃহস্থ বাড়িতেই আশ্রয় পাওয়ার কোনো সমস্যা হয় না। এখানেও এই গরিব পরিবারটা আপ্যায়ন করে তাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেছেন। যৎসামান্য আয়োজন সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ দু-জনকে খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব পরিকল্পনা মতোই আজ সকালে, পাখির মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েই দু-জনে দক্ষিণ ফটক দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন। সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে দু-জনেই ক্লান্ত। সারাদিনের মধ্যে শুধু একবার তারা ঘোড়া থামিয়েছে। ঘোড়া দুটোকে হ্রদের জল পান করিয়ে বিশ্রাম দিতে। সূর্যাস্তের পরে তারা আশ্রয় নিয়েছে একটা গ্রামে। কাল সকালে এখান থেকেই আগামী কয়েক দিনের মতো খাবার সংগ্রহ করে আবার রওনা হতে হবে। বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। তাই জীবসিদ্ধির প্রবল ইচ্ছে থাকলেও সে এই মুহূর্তে প্রশ্ন করতে পারছে না চাণক্যকে।

চাণক্য চোখ বুজে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু জীবসিদ্ধির চোখে ঘুম নেই। চাণক্যের পাশেই, মেঝের ওপর সেও শুয়ে। চোখ বোজা অবস্থাতেই চাণক্য বললেন,

- কৌতূহল না মেটা অবধি কি ঘুমও আসে না তোমার, জীবসিদ্ধি?

হেসে উঠল জীবসিদ্ধি। বলল:

- সেটাই কি স্বাভাবিক নয়, আচার্য? গতকাল থেকেই আমি মনে অনেকগুলো প্রশ্ন চেপে রেখেছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাণক্য বললেন,

- কী জানতে চাও বলে ফেলো।

- সব কিছু! তবে আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে থাকলে আজ থাক।

এইবার চোখ খুলে তার দিকে তাকালেন চাণক্য,

- হুম। অবশ্যই আমি পরিশ্রান্ত। কিন্তু পাশে তুমি যতক্ষণ জেগে বসে থাকবে ততক্ষণ আমার ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটবে। অতএব, তোমায় কিছু উত্তর আমায় দিতেই হবে মনে হচ্ছে।

মুচকি হেসে ফেলল জীবসিদ্ধি। চাণক্য এক হাতে মাথা ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন,

- কোথা থেকে শুরু করব?

- বাসবজিৎ।

- হুম।

আবার নিজের জায়গায় সোজা হয়ে শুয়ে কথা শুরু করলেন চাণক্য।

কয়েক বছর আগের কথা। ম্যাসিডোনিয়ার যবন সম্রাট সিকন্দর* তার বিশ্বজয় যাত্রা শুরু করেছে। একের পর এক দেশকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, দেশের সমস্ত রাজ্যের শাসকদের এক করার উদ্দেশ্যে আমি গেলাম মগধে। সুরা এবং আমোদে ডুবে থাকা সম্রাট ধনানন্দ আমায় অপমান করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেয়। আমি সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করি যে আমি এই দুরাচারীকে উৎখাত করবই। এর জায়গায় আমি যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাব। এবং যতদিন না তা করতে সক্ষম হচ্ছি ততদিন নিজের টিকি খোলা রাখব।

এই ঘটনা তোমাদের সবারই জানা। কিন্তু এর পরের ঘটনা তোমরা কেউই জানো না। মগধ থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখন আমার মনে ঝড় চলছে। দেশের সবথেকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো সহজ নয়। এরজন্যে প্রয়োজন বিশাল সৈন্যবল এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ। আর সবথেকে আগে প্রয়োজন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যে ভবিষ্যতে সম্রাট হবে। আমি সেই সময়ে শুধুই রাজ্যের পর রাজ্য আর প্রতিটা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, পথে দেখা প্রতিটা মানুষের মধ্যে খুঁজে চলেছিলাম সেই রকম কারুকে।

চেদি রাজ্যে শুনতে পেলাম সেখানকার রাজা বীর যোদ্ধাদের মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। আমি উৎসাহ নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলাম। মনে আশা ছিল যে হয়তো এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া বীর যোদ্ধাই আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হবে। যুদ্ধ শুরু হল। ছ-জন যোদ্ধার যুদ্ধের কলা

দেখেই আমি অনুমান করতে পারছিলাম কে জিততে চলেছে। সেখানেই দর্শকদের মধ্যে, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে খেলা দেখা একদল উৎসাহী বালকের কথাবার্তা আমার কানে এল।

- এই তৃতীয় যোদ্ধা জিতবে নিঃসন্দেহে।

- হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। দেখো না, কেমন শক্তিশালী বাহু তার।

- না, না। আমার তো মনে হয় প্রথম যোদ্ধা জিতবে। কারণ ওর হাতে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র আছে। আর বর্মটাও খুব মজবুত।

- না। পঞ্চম প্রতিযোগী জিতবে।

শেষের জনের কথাটা আমার কানে যেতেই আমি বক্তার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। তার কারণ হল, আমার নিজেরও অভিমত যে পঞ্চম যোদ্ধাই জিততে চলেছে। কৌতূহলী হয়ে দেখলাম সেদিকে। দেখলাম একজন বালক কথাটা বলছে। সম্ভবত উপস্থিত বালকদের দলপতি। কারণ তার কথা সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনছে,

- অস্ত্র, কবচ আর বল দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। জিততে গেলে প্রয়োজন বুদ্ধি। আর এই পঞ্চম প্রতিযোগীর যুদ্ধকৌশল দেখেই বোঝা যায় যে সে বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করছে।

অবিকল নিজের চিন্তা অন্যের মুখে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার মনে হল যে হয়তো এই বালকই, হ্যাঁ, এই বালকই হতে পারে আর্যাবর্তের ভাবী সম্রাট। এই বালকই ছিল ইন্দ্রজিৎ।

আমি তার সঙ্গে পরিচিত হই। তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাকে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলি। তার বাবা-মা দু-জনই মৃত ছিল। অতএব কোনো পিছুটান ছাড়াই সে আমার সঙ্গে আসে। পরবর্তী সময়ে তাকে আমি বিবিধ পরীক্ষার সামনে ফেলি। তার সাহস এবং মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা দেখে আমিও মুগ্ধ হই। তাকে আমি নিজের স্বপ্নের পরিকল্পনা বলি। তাকে জানাই যে আমি তাকে তক্ষশিলায় শিক্ষা দেব, মগধের পরবর্তী সম্রাট করব। কিন্তু সেই সময়ে আমি প্রতিশোধের আগুনে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলাম আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। তাই নিজের বিচারে ভুল করে ফেলি। আমি ইন্দ্রজিতের স্বরূপ দেখতে পাইনি।

তাকে নিয়ে আমি আশাবাদী হয়ে পড়েছিলাম। তাকে নিজের বিশেষ হাত-বালাও দিই। কিন্তু একজন সম্রাট হতে গেলে শুধু বল, বুদ্ধি আর সাহসই পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজন নৈতিক দৃঢ়তা। উপযুক্ত সম্রাট সে-ই, যে অন্যের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে। সাধারণ মানুষের কষ্টে তারও প্রাণ কাঁদবে। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আমি বুঝতে পারি যে ইন্দ্রজিতের মধ্যে সেই গুণ নেই। তার চোখে আমি ক্ষমতার লোভ এবং শঠতার কালো ছায়া দেখতে পাই। আমি

বুঝতে পারি যে আমি ভুল করেছি। ভাবী সম্রাটকে খুঁজে পেতে, অধৈর্য হয়ে আমি অত্যধিক তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। ইন্দ্রজিৎ আমার দেখানো স্বপ্নে, আমার চেয়েও বেশি বিভোর হয়ে পড়েছে। সে এখনই নিজেকে সম্রাট ভাবতে শুরু করেছে। অতএব, আমি তাকে ত্যাগ করি।

স্বাভাবিকভাবেই সে বিষয়টা সহজে মেনে নিতে পারেনি। আমায় বার বার বলতে থাকে যে আমি ভুল করছি, সে-ই যোগ্য সম্রাট। কিন্তু আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকি। আমি সেই সময়ে অবন্তি রাজ্যে। ইন্দ্রকে চেদি ফিরে যেতে বলি। কিন্তু সে শোনে না আমার কথা। একদিন রাতে আমি তাকে ঘুমের মধ্যেই ত্যাগ করি। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বেরোনোর সময়ে শুনতে পাই, যে গ্রামে আমরা রাতে ছিলাম, সেখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে শেষরাতের দিকে। বহু গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে। আমি চিন্তিত হয়ে ফিরে যাই ইন্দ্রজিতের খোঁজে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাইনি। আমি ধরে নিই যে সেও হয়তো হতভাগ্য গ্রামবাসীদের মতোই আগুনে পুড়ে প্রাণ দিয়েছে।

চুপ করলেন চাণক্য। তাঁর ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি দেখে অনুমান করা যায় যে তিনি অতীতের স্মৃতিতে হারিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ডুবে থাকলেন নিজের চিন্তায়। তারপর আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। বললেন,

- গতকালই জানতে পারলাম যে তার মৃত্যু হয়নি। সম্ভবত সেই রাতেই আগুনে তার মুখ পুড়ে গেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা পুড়ে গেছিল সেটা হল তার হৃদয়। প্রতিহিংসার আগুন সবচেয়ে বেশি দগ্ধ করে মানুষকে। আমাকে ইন্দ্রজিৎ তার নিজের স্বপ্নভঙ্গের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এত বছর অপেক্ষায় থেকেছে প্রতিহিংসার।

জীবসিদ্ধি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এইবার প্রশ্ন করল,

- এই ঘটনা আমাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কত বছর আগের?

- দু-বছর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি উপলব্ধি করতে পারি যে এই জগতে কোনো পরিবর্তনই বাইরে থেকে আনা সম্ভব নয়। পরিবর্তন আসে ভেতর থেকেই। মগধের ভাবী সম্রাট, যে মানুষের দুরবস্থার পরিবর্তন আনবে, তাকে মগধেরই কেউ হতে হবে। যে নন্দদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছে, সে-ই প্রথম প্রতিবাদ করতে পারে। আর তাকেই তার নিজের মাতৃভূমির মানুষ অনুসরণ করবে। অতএব, এর দু-বছর পর আমি মগধেই খুঁজে পাই আমার ভাবী সম্রাটকে। মুরা পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে। তাকে নিয়ে আসি তক্ষশিলায়। সেখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

কিছুক্ষণ দু-জনই কোনো কথা বলল না। চাণক্য বললেন,

- অনেক রাত হল। আজকের মতো এখানেই ইতি দাও। সামনে দীর্ঘ

পথ। অনেক সময় আছে বাকি কথা বলার। আজ বিশ্রাম নাও, জীবসিদ্ধি। শুভরাত্রি।

ফুঁ দিয়ে মাথার ওপরের দিকে রাখা প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন চাণক্য।

**সিকন্দর- আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।*

২৯.

বেশ কয়েক দিনের যাত্রার পর মগধের সীমান্ত প্রদেশে এসে পৌঁছেছেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। সব কুশল থাকলে এবং আগামীকাল সূর্যোদয়ের সময়ে যাত্রা শুরু করতে পারলে, সূর্যাস্তর সময়েই পাটলিপুত্র পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। এই গ্রামের এক চাষির বাড়িতে, একটা রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন দু-জনে। মাঝের কয়েকটা রাত হয় খোলা আকাশের নীচে, অথবা কোনো গৃহস্থ বাড়িতে কাটাতে হয়েছে তাদের। তবে চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি, দু-জনেরই অতীতে এভাবে রাত কাটানোর অভ্যাস আছে।

আজ বহুদিন পর জীবসিদ্ধি আবার প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছে। এই কয়েকটা রাতে হয় গোপন কথা আলোচনা করার পরিস্থিতি ছিল না, অথবা ক্লান্ত থাকায় তা আর করা হয়নি।

- আচার্য?

পদ্মাসনের ধ্যান মুদ্রায় বসে আছেন চাণক্য। চোখ না খুলেই সাড়া দিলেন,

- হুম।

- আমি আজ এখানে এসেই প্রথমে গ্রামের কিছু মানুষের কাছে খোঁজ নিয়েছি যে মগধে বা পাটলিপুত্রতে কোনো বিপদ ঘটেছে কি না। প্রত্যেকেই জানিয়েছে যে সেই রকম কোনো খবর এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে নেই। সব স্বাভাবিক আছে। তবে আপনি কোন বিপদের আশঙ্কায় এভাবে ছুটে এলেন এখানে?

তিনি জীবসিদ্ধির দিকে চোখ খুলে চাইলেন। বললেন,

- জগতের সবচেয়ে ভয়ানক আপদ সেটাই, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ অবগত থাকে না এবং সেই কারণেই সেই আক্রমণ প্রতিহত করারও কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। সবার দৃষ্টির সামনে থেকেও, সবার অলক্ষে তা শত্রুকে ধ্বংস করে। মগধ আক্রান্ত। মগধ একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রর শিকার হয়েছে।

- কার ষড়যন্ত্র?

- আমার!

চাণক্যর কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারল না জীবসিদ্ধি। চাণক্যর ষড়যন্ত্রর শিকার হয়েছে মগধ? একথার অর্থ কী? আবার প্রশ্ন করল জীবসিদ্ধি,

- কী বলছেন, আচার্য? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

চাণক্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

- আমার অতীতের এই অধ্যায় বেশ বড়ো হে, জীবসিদ্ধি। বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। শুনতে চাও তুমি?

- অবশ্যই!

- হুম। বেশ। এটা সেই সময়কার কথা যখন নন্দদের সাম্রাজ্য পতনের পরিকল্পনার বীজ আমার মস্তিষ্কে সবে উপ্ত হয়েছে। সেই সময়ে আমার সঙ্গী ছিল ইন্দ্রজিৎ। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থর প্রয়োজন পড়বে। আমি অনেক চেষ্টায়, বন্ধু, পরিচিতদের সাহায্য নিয়ে এবং নিজের পুঁজির সর্বস্ব ব্যবহার করেও দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বেশি একত্রিত করতে পারলাম না। সৈন্যবল গড়ে তুলতে অন্তত আরও পাঁচগুণ অর্থের প্রয়োজন। কোন উপায়ে আরও অর্থ একত্রিত করা যায় সেই নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম। অর্থসাহায্য পাওয়ার মতো আর কোনো উপায় আমার জানা ছিল না।

এই সময়ে একদিন আমি এবং ইন্দ্রজিৎ উজ্জয়িনীর কাছে, বিন্ধ্যাচল পার্বত্য প্রদেশে একদল দস্যুর মাঝে পড়ি। প্রথমে ভেবেছিলাম তারা আমাদের লুঠ করতে চায়, কিন্তু পরে বুঝি তাদের উদ্দেশ্য অন্য। তাদের এক বৃদ্ধ সর্দার অসুস্থ। তার আরোগ্যর জন্যে প্রয়োজন একটা বিশেষ জড়িবুটি ওষধির। সেই ওষধি বানানোর উপায় একটা ভূর্জপত্রে লেখা আছে। কিন্তু তাদের দলে একজনও শিক্ষিত না হওয়ার কারণে তা পড়তে পারছে না কেউ। তাদের মধ্যে যে একজন শিক্ষিত সদস্য ছিল, সে কয়েক মাস আগেই সৈনিকের তিরে প্রাণ দিয়েছে। অতএব, তাদের এমন একজন শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন যে সেই লেখা পড়ে, উপযুক্ত জড়িবুটি জোগাড় করে, ওষুধ বানাতে পারবে। সেই কারণেই তারা ব্রাহ্মণ আচার্য দেখে আমাদের পথ রোধ করেছে।

আমায় তারা এও প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমি তাদের সাহায্য করলে তারা আমায় প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেবে এবং অস্বীকার করলে আমায় হত্যা করতে তারা দ্বিধা করবে না। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমায় তাদের সঙ্গে যেতে হল।

দস্যুরা আমায় নিয়ে বিঞ্জা অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করল। গভীর অরণ্যেই তাদের প্রায় পঞ্চাশ জনের দলটার বসবাস। অসুস্থ সর্দারের কাছে আমায় নিয়ে যাওয়া হল। ওষুধ বানানোর উপকরণ দেখে বুঝলাম, নিতান্তই সামান্য কিছু পরিচিত বুটি দিয়ে তা সহজে বানানো সম্ভব। কিন্তু তা খেতে হবে সেটা বানানোর সঙ্গেসঙ্গেই। বানিয়ে রেখে দিলে তার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, এমন লেখা আছে। অতএব সর্দার নির্দেশ দিল যে আমায় তাদের সঙ্গেই অরণ্যে থাকতে হবে যতদিন না সে আরোগ্য লাভ করে। প্রতিদিন নিয়ম করে দু- বেলা তাকে ওষুধ বানিয়ে দিতে হবে।

এদের মাঝে থাকাকালীন আমি একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। সেটা হল তাদের কাছে মজুত অর্থের পরিমাণ। তারা আমায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তাদের কাছে সত্যিই স্বর্ণমুদ্রার যেন অভাব নেই। অথচ তাদের কথা থেকেই জানতে পারি যে তারা বড়োজোর দু-এক মাস অন্তর একবার করে লুঠপাট করতে বেরোয়। তাতে কীভাবে এদের কাছে এত অর্থ আসে তা আমি অনুমান করতে পারিনি প্রথমে। এখানে থাকাকালীন অরণ্যের মধ্যে আমার সর্বত্র অবাধ বিচরণ ছিল। শুধু অরণ্য ছেড়ে আমার বা বাসবের বেরোনো বারণ ছিল। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরে আমাদের দু-জনের প্রবেশ ছিল নিষেধ। সেই কুটিরে এমন কিছু গুপ্ত রহস্য ছিল যা আমাদের থেকে গোপন রাখা হচ্ছিল। আমি কিন্তু কয়েকদিন পর অনুমান করতে পেরেছিলাম কিছুটা আর তাতেই আমার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। আমি ঠিক করে নিই, যে আমি ধীরে ধীরে এদের সর্দারের বিশ্বাস অর্জন করব। এক মাসের মধ্যেই সর্দার বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। আমার প্রতি তার এক ধরনের ভক্তি আর বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে ততদিনে। একদিন সেই কাঙ্ক্ষিত দিন এল। সর্দার নিজেই আমায় তার সঙ্গে করে সেই গুপ্ত কুটিরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকে, একদৃষ্টিতেই বুঝতে পারলাম আমার অনুমান ঠিক ছিল। এটা একটা নকল মুদ্রা বানানোর মুদ্রাঘর। এটাই হল এই দলটার এত সচ্ছলতার রহস্য। তারা নকল স্বর্ণমুদ্রা বানায় এই কুটিরে!

কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা এতদিন ধাঁধা সৃষ্টি করেছিল সেটা হল, সোনার বিকল্প হিসেবে কোন উপাদান ব্যবহার হয়? আমি তাদের ব্যবহৃত পণ হাতে নিয়ে দেখেছি। তার সঙ্গে আসল সোনার কোনো পার্থক্য বুঝতে পারিনি। সর্দার আমায় দেখাল সেই জিনিস। এক বিশেষ ধরনের খনিজ ধাতু। এই ধাতু তারা আনে বিদর্ভ রাজ্যের কাছে, সাকোলি নদীর পার থেকে। খয়েরি রঙের কারণে তারা এই ধাতুকে 'ভূরি ধাতু'* বলত। এই ধাতুর বিশেষত্ব হল এর ওজন, ঘনত্ব সব কিছুই অবিকল সোনার সমান। এক পাও সোনা আর এক পাও ভূরি ধাতুর মধ্যে কেউ পার্থক্য করতে পারবে না।

নকল কাহাপণ* বানানোর পদ্ধতি অবিকল আসল মুদ্রা বানানোর মতোই। শুধু সোনার জায়গায় অন্য ধাতুর ব্যবহার হবে। সর্বপ্রথম, মুষায় ধাতু গলিয়ে তাতে কাসরা দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে*। তারপর তা মুগুরাঘাতে পাতলা পাতার মতো করে তার থেকে মুদ্রা কেটে বের করতে হবে। এরপর এই নকল মুদ্রাকে, আসলের রূপ দিতে সোনার প্রয়োজন পড়বে। এই মুদ্রা গলিত সোনায় একবার ডুবিয়ে তার ওপর যথাযথ রাজ সিলমোহর লাগিয়ে দিলেই কাহাপণ তৈরি। ওপরে সোনার প্রলেপ, ভেতরে অন্য ধাতু। ওজন আসল স্বর্ণমুদ্রার সমান। এই পদ্ধতি দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম। মাত্র একটা আসল স্বর্ণমুদ্রা গলিয়ে,

সেই সম পরিমাণ সোনা দিয়ে আটটা নকল মুদ্রা বানানো সম্ভব।

'চতুর্ভি কনক পরীক্ষ্যতে,

নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।'**

অর্থাৎ সোনা পরীক্ষার চারটে উপায় আছে। কষ্টিপাথরে ঘষা, কেটে দেখা, তাপে গলানো এবং আঘাত করে পাতলা করা। এর মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতি মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, কারণ এতে মুদ্রাটা নষ্ট হয়। অতএব, একটা মুদ্রা পরীক্ষা করার উপায় রয়ে যায় বাকি দুটো এবং সঙ্গে ওজন মিলিয়ে দেখা। সোনার প্রলেপ যুক্ত এই বিশেষ ধাতুর মুদ্রা এই তিনটে পরীক্ষাই অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়। খুবই সাধারণ, অথচ আশ্চর্য রকমের ত্রুটিবিহীন পদ্ধতি।

আমি তখনই দস্যু সর্দারকে বলি, যে, সে যদি সত্যিই আমার উপকারের প্রতিদান দিতে চায় তবে যেন সে আমায় সাহায্য করে। আমি তার থেকে কোনো অর্থসাহায্য চাই না। কিন্তু সে যেন আমার দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাকে আশি লক্ষ মুদ্রায় রূপান্তরিত করে দেয়। তারা রাজি হয়। আমি পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই নিজের সব স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিঞ্জা অরণ্যে ফিরে আসি এবং সেই অরণ্যের বাসিন্দাদের সাহায্যে তা আটগুণ করি। এরপর এই মুদ্রা আমি সেই অরণ্যেই লুকিয়ে রাখি, এই দস্যুদেরই পাহারায়। তাদের কাছে আমার সঞ্চয় সুরক্ষিত আমি জানতাম। কারণ তাদের সেই অর্থর প্রয়োজন নেই।

এই বিপুল পরিমাণ নকল মুদ্রা আমি পরবর্তীকালে সৈন্যদল তৈরি করতে, অস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া ইত্যাদি কিনতে ব্যবহার করি। আর এই সমস্ত জিনিস আমি ইচ্ছে করেই মগধের থেকে কিনেছিলাম। কারণ এতে আমার জোড়া লাভ। কেন বলতে পারো?

জীবসিদ্ধি এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধর মতো এই আশ্চর্য কাহিনি শুনছিল। চাণক্যর প্রশ্নর উত্তরে সে 'না' সূচক ঘাড় নাড়ে। চাণক্যই নিজের প্রশ্নর উত্তর দেন,

- কারণ এই বিপুল নকল মুদ্রা যে দেশেই ঢুকবে, সেই দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়তে বাধ্য! আমি এইভাবে নন্দ সাম্রাজ্যর অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে ধ্বস্ত করেছিলাম। এর ফলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নন্দ অর্ধেক হেরেই বসে ছিল। তার বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ অমাত্য রাক্ষসও এই অর্থনীতির ধস থামাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়া মগধ বেশিদিন চন্দ্রগুপ্তর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। আর তাতেই একদিন পতন হয় নন্দ সাম্রাজ্যর।

কথা থামালেন চাণক্য। কিছুক্ষণ দু-জনেই কোনো কথা বললেন না। জীবসিদ্ধি পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটা করল,

- সবই বুঝলাম, আচার্য। কিন্তু এই কাহিনির সঙ্গে এখনকার কী সম্পর্ক?

*1. *বিঞ্জা অরণ্য- বিন্ধ্যাচল পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত অরণ্য।*

2. পণ/কাহাপণ- স্বর্ণমুদ্রা

3. ভূরা ধাতু - টাংস্টেন(Tungsten)

4. মুষা - গলন পাত্র/crucible

5. কাসরা - ক্ষারক/ alkali

মুদ্রা নির্মাণের এই সম্পূর্ণ পদ্ধতির উল্লেখ কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্র'-তে পাওয়া যায়।

***শ্লোকসূত্র: চাণক্যনীতি- ৫.২*

৩০.

জীবসিদ্ধির প্রশ্নর উত্তরে চাণক্য পালটা একটা প্রশ্ন করলেন,

- আচ্ছা, ইন্দ্রজিৎ বা বাসবজিতের পুরো ষড়যন্ত্রর নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ছিল বলতে পারো?

একটু ভাবনাচিন্তা করে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- আপনার ওপর তার রাগ। তক্ষশিলায় শিক্ষালাভের সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ। এবং তার থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণতা। আপনি নিজেই তো তাই বললেন।

- হুম। যুক্তিটা কি খুব জোরালো হল? নিজের উদ্দেশ্যে সফল হলেই-বা আমার ওপর কী ধরনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হত তাতে? যদি আমি তক্ষশিলার রহস্যর সমাধান করতে ব্যর্থ হতাম আমার কি বাস্তবে কোনো ক্ষতি হত?

- না... তা নয়।

- আমারও এই একটা হিসেব কিছুতেই মিলছিল না। তার উদ্দেশ্যটা ঠিক কী আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বাসবের বলা আরও একটা কথায় আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

- কোন কথা?

- ধরা পড়ার পর বাসব বলেছিল, 'আপনি যেদিন এসেছিলেন, সেইদিনই আমি জানতাম যে আপনি আমায় ধরে ফেলবেন।' ভেবে দেখো জীবসিদ্ধি, এর অর্থ দাঁড়ায় যে বাসব তার ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে জেনেও পালায়নি। কেন? দ্বিতীয়ত, শেষ অবধি সে বলে গেছে যে আমি যদি ভেবে থাকি, আমি জিতে গেছি, তবে আমি ভুল ভাবছি। এই কথার তাৎপর্য কী? শুধুই কি বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার বৃথা আস্ফালন? নাকি তার এই কথার কোনো অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আছে?

খানিক থেমে আবার বলতে থাকলেন চাণক্য।

- আমার বার বার মনে হতে থাকে যে গোটা ঘটনাটায় কিছু যেন মিলছে না। কিছু যেন আমার অলক্ষে থেকে যাচ্ছে। কিছু একটার অভাব বোধ করছিলাম।

এইবার আসা যাক অন্য একটা ঘটনায়। আপাতদৃষ্টিতে যার সঙ্গে অন্য কোনো রহস্যর সম্পর্ক নেই। কয়েক মাস আগে, 'পরিঘ'*-এর স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফেরা একটা ঘোড়ার গাড়ি লুঠ হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর সেই স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়েও দেয়া হয়। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে দস্যুরা নির্ঘাত না জেনেই রাজসম্পত্তি লুঠ করেছিল। রাজরোষের ভয়ে তারা সেই অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। সত্যি বলতে, সেই সময়ে তক্ষশিলার সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় এই বিষয় নিয়ে ভাবনা আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি আন্দাজ করতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি?

জীবসিদ্ধির দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় তার স্বর কেঁপে উঠল,

- ওগুলো নকল মুদ্রা?!

নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাণক্য বললেন,

- ধীরে বলো। পাশের ঘরে বিশ্রামরত গৃহস্বামী শুনতে পাবে যে।

জীবসিদ্ধির কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চাপাস্বরে বলল:

- বাসব! সে বিঞ্জা অরণ্যে আপনার সঙ্গেই ছিল। সে এই নকল মুদ্রা বানানোর পদ্ধতি জানত।

- হুম। পুরোটা না জানলেও, কিছুটা জানতই। সম্ভবত কয়েক বছর আগে সে ফিরে গিয়ে সেই অরণ্যের পুরোনো বাসিন্দাদের কারুর থেকে বাকিটাও জেনেছে। যদিও সেই দস্যুদল আর নেই। যুদ্ধর সময়ে তারা আমাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সেই রকম প্রাক্তন কোনো দস্যুকে খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর নয়। মৌর্য সাম্রাজ্যর পত্তনের পরে তাদের বেশিরভাগ লোকই তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে গেছে।

- কিন্তু... কিন্তু আচার্য, এর সঙ্গে তক্ষশিলার সম্পর্ক কী? সেখানে সমস্যা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাণক্য বললেন,

- উদ্দেশ্য একটাই, জীবসিদ্ধি। আমাকে মগধ থেকে সরানো। আমারই ষড়যন্ত্র, আমারই ওপর ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই ষড়যন্ত্র বিফল করতে পারি একমাত্র আমি স্বয়ং! সেই কারণেই এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে আমায় পাটলিপুত্র থেকে সরিয়ে ফেলা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। আমায় অন্য একটা গভীর রহস্যর জালে জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে আসল অপরাধের থেকে আমার দৃষ্টি ঘুরে যায়।

- এ তো অতি গভীর এবং কুটিল পরিকল্পনা, গুরুদেব!

- হুম। আশঙ্কাটা আমার মনে জাগে বাসবের মৃত্যুর পর। তাকে হত্যায়

ব্যবহৃত বিষাক্ত তিরের সঙ্গে, মগধের সৈনিক হত্যায় ব্যবহৃত তিরের মিল থেকেই আমি দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র অনুমান করতে পারি। তারপরেই পুরোনো চিঠিতে, রাজকোষের হিসেবে গরমিলের কথাটা মনে পড়ে যায়। সেই চিঠিগুলো আমি তখনই আবার পড়ি। স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠন, তা সহজেই ফেরত পাওয়া এবং তারপর এই মুদ্রার হিসেবে গরমিল। সূত্রগুলো মেলাতে আর দেরি হয়নি আমার। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে চুরি যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করে নকল মুদ্রা বানানো হয়েছে। এবং ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে আসলের পরিবর্তে, সমপরিমাণ নকল মুদ্রা। তার পরের দেড় মাসে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে দেশে বাসিন্দাদের দৈনিক লেনদেনের মাধ্যমে আরও বেশি নকল মুদ্রা ঢোকানো হয়। এটাই নিয়ম। আমিও তাই করেছিলাম। মুদ্রাশালে বানানো মুদ্রার চেয়ে বেশি মুদ্রা, বড়ো অঙ্কে দেশে ঢুকে গেলেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। অর্থশাস্ত্র তাই নিদান দেয়।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবলেন চাণক্য। তারপর বললেন,

- আমার মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলা করা হয়েছে। আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের দুটো জায়গা যদি নির্বাচন করতে হয়, তবে প্রথমেই আসবে- মগধ। আমার জন্মভূমি। আমার হাতে স্থাপিত এই দেশ। আর তার পরেই যে জায়গার নামটা আসবে, সেটা হল তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়। আমার শিক্ষাভূমি এবং কর্মভূমি। আমার কর্মকাণ্ডের বীজ যেখান থেকে অঙ্কুরিত হয়েছিল। সেই আমার প্রাণাধিক প্রিয় তক্ষশিলা। অতএব, আমায় মগধ থেকে বের করতে, তক্ষশিলায় সৃষ্টি করা হয় সমস্যা। ষড়যন্ত্রী জানত যে ঘোর বিপদে প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবেন। অথবা কে বলতে পারে, হয়তো আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ বাসবই সুচতুরভাবে প্রধানাচার্যর মাথায় ঢুকিয়েছিল। সেটাও সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপদের কথা শুনলে আমি চুপ থাকতে পারব না। এক বাড়ি থেকে আমায় বের করে আনতে আমার দ্বিতীয় বাড়িতে আগুন লাগানো হল।

- অর্থাৎ তক্ষশিলার ঘটনা, পুরোটা শুধুই আপনার মনোযোগ আসল সমস্যা থেকে সরিয়ে দেয়ার কৌশল মাত্র?

- হুম। ঠিক তাই। ভেবে দেখো, আমি এতটাই সেখানকার রহস্য সমাধানে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে চন্দ্রগুপ্ত যখন তার দ্বিতীয় চিঠিতে, রাজকোষের হিসেব না মেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল, সেটাও আমার নজরে আসেনি। আমার একবারও মনে হয়নি যে বিষয়টা অস্বাভাবিক কিছু। এখন অনুমান করতে পারি, রাজকোষে হিসেব না মেলার কারণ। নকল মুদ্রা গত এক মাসে কিছু পরিমাণ লেনদেন মারফত ঢুকে গিয়েছিল। যার ফলে, মুদ্রাশালে বানানো মুদ্রার সংখ্যার সঙ্গে হিসেব মিলছিল না। জাল মুদ্রা ঢুকেছে সন্দেহ করলেও,

'ভূরি ধাতু'র মুদ্রা পরীক্ষা করে, সেটা নকল প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। আমার উপস্থিতিতে এই সমস্যা ঘটলে আমি সহজেই আসল সমস্যাটা অনুমান করতে পারতাম। কিন্তু ঠিক সেইসময়েই আমি এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। ভারি গভীর ষড়যন্ত্র, জীবসিদ্ধি। ভারি গভীর ষড়যন্ত্র।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে জীবসিদ্ধি। সে এতদিন অনুমান করতে পারেনি যে এত ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে পারে। আশ্চর্য এই যে এত কিছু মনে নিয়েও তার গুরুদেব এখনও এতটা শান্ত থাকতে পারছেন। জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- তবে এখন উপায় কী, আচার্য? মগধের অর্থনীতি ব্যবস্থা কি তবে ভেঙে পড়বে?

চাণক্যর দৃষ্টিতে চকিত বিদ্যুৎ খেলা করল। হিমশীতল কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন,

- চাণক পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য জীবিত থাকতে তা কখনোই নয়। আমার সারাজীবনে অর্জিত অর্থশাস্ত্রর সমস্ত জ্ঞান আমি ব্যবহার করব। কিন্তু আর্যাবর্তর ওপর কোনো আঁচ আমি আসতে দেব না। কুটিলের বিরুদ্ধে আমিও মহা-কুটিল 'কৌটিল্য'!

**পরিঘ - অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'সুরক্ষা কর', যা অন্যান্য ছোটো রাজ্য এবং জনপদের রাজারা দেশের সম্রাটকে দিত। এর বদলে সাম্রাজ্য তাদের বহিরাগত আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখত।*

৩১.

নিজের ঘরে, চন্দন কাঠের পালঙ্কে শুয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। কয়েক দিন আগেই তাঁর গুরুদেবের থেকে দুটো চিঠি পেয়েছেন তিনি। দুটো একই চিঠি, একই নির্দেশ দেয়া তাতে। চন্দ্রগুপ্ত অনুমান করতে পেরেছেন যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে, নিশ্চিত হতে, তাঁর আচার্য একাধিক চিঠি তাঁকে পাঠাতেন না। এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে না পারলেও, তা পালন করতে চন্দ্রগুপ্ত দেরি করেননি। কিন্তু তিনি গত কয়েকদিন ধরে চিন্তিত। কারণ দু-দিন আগেই তক্ষশিলা থেকে আবার একটা চিঠি এসেছে তাঁর কাছে। সেটা লিখেছে, চাণক্য এবং জীবসিদ্ধির সঙ্গে পাঠানো সৈন্যদলেরই এক সৈনিক। আচার্য চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়েছেন সেখান থেকে। তাঁদের কোনো বিপদ হয়নি তো? সেই আশঙ্কাতেই চিন্তিত চন্দ্রগুপ্ত।

দরজার বাইরে থেকে একজন প্রহরীর গলা শোনা গেল,

- সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয় হোক। সম্রাটের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোয় দুঃখিত। কিন্তু আচার্য চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি ফিরে এসেছেন। তাঁরা এই মুহূর্তে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রায় লাফিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লেন চন্দ্রগুপ্ত। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বললেন,

- তাঁদের বিশ্রাম ও খাবার-পানীয়র ব্যবস্থা করো। আমি আসছি।

কোনোমতে অঙ্গবস্ত্র জড়িয়ে তিনি রাজসভায় চলে এলেন। অপেক্ষারত দু-জনকে দেখে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। প্রতিবার গুরুর মুখদর্শন হলেই চন্দ্রগুপ্তর মনে একটা স্বস্তির ভাব আসে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হন তিনি। চাণক্যর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন সম্রাট। চাণক্য দু-হাতে তাঁর কাঁধ ধরে তাঁকে তুলে আশীর্বাদ করলেন,

- উৎকৃষ্ট ভারতম, সম্রাট। সদা জয়তু ভবঃ।

উঠে জীবসিদ্ধিকে আলিঙ্গন করলেন চন্দ্রগুপ্ত।

- কেমন আছ ভাই?

উত্তরে শুধু শুকনো হাসি হাসল জীবসিদ্ধি। বিপদের আভাস বুঝতে অসুবিধে হল না চন্দ্রগুপ্তর। প্রশ্ন করেন,

- কী ঘটেছে? সব কুশল তো?

উত্তর চাণক্য দিলেন,

- জানি না, চন্দ্রগুপ্ত। ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা যেন এখনও অপূরণীয় কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে রূপাদর্শক*, অক্ষৎপাতালাদক্ষ* এবং সমস্ত অধ্যক্ষকে* তলব করো। তাদের আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে দেখতে চাই। আর সঙ্গে যেন গত চার মাসের সমস্ত হিসেব নিয়ে আসে।

কোনো প্রশ্ন না করেই, সম্রাট সৈনিকদের তলব করে যথাযথ নির্দেশ দিলেন। সৈনিকরা চলে গেলে তিনি প্রশ্ন করলেন,

- সকলের উপস্থিত হতে সময় লাগবে। ততক্ষণে কি আমায় বলবেন কী ঘটেছে?

- আমার চিঠি পেয়েছিলে? ক-টা চিঠি পেয়েছিলে?

- দুটো চিঠি পেয়েছি। দুটোতেই সমস্ত বড়ো আর্থিক লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ ছিল।

তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে চাইলেন। অর্থাৎ, ওঁর আশঙ্কাই ঠিক ছিল। প্রথম চিঠি সম্রাটের হাতে এসে পৌঁছোয়নি। আবার চন্দ্রগুপ্তকে প্রশ্ন করলেন,

- সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছ তো?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন চন্দ্রগুপ্ত,

- হ্যাঁ, আচার্য। কিন্তু আমায় বুঝিয়ে বলুন, কী হয়েছে? কাউকে না জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করারই-বা কী প্রয়োজন পড়ল?

তিন জনে আসন গ্রহণ করলেন। প্রথম থেকে পুরো ঘটনাটা গুছিয়ে, চন্দ্রগুপ্তকে ব্যাখ্যা করলেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। মাঝে ফল, দুধ আর মধু

দিয়ে গেল একজন ভৃত্য। কথার মাঝেই সেগুলো খেলেন দু-জন। দীর্ঘ ঘটনাক্রম বলে শেষ করতে অনেকটা সময় লাগল। স্তম্ভিত হয়ে পুরোটা শুনে গেলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। সবটা শুনে কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারলেন না প্রথমে। পাথরের মতো বসে থাকলেন। তারপর বললেন,

- একটা বিষয় আমায় বুঝিয়ে দিন। মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের সময়, নন্দর রাজ্যে আপনার ছড়িয়ে দেয়া নকল মুদ্রার কী গতি করেছিলেন?

চাণক্য উত্তর দিলেন,

- নতুন সাম্রাজ্যের সঙ্গেই, নতুন মুদ্রাও শুরু হয়েছিল, সম্রাট। সেই সময়েই আমি নকল মুদ্রা আলাদা করে ফেলেছিলাম। আমি একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলাম নকল মুদ্রা বানানোর সময়ে, যাতে পরবর্তীকালে তা আলাদা করে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। নন্দ যুগের মুদ্রায় পাঁচটা চিহ্ন ব্যবহার হত। সূর্য, ছয় বাহু মগধ, পর্বতশৃঙ্গে বৃষ, হস্তী এবং বৃষ সদৃশ ইন্দ্রধ্বজ**। নকল মুদ্রায় ব্যবহৃত সিলমোহরের চিহ্নগুলো, আসল চিহ্নর প্রায় প্রতিরূপ হলেও, হুবহু এক ছিল না। যেমন ধরো, বৃষ চিহ্নর একটা পা অন্য তিনটের তুলনায় সামান্য ছোটো রাখতাম। এইরকমই অতি সামান্য পার্থক্য আমি রেখে দিয়েছিলাম সবকটা সিলমোহরে। এগুলো সাধারণ চোখে কেউই ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি জানতাম। তাই পরবর্তীকালে আমার নির্দেশমতো, অধ্যক্ষরা সহজেই এই মুদ্রাগুলো আলাদা করতে পেরেছিল। কিন্তু এখন আসল-নকল এত সহজে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। কারণ এইবার নকল মুদ্রা আসলের সঙ্গে হুবহু এক হবে।

- তাহলে উপায়?

- একটাই উপায় আছে। সমস্ত মুদ্রা গলিয়ে ফেলা! সোনা এবং 'ভূরি ধাতু'র গলনাঙ্কে বিস্তর পার্থক্য। সোনা তুলনামূলক অনেক আগে এবং সহজে তরলে পরিণত হয়। অর্থাৎ উচ্চ তাপে আসল মুদ্রা পুরো বিগলিত হবে এবং নকল মুদ্রার শুধু ওপরের সোনার আবরণ গলে যাবে।

ততক্ষণে একে একে অধ্যক্ষরা উপস্থিত হতে শুরু করেছেন। তাই চাণক্য আর সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধির উদ্দেশে বললেন,

- তোমরা চাইলে বিশ্রাম নিতে পারো। কিন্তু আজ আমার সামনে দীর্ঘ রাত জাগা আছে।

- আমি আপনার সঙ্গেই থাকব আজকে রাতে।

- আমিও।

দুই শিষ্য একইসঙ্গে বলে উঠল।

মৃদু হেসে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তর উদ্দেশে বললেন,

- আমার জন্যে কিছু পরিমাণ গুড়, মধু ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারো, সম্রাট? ঈশ্বর জানেন, আজ আমার প্রচুর মধু-দ্রব্যর প্রয়োজন পড়তে চলেছে। জিভের মিষ্টি স্বাদ আমার মস্তিস্ক চালনায় সাহায্য করে।

সারারাত চাণক্য ডুবে থাকলেন রাজকোষের হিসেবের নথিতে। অন্যান্য অধ্যক্ষরাও ওঁর সঙ্গেই সারারাত ধরে কাজ করলেন। রাতের শেষ প্রহরে কাজ শেষ হল। কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দেয়া হল সেই রাতে।

প্রথমত পরের দিন থেকে, মগধে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার, নিষিদ্ধ করা হল। কোনোরকম বাণিজ্য বা লেনদেনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র রৌপ্যমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রা ব্যবহার করা যাবে। দ্বিতীয়ত সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত অধ্যক্ষর কাছে জমা করতে হবে। তার বদলে সমমূল্য রৌপ্যমুদ্রা, গো, অন্ন অথবা অন্য জিনিস লোকেদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তৃতীয়ত যত স্বর্ণমুদ্রা গত চার মাসে জমা পড়েছে রাজকোষে এবং যা জমা পড়বে আগামী সময়ে, তা গলিয়ে সোনার পাত বানিয়ে ফেলতে হবে।

চাণক্য যখন উঠলেন তখন প্রায় ভোর হয় হয়। ক্লান্তিতে তাঁর চক্ষু কোটরাগত হয়েছে। পরিশ্রান্ত শরীরে উঠে এসে, চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধির পাশের আসনে শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি।

**1. রূপাদর্শক - টাঁকশালের প্রধান/mint master*

2. অক্ষৎপাতালাধ্যক্ষ - auditor general

3. অধ্যক্ষ - চৌত্রিশ জন কর আধিকারিক।

***অর্থশাস্ত্রে এই সমস্ত পদ এবং মুদ্রায় ব্যবহৃত সিলমোহরের চিহ্নর উল্লেখ আছে।*

৩২.

সকাল বেলা। দিনের প্রথম প্রহর শেষের দিকে। কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে, চোখ-মুখে ক্লান্তির ভাব খানিক দূর হয়েছে চাণক্যর। বিশ্রামের পরেই চাণক্য নিজের কুটিরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে বাধা দিয়েছেন।

এখন তিন জনে প্রাতঃভোজ করছেন একসঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও শুরু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

- আচার্য, এইভাবে স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়ে আনতে গেলে রাজকোষের কি ক্ষতি হবে?

চন্দ্রগুপ্তর এই প্রশ্নের উত্তরে চাণক্য বললেন,

- হুম। তা হবে। কারণ আমার ধারণা গত চার মাসে যথেষ্ট পরিমাণ নকল মুদ্রা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করায় নতুন করে

নকল মুদ্রা আর ঢুকতে পারবে না। কিন্তু যা আগেই ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে আনতে, আমাদের সমমূল্য ফেরত দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। এর ফলে দেশ জুড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। সব স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাহার করতে, এক বছর বা আরও বেশি সময় লাগারও সম্ভাবনা আছে। এরপর ধীরে ধীরে আবার দেশের অর্থনীতির হাল ফিরে আসবে। কিন্তু সময় লাগবে।

- চিন্তার কথা।

- না, সম্রাট। তক্ষশিলার রহস্যভেদে আরও দেরি হলে সেটা আরও বেশি চিন্তার হত। তবে শত্রুর ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে এটাই বড়ো কথা।

- শত্রুর শেষও হয়েছে। এটাও ভালো কথা।

জীবসিদ্ধির কথায় চাণক্য খাওয়া থামিয়ে একবার চাইলেন তার দিকে। বললেন,

- কার কথা বলছ?

- কেন? বাসব... মানে ইন্দ্রজিতের কথা বলছি।

কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন চাণক্য। তারপর বললেন,

- জীবসিদ্ধি, তুমি কি সত্যটা এখনও বুঝতে পারোনি?

- অর্থাৎ?

- ইন্দ্রজিৎকে কে হত্যা করল?

- নকল স্বর্ণমুদ্রার এই ষড়যন্ত্রর কথা, জিজ্ঞাসাবাদে বলে ফেলার ভয়ে সে নিজেই আততায়ী দিয়ে সম্ভবত নিজের হত্যা করিয়েছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে।

এই উত্তরটা চন্দ্রগুপ্ত দিলেন। উত্তরে 'না' সূচক মাথা নাড়ালেন চাণক্য। বললেন,

- সেই সম্ভাবনা এড়াতে হলে বাসব আত্মহত্যা করত। গোপনে আততায়ী নিযুক্ত করত না।

- আপনি... আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন, আচার্য? অন্য কেউও জড়িত এই ষড়যন্ত্রর সঙ্গে?

- পুরো ঘটনাক্রমের মধ্যে, কয়েকটা প্রশ্ন কি তোমার মাথায় জাগেনি? বাসব নামের একজন অপরিচিতকে আচার্য বিন্দাচল কেন নিজের সহকারী হিসেবে জায়গা দিলেন? সে তো জীববিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রর স্নাতক নয়। তা ছাড়া বাসব কিন্তু তক্ষশিলার ছাত্র ছিল না কোনোদিন। তাহলে সে কীভাবে তক্ষশিলায় এত বড়ো একটা ষড়যন্ত্রর পরিকল্পনা করল? আমি তাকে চিনি। সে বুদ্ধিমান অবশ্যই। কিন্তু তার পক্ষে একা এত পরিকল্পনা করা অসম্ভব। এই ষড়যন্ত্রর জন্যে প্রয়োজন বিদ্যা এবং বুদ্ধি। বাসবের মধ্যে এত শিক্ষা ছিল না কোনোকালেই।

খানিক বিরতি নিয়ে আবার বললেন,

- আরও কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায়। বাসবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বছরের সামান্য বেশি। তার পক্ষে আমার মনস্তত্ত্ব এতটা গভীরে জানার কথা নয়। এই পরিকল্পনা এমন একজন ব্যক্তির যে আমায় বহু বছর ধরে চেনে। সে জানে তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয় আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সে জানে যে মগধ থেকে আমায় টেনে বের করে আনতে পারে একমাত্র তক্ষশিলা।

না না, জীবসিদ্ধি। এই আক্রমণ যতটা মগধের ওপর করা হয়েছে, ততটাই আমার ওপরেও করা হয়েছে। এটা ব্যক্তিগত। যুক্তি দিয়ে ভাবো একবার তোমরা। নিজেকে একবার আচার্য বিন্দাচলের জায়গায় কল্পনা করো। তুমি একদিন গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ এক ভয়ানক ভয় সৃষ্টিকারী জিনিসের খোঁজ পেলে। তুমি বুঝতে পারলে যে এর পরিণাম ভয়ানক হতে পারে। তখন তুমি কী করবে?

- আমি খুবই বিচলিত হব। নিজের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান পরিচিত ব্যক্তির কাছে পরামর্শ চাইব। এককথায়, আপনার পরামর্শ চাইব।

- ঠিক। আচার্য বিন্দাচলও তার ব্যতিক্রম নন। তিনিও সম্ভবত সেটাই করেছিলেন। তিনিও তাঁর নিজের পরিচিত সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরামর্শ চেয়েছিলেন। অনুমান করতে পারো, কে সেই ব্যক্তি?

চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধি দু-জনেই সমস্বরে বলে উঠলেন,

- আচার্য শকুনি!

- ঠিক তাই। আমার অনুমান, শকুনি নিরুদ্দেশ থাকলেও, নিজের বিশ্বস্ত কয়েকজনের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছে। বিন্দাচল তাদেরই একজন। আমার ধারণা বিন্দাচলের বাড়িতে আমরা যে পোড়া নথিপত্র দেখেছিলাম, সেগুলো শুধুই গবেষণার তথ্য নয়। তার মধ্যে শকুনির লেখা চিঠিও ছিল। এই মাদক সম্বন্ধে জানতে পেরে, শকুনিই বাসবকে বিন্দাচলের কাছে পাঠায়। আচার্য বিন্দাচল সেই কারণেই বিশ্বাস করেছিল তাকে। সে ধারণাও করতে পারেনি যে সে নিজের মৃত্যুর আহ্বান নিজেই করছে।

- তার মানে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল আসলে আচার্য শকুনি?

- হুম। আমি নিশ্চিত। ভেবে দেখো। সে ছাড়া আর কে আছে যার আমার এবং মগধ দুইয়ের প্রতিই বিদ্বেষ আছে? কে এমন ব্যক্তি যে জ্ঞানী, অসম্ভব বুদ্ধিমান এবং আমার স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে পরিচিত? তক্ষশিলার সঙ্গে যার যোগ আছে এবং নিজের স্বার্থে সে দেশের ক্ষতি করতেও পিছপা হবে না। একজনই আছে এমন ব্যক্তি।

হতবুদ্ধির মতো দু-জনে নির্বাক বসে থাকল। এইভাবে তারা ভেবে দেখেনি একবারও। অথচ উত্তরটা সর্বক্ষণ তাদের সামনেই ছিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,

- কিন্তু আচার্য, শকুনির সঙ্গে আপনার প্রাক্তন ছাত্র এই বাসবজিতের পরিচয় হল কী করে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুকের ওপর এসে পড়া টিকিতে হাত বুলিয়ে চাণক্য বললেন,

- এর উত্তর আমার কাছে নেই। কোনোদিন জানতেও পারব না সম্ভবত। তবে অনুমান করি যে হয় তাদের পরিচয় দৈবাৎ হয়েছিল অথবা শকুনি নিজেই আমার অতীত ঘেঁটে খুঁজে বের করেছিল তাকে। বাসবের থেকেই শকুনি এই নকল মুদ্রা বানানোর ঘটনা জানতে পারে। এরপরেই এই পরিকল্পনা বানায় শকুনি। কিন্তু বিন্দাচল শেষ পর্যন্ত শকুনির ষড়যন্ত্রে রাজি না হওয়ায়, তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় শকুনি। ভেবে দেখো, বিন্দাচলের মৃত্যু হয়েছে এক বছরের আগে। অতএব, 'কাৎ'-এর মাদক তখন থেকেই বাসবের কাছে ছিল। তবে সেটা ব্যবহার শুরু করতে পরবর্তী ছ-মাস সে কেন অপেক্ষা করল? কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। শকুনি প্রতীক্ষা করছিল রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠন করার ঠিক সুযোগের। বহুদিন নজরদারির পর যখন তার পরিকল্পনা স্থির হল, সেই অনুযায়ী বাসব তার কাজ শুরু করল।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাণক্য বললেন,

- বাসব বোঝেনি যে সে নিজেও শকুনির হাতের পুতুল মাত্র। শকুনির চতুরঙ্গ খেলায় সে একটা ঘুঁটি মাত্র, প্রয়োজন শেষ হলেই যাকে খেলা থেকে সরিয়ে ফেলতে শকুনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। শকুনি গুপ্তচর রেখেছিল সর্বত্র। বাসব ধরা পড়তেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। বরং এতে শকুনির পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই তাকে গুপ্ত আততায়ী দিয়ে হত্যা করানো হয়।

জীবসিদ্ধি অন্যমনস্কভাবে একবার নামটা উচ্চারণ করল,

- আচার্য শকুনি।

নিজের কাপড়ের ঝোলা কাঁধে তুলে নিতে নিতে চাণক্য বললেন,

- হ্যাঁ। সে নিজেকে সেরা প্রমাণিত করতে সব সীমানা লঙ্ঘন করবে। এই অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন মগধের ওপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হতেই থাকবে। সারা দেশকে ধ্বংস করার মতো ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেও সে আমাদের অধরা। বেশিরভাগ মানুষ তাকে চেনেও না। তার বর্তমান স্থিতি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা কেউ অবগত নই। তার নজর রয়েছে সর্বত্র, সর্বক্ষণ। আমায় পরাজিত করতে সে বদ্ধপরিকর। আমার স্বপ্নের আর্যাবর্তকে ধ্বংস করাই তার উদ্দেশ্য। অথচ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই মানুষ অজ্ঞাত। সে আগেও মগধের ওপর আঘাত হেনেছে এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে। যতদিন শকুনি জীবিত, ততদিন মগধের শান্তি নেই। আমার শান্তি নেই। স্বীকার

করছি, এইবার সে আমায় বুদ্ধির খেলায় প্রায় পরাজিত করেছিল। সে সত্যই আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাকে আমি ধ্বংস করবই।

শেষ কথাগুলো বলার সময়ে চাণক্যর উজ্জ্বল চোখের তারা যেন ঝলসে উঠেছিল। বহু বছর পর এই দৃষ্টি দেখল চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধি। তাদের হৃদয় কেঁপে উঠল একটু। এই মানুষটার সঙ্গে তারা পরিচিত। প্রয়োজনে এই মানুষটা কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা তারা জানে।

পরক্ষণেই দৃষ্টি নরম হল চাণক্যর। তাঁদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন আচার্য। শান্ত সাগরের মতো গভীর দৃষ্টিতে তাঁদের পরিচিত আশ্বাসের শীতলতা।

দুই শিষ্য প্রণাম করলেন তাঁদের গুরুকে। আচার্য তাঁদের মাথায় হাত রেখে উচ্চারণ করলেন,

- অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।।

উপসংহার:

স্থান: আর্যাবর্তেরই কোনো এক অজানা জায়গা।

এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামল একটা বাড়ির সামনে। তার মুখ ঢাকা। বাড়ির দরজা খুলে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এল। দু-জনের মধ্যে কিছু কথোপকথন হল। সেই ব্যক্তি আবার নিজের ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নিল।

দরজা বন্ধ করে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকল। বাড়ির প্রাঙ্গণে আরও চার জন মানুষ শরীরচর্চা করছে। সম্ভবত তারা প্রশিক্ষিত সৈনিক। একজন তিরন্দাজি অভ্যাস করছে। তাদের পাশ দিয়ে ভেতরের একটা ঘরে প্রবেশ করল লোকটি।

এক ব্রাহ্মণ বসে আছেন আসনে। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি এবং পইতে থেকে বোঝা যায় এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। প্রবেশ করে প্রথম ব্যক্তি বলল:

- আচার্যদেব, আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। চাণক্য পাটলিপুত্রে পৌঁছে গেছে। এক্ষুনি গুপ্তচর খবর দিল, যে মগধ স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরাজিত হয়েছি আমরা।

নিজের আসনে বসা অবস্থাতেই এইবার মুখ ফেরালেন ব্রাহ্মণ। চোখে তাঁর নৃশংসতা এবং ধূর্ততার আভাস। ঠোঁটে কুটিল হাসি।

- চতুরঙ্গের একটা দান হেরে গেলে তাকে পরাজয় বলে না। যুদ্ধ তো সবে শুরু হল।

Author's Note:

1. মৌর্য শাসনকালের কোনো স্বর্ণমুদ্রা ইতিহাসবিদরা খুঁজে পাননি। কোনো এক অজানা কারণে সেই সময় স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করে শুধুমাত্র রুপো এবং তামার মুদ্রার ব্যবহার শুরু করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদরা এর নিশ্চিত কোনো কারণ বলতে পারেননি।

2. ইতিহাসবিদদের মতে, বাস্তবে মৌর্য শাসনকালে দেশ জুড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছিল।

3. চাণক্যকে নিয়ে বহু গল্প এবং উপকথা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা উপকথায় শোনা যায় যে চাণক্য বিঞ্জা অরণ্যে, একটা স্বর্ণমুদ্রাকে আটটা স্বর্ণমুদ্রা বানানোর অলৌকিক উপায় শিখেছিলেন। এই অর্থ পরবর্তীকালে যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। [7,13]

4. এখানে 'ভূরি (খয়রি) ধাতু' বলে যে বিশেষ ধাতুর কথা বলা হয়েছে, সেটাকে আমরা টাংস্টেন (Tungsten) নামে জানি। এর দাম আজকের দিনেও সোনার দামের চার-শো ভাগের এক ভাগ। কিন্তু টাংস্টেনের ঘনত্ব এবং ওজন সোনার প্রায় সমান। UNICEF ডেটা অনুযায়ী রাজস্থানের দেগনা, পশ্চিমবঙ্গের চাঁদপাহাড় এবং নাগপুরে সাকোলি নদীর চরে পাওয়া যায়। এই কাহিনিতে উল্লিখিত বিদর্ভ রাজ্য বর্তমানে নাগপুরে অবস্থিত।

5. এই কাহিনিতে উল্লিখিত মাদক 'কাৎ' বা 'খাৎ' (Khat) উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম Catha Edulis. Arabian Peninsula এবং Eastern Africa-তে এই বিশেষ গাছ পাওয়া যায়। এই মাদক পাতা মাত্রাতিরিক্ত খেলে ব্লাড প্রেশার ও নাড়ির গতি (pulse rate) বৃদ্ধি, insomnia, depression, delusion, sucidal tendencies, violence, cardiac complications ইত্যাদি লক্ষণ মানুষের শরীরে দেখা দেয়। এর ভয় সৃষ্টিকারী এফেক্ট অনেকটা Amphetamine-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। [10,11]

6. সেই যুগে কর্পূর, ধুনি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিয়মিত নিজের বাড়ি অনুবাসন করার প্রচলন ছিল। [15]

References:

1. কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র (Translated into English by R Shamasastry)

2. চাণক্যনীতি (https://www.hindisahityadarpan.in/2012/01/complete-chanakya-neeti-in-hindi.html?m=1)

3. বিজয় – দেবতোষ নাথ

4. Chandragupta Maurya TV series (2011)

5. Chanakya TV series (1991)

6. Theindiahistory.org

7. India: Brief History by Symist, vol.- 3, pg- 39.

8. Chanakya: The Great Indian Philosopher followed by the world, by Lata Tiwari, opennaukri.com, May 8, 2018.

9. Kautilya and Arthashastra: A statistical investigation of authorship and evaluation of text - Thomas R Trautman, Brill, 1971.

10. Khat- A controversial plant, Erica E Balint et. al., 2009, Wein Klin Wochenschr.

11. National Library of Medicine, pubMed.gov

12. Takshila University (https://en.m.wikipedia.org/wiki/University_of_ancient_Taxila)

13. Chanakya (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chanakya)

14. Asthi Shareera- Defination, Anatomy, Types of Bones. Dr Raghuram and Dr Manasa. Easy Ayurveda. (https://www.google.com/amp/s/www.easyayurveda.com/2017/04/03/asthi-shareera-bones/)

15. Fumigation Ayurveda (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0975947618306582#:~:text=Fumigation%20in%20Ayurveda%20is%20described,disinfection%20environment%20with%20various%20herbs)

